আলোচনা।

অনুকরণ।

র্ব্বল মানুষই সাধারণতঃ অনুকরণপ্রিয়। যাহাদের হৃদয়ের বল আছে, তাহারা াকে ঠিক করিয়া রাখে, পরের সাজের দিকে তাকাইয়াও দেখে না, র সাজ মন্দ হইলেও তাহারা তাহা বদলাইতে চাহে না। সেইরূপ যে র ভিত্তি সুদৃঢ়, সে কখনও নিজ ভিত্তিকে শিথিল করিয়া অন্য সমাজের লায় তাহাকে আবার গাঁথিতে চেষ্টা করে না। আমাদের তথাকথিত তসম্প্রদায় কিন্তু পরের সাজে সাজিতে ও অন্য সমাজের মালমসলায় সমাজ- নূতন করিয়া গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের যে পের স্রোত দেশমধ্যে প্রবাহিত করার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে নি মজিলে ভাই লঙ্কা মজাইলে" হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। তাহাতে ত ও সমাজগত সংযম ভাসিয়া যাইতেছে, বিলাসিতা ও যথেচ্ছাচারের বাড়িতেছে। হিন্দুর ব্যক্তিত্ব ও সমাজ সংযমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্তি শিথিল হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা কি সংযম তছি না, সমাজও ধীরে ধীরে সংযম বিসর্জ্জন দিতেছেন না কি? পাশ্চাত্য র অনুকরণে আমরা বানর সাজিতেছি না কি? ও আমাদের সমাজকে জ করিয়া তুলিতেছি না কি? আমরা পাশ্চাত্য সমাজের নিন্দা করিতেছি আমরা তাহার অনুকরণে কি হইয়া উঠিতেছি, তাহাই বলিতেছি। আমাদের সমাজকে যে শিব গড়াইতে বানর করিয়া তুলিতেছি, তাহাতে হ আছে? পাশ্চাত্য সমাজ পাশ্চাত্য জাতির উপযোগী, আমাদের সমাজ র উপযোগী। পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের সমাজগঠন

অসম্ভব। পাশ্চাত্য বেশ পাশ্চাত্য জাতিরই শোভা পায়। আমাদের বেশে আমাদিগকে বেশ মানায়। হ্যাটকোটে আমাদিগকে বানরই দেখায়, মুরগী-মটনভক্ষণে আমাদিগকে ক্রব্যাদই বোধ হয়। যিনি আপনাকে যতই কেন সভ্য মনে করুন না, তাঁহার সমাজের মধ্যে তিনি অপরূপ জন্তু ব্যতীত আর কিছুই নহেন। আবার অন্য সমাজের লোকেরাও তাঁহাকে দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। বেশভূষা আহারবিহার ব্যতীত আবার গানবাদ্যেও আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, মেয়েরাও সুর ধরিয়াছে। এখন মেয়েদিগকে ইংরেজী লেখাপড়া ও গানবাদ্য না শিখাইলে তাহারা নাকি বরের হাটে বিকাইবে না। ক্রমে কোর্টশিপও আরম্ভ হইবে। যে সমাজে নববধূ পবিত্রতার একটি প্রস্রবণ, সে সমাজে গীতবাদ্যদক্ষা যুবতী ঘরণী হইলে বরের গৃহটি কেমন হইবে বলুন দেখি? গীতবাদ্য শাস্ত্রকারেরা ব্যসনের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। গানবাদ্য দেবোপহার হইলেও তাহাতে আসক্তি পরিণামে বিষময়ই হইয়া উঠে। তাই বলিতেছি, এই বিষধারাটি পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের সমাজেও দেখা দিতেছে। এই সময় হইতে ইহার প্রবাহ রুদ্ধ করা উচিত, নতুবা অবশেষে আমাদিগকে জ্বলিয়া মরিতে হইবে। কেবল ইহা বলিয়া নহে, সকল প্রকার অনুকরণের স্রোতই রোধ করা উচিত। আমাদের নিজত্ব রক্ষা করার জন্য আমাদিগকে বিশেষরূপ সাবধান হইতে হইবে। সমাজের দোষ দূর কর, কিন্তু কুৎসিত অনুকরণে তাহাকে কলুষিত করিও না।

আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা আমাদের সমাজে ক্রমে সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে। কি যুবক, কি যুবতী, সকলেই ইহাকে শান্তিলাভের উপায় স্থির করিয়া লইতেছে। যুবক-দিগের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মহত্যা সম্পাদন করিতেছে, কেহ বা পিতামাতার উপর অভিমান করিয়াও নিজের অবসান ঘটাইতেছে। যুবতীদিগের মধ্যে স্বামী ও শ্বশুরকুল, পিতামাতার প্রতি অভিমান ত আছেই, তাহা ছাড়া স্নেহলতার

অনুকরণও চলিতেছে। শেষোক্তটি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ সংযমের অভাব। যাহারা চিত্তবৃত্তির সংযম করিতে পারে না, তাহারা সহসা বিচলিত হইয়া এইরূপ কাণ্ড ঘটাইয়া থাকে। স্নেহলতার মৃত্যুতে আমরা সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলাম, এক্ষণে কিন্তু বলিতে হইতেছে, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা"। ফলতঃ সমাজে সংযমশিক্ষার অভাবে বালক বালিকা, যুবক যুবতীর প্রকৃতি যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করিতেছি। যাহারা সামান্য খুঁটিনাটি সহ্য করিতে পারে না, সংসারের বড় বড় তুফানে তাহারা যে কি করিতে পারে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সংসারের অগ্নিপরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহারাই মানুষ। অভিমানে মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া ফেলে। এ ছাই অভিমান যুবকযুবতীর মন হইতে একেবারে উন্মূলিত করিয়া ফেলা উচিত। সংযমশিক্ষাই তাহার একমাত্র উপায়।

—:০:—

ভাসের গ্রন্থাবলী।

মহাকবি ভাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটককার, ইহাই এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্রে পারিপার্শ্বিকের মুখ দিয়া বলিয়াছেন, "প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লককবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং বহুমানঃ"। সুতরাং ভাসের গ্রন্থ যে এককালে আদৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল তাঁহার স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকেরই নাম শুনা যাইত, এরূপ কথিত আছে যে, ভাস তাঁহার নাটকগুলি রচনা করিয়া অগ্নিদেবকে সমর্পণ করায়, তিনি কেবল স্বপ্নবাসবদত্তম্খানিই প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্বপ্নবাসবদত্তমেরই প্রচলন ছিল বলিয়া বুঝা যায়। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর হইতে ভাসের সমস্ত গ্রন্থেরই আবিষ্কার হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃতপাণ্ডুলিপিসমূহ প্রকাশের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহোদয় ভাসের সমস্ত গ্রন্থই প্রকাশ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার ১২ খানি গ্রন্থের প্রকাশ হইয়াছে। তাহাদের নাম

স্বপ্নবাসবদত্তম্, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্, পঞ্চরাত্রম্, অবিমারকম্, বালচরিতম্, মধ্যমব্যায়োগঃ, দূতবাক্যম্, দূতঘটোৎকচম্, কর্ণভারম্, উরুভঙ্গম্, অভিষেক-নাটকম্, চারুদত্তম্। ইহা ভিন্ন প্রতিমানাটক নামে তাঁহার আর একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। আমরা কথাকারে এই নাটকগুলির বঙ্গানুবাদ করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি, যথাসময়ে আমরা সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। ভাসের গ্রন্থাবলী হইতে অনেক নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার হইবে বলিয়া আমরা মনে করি, ইহাতে প্রত্নতত্ত্বজগতে যুগান্তর ঘটাইবে।

অরণ্যষষ্ঠী।

অভয়বরদহস্তাং কৃষ্ণমার্জ্জারসংস্থাং
কনকরুচিরগাত্রীং সর্ব্বপুত্রৈকধাত্রীম্।
সুরমুনিগণবন্দ্যাং দিব্যমাল্যাম্বরাঢ্যাং
বটবিটপিবিলাসাং নৌমি ষষ্ঠীং সহাসাম্॥

পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে দক্ষিণাপথে সমুদ্রে বাণিজ্যব্যবসায়ী এক বণিক্ বাস করিত। শুভব্রত নামে তাহার একটি পুত্র ছিল। বণিক্ তাহার পুত্রের সহিত ধনেশ্বরনামক বণিকের কন্যা মধুমতীর বিবাহ দিয়াছিল। মধুমতী লোকমধ্যে অসামান্য রূপবতী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। মধুমতী তাহার পিতার ধনগর্ব্বে ও নিজের সৌন্দর্য্যাভিমানে এতই গর্ব্বিতা হইয়াছিল যে, তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, ব্রাহ্মণ ও অতিথি কাহাকেও সম্মান করিত না। বণিক্‌পুত্র শুভব্রত পত্নীর এই গর্ব্বিত ভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল ও তাহার কটুবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পতিকর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মধুমতী বনমধ্যে গমন পূর্ব্বক একটি বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিল। মধুমতীর এইরূপ গর্ব্বিত ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ সকলেই তাহার নিন্দা করিতে লাগিল, কেহই তাহাকে গৃহে আনয়ন করিতে যত্ন করিল না। মধুমতী অনন্যোপায় হইয়া বনে শাকমূলাদি সংগ্রহ করিয়া বহুকষ্টে তাহার দ্বারা

জীবন ধারণ করিতে লাগিল। এইরূপে কষ্টে দিনযাপন করিয়া শীতাতপে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে একদিন দুর্ব্বাসা-মুনি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মধুমতী সেই জ্বলন্ত অনল সদৃশ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনিও অরণ্য-মধ্যে একাকিনী সেই সুন্দরীকে অতীব দুঃখিতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে? তুমি কি কারণ এই নির্জ্জন বনে অসহায় অবস্থায় এইরূপ দুঃখে কাল-যাপন করিতেছ?" "আমি ধনেশ্বর নামক বণিকের কন্যা ও শুভব্রত নামক বণিকের ভার্য্যা।" এই কথা বলিয়া মধুমতী নীরব হইয়া অবস্থান করিল। মুনি ধ্যানে তাহার সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমার সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিয়াছি। তুমি তোমার পিতার ধনগর্ব্বে ও নিজ রূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া এইরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি, যদি আমার বাক্য পালন কর, তাহা হইলে তোমার এই দুর্দ্দশা দূর হইবে, ও পরম সুখ লাভ করিবে।" মুনির এই সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুমতী করযোড়ে বলিল, "হে মহামুনে! কি উপায়ে ধনসম্মান লাভ হইবে, অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে বলুন। আমি আপনার উপদেশ সর্ব্বথা পালন করিব।" মুনি বলিলেন, "অদ্য জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথি। অদ্য বটবৃক্ষের মূলে বন্য পুষ্প, পত্র ও আম্রফলের দ্বারা ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনা করিলে যোষিদ্‌গণ ষষ্ঠীদেবীর প্রসাদে ইহ জন্মে পুত্রপৌত্রাদি ও অনুত্তম ধনধান্য লাভ করিয়া পরজন্মে স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। অদ্য ধূপ-দীপ, নানাবিধ নৈবেদ্য ও পক্ব আম্রফল দ্বারা যোষিদ্‌গণ ষষ্ঠীদেবীর ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে ও বিশেষ যত্ন কবিয়া ষষ্ঠীদেবীকে স্বয়ং ব্যজন দ্বারা পরিচর্য্যা করিবে। এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে ষষ্ঠীদেবী সুপ্রীতা হইয়া থাকেন। তিনি প্রীতি প্রদর্শন করিলে গৃহে কোন ধনের অভাব থাকে না। ষষ্ঠীদেবীর প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে স্বামী বশীভূত হইয়া থাকে, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন প্রীত হন, ও অন্য লোকের তাহার উপর অনুরাগ জন্মিয়া থাকে।" মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া মধুমতী তাঁহাকে প্রণাম করিল, ও তাঁহার নিকট ষষ্ঠীদেবীর পূজাপ্রণালীর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিসহকারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা পূর্ব্বক এইরূপে বর প্রার্থনা করিল, "হে দেবি! আপনি কার্ত্তিকেয়ের ধাত্রী বলিয়া জগতে খ্যাতা আছেন। আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

আপনার প্রসাদে আমি যেন রূপ, যশঃ, সৌভাগ্য ও উন্নতি লাভ করিতে পারি। হে ভগবতি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পুত্র, ধন ও আমার সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত বিষয় প্রদান করুন।” এইরূপে মধুমতীর দ্বারা ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনা সম্পাদিত করিয়া মুনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনা করিলে পর মধুমতীর মানসিক দুঃখ দূর হইল। ইতিমধ্যে তাহার শ্বশুরপক্ষ ও পিতৃপক্ষ তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে কাতর হইয়া সেই বনে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, “হায়! আমাদের বধূ কোথায় গেল, হায়! আমাদের কন্যা কোথায় চলিয়া গেল?” তাহার পর বটবৃক্ষের সমীপে গমন করতঃ বিদ্যুতের ন্যায় ও কন্দর্পের রতির ন্যায় সেই সুন্দরীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। অনন্তর সেই সুন্দরী অতিবিনয়সহকারে শ্বশুরপ্রভৃতি স্বজনগণকে বন্য ফলমূলাদির দ্বারা অভ্যর্থনা করিল। তাহারা মধুমতীর ব্যবহারে অতীব প্রীত হইয়া ও তাহার রূপে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হে যশস্বিনি! তুমি কি কারণে এই বিজন বনে একাকিনী বাস করিতেছ? যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমাদের নিকট তোমার পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদের বিস্ময় দূর কর।” মধুমতী বলিতে লাগিল, “আমি আমার গর্ব্বহেতু আপনাদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নানা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, হায়! আমি কোথায় যাইব, কোথায় বা থাকিব, আর কি করিলেই বা আমার মঙ্গল হইবে? এইরূপে চিন্তায় কাতর হইয়া বৃক্ষের মূলে উপবেশন করিলাম ও মনে করিলাম, এই স্থানটি মনোরম, ইহার নিকটে একটি সরোবর দেখিতেছি, এই সরোবরটিও মনোজ্ঞ, এই স্থানেই আমি বর্ত্তমানে বাস করিব। এই স্থির করিয়া বন্য ফলমূলের দ্বারা জীবনধারণপূর্ব্বক দিবানিশি শীতোষ্ণাদি সহ্যকরতঃ কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমার অনেক দিন অতিবাহিত হইল। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে একজন অতিতপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে ষষ্ঠীদেবীর পূজার উপদেশ দিয়া আমার দ্বারা দেবীর পূজা সম্পাদিত করাইয়া দিলেন। সেই ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে ও ষষ্ঠীদেবীর প্রসাদে অদ্য বহুকাল পরে আপনাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।” এই বলিয়া আনন্দিত হইয়া মধুমতী

শ্বশুরপ্রভৃতিকে নমস্কার করিল, ও যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, সেইরূপে তাহার সহিত সম্ভাষণ করিল। মধুমতীর এইরূপ বিনয়ব্যবহার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, 'এই বধূ পূর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া গুরুজনকেও অবজ্ঞা করিয়াছে, আজ সেই এইরূপ বিনীতা হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতেছে, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।' এই কথা বলিয়া তাহার শ্বশুরপ্রভৃতি গুরুজনসকল তাহাকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া গৃহে লইয়া গেল। তাহার শ্বশুরপক্ষ ও পিতৃপক্ষ সকল স্বজনগণ সন্তুষ্ট হইয়া নানাবিধ ধনরত্নাদির দ্বারা তাহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। অনন্তর কিছুকাল পরে সেই নারী স্বামীর নিকট বিশেষরূপে আদৃতা হইয়া ক্রমে ক্রমে সাত পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিল। সেই কন্দর্পের ন্যায় রূপসম্পন্ন পুত্রগণ পরে ধন-ধান্য ও পুত্রাদিসম্পন্ন হইয়া লোকের নিকট বিশেষ সম্মানিত হইয়া উঠিল। মধুমতীর কন্যার সহিত অতি সমৃদ্ধিসমন্বিত ধর্ম্মরাজ নামক ধনকুবেরের বিবাহ হইয়াছিল। এই বণিকের বহুসংখ্যক পোত সমুদ্রে বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইরূপে মধুমতী বহুকাল নানাপ্রকার সুখভোগ করিয়া, যথায় ষষ্ঠীদেবী স্বয়ং অধিষ্ঠিতা আছেন, সেই আনন্দময় স্বর্গধামে গমন করিয়াছিল।

জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

শ্রী—

পরলোকরহস্য।

প্রধান অধ্যাপক ছাত্রবৃন্দসহ চতুষ্পাঠীগৃহে সমাসীন। চারিদিকে ছাত্রগণ; কেহ বেদান্ত, কেহ ন্যায়, কেহ সাংখ্য, কেহ মীমাংসা কেহ বা পুরাণ অধ্যয়নে ব্যাপৃত। অধ্যাপক কখন কোন ছাত্রকে বেদান্ত উপনিষদের গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বুঝাইতেছেন, কোন ছাত্রের তর্কের জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। এমন সময়ে গ্রামের কয়েকজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে তথায় উপনীত হইলেন। অধ্যাপক সুপণ্ডিত ও বিনয়ী, তিনি তাঁহাদের

যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া আসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভদ্রলোকগুলি গ্রামের অলঙ্কার। ইঁহারা চতুষ্পাঠীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধিসাধনে নিরন্তরই চেষ্টিত। কেহ কেহ আপনার বাটীতে এক একজন করিয়া ছাত্রের অন্ন দিবার ভার লইয়া উপকার করিতেছেন; নচেৎ ২০।২৫টি ছাত্রকে অন্ন দিয়া শিক্ষাদান দরিদ্র অধ্যাপকের পক্ষে সম্ভব হইত না। ভদ্রলোকগণ আজি একটি গুরুতর মীমাংসার জন্য আসিয়াছেন। কাজেই অধ্যাপক ছাত্রগণকে বলিলেন,—"বৎসগণ, আজি শিষ্টানধ্যায়। কাহারও যদি ইচ্ছা থাকে ত, এই বাদবিচার শ্রবণ করিতে পার।"

আগন্তুক ভদ্রলোকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি তখন অধ্যাপক মহাশয়কে কহিলেন,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমরা আজি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। জীব স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া কোথায় যায়, কি করে? পুনরায় মর্ত্ত্যে ফিরে কি না, কেনই বা ফিরে? মৃত্যুর পর জীবাত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? পরলোকে পান ভোজন, সুখ দুঃখ ভোগ হয় কি না? এই সকল সংশয়ের আপনি উত্তর দিউন।"

ভট্টাচার্য্য। বেশ ত, আজিকার বিচার্য্য বিষয় অতি মহান্, অতি পবিত্র, অতি গভীর, জগতের অত্যুপকারক। এই জিজ্ঞাসার যদি সদুত্তর করিয়া তোমাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার শাস্ত্রাধ্যয়ন সফল হইবে, মহাপুণ্যসঞ্চয় হইবে।

স্থূলদেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের হিন্দু দার্শনিকগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। বেদ, উপনিষৎ, সংহিতা, পুরাণ, দর্শন, জ্যোতিষ-প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্রই পারলৌকিক জীবের অস্তিত্বপ্রতিপাদনে যত্নবান্। স্থূল-দেহত্যাগান্তে সূক্ষ্মদেহে (লিঙ্গশরীরে) অবস্থিতি, তৎপর পুনরায় মর্ত্ত্যে স্থূল-শরীর ধারণ জন্মমৃত্যুগ্রস্ত জীবের স্বাভাবিক, মধ্যে পাপপুণ্যের অল্পাধিক্য-বশতঃ লিঙ্গদেহে সংস্কারবশে স্বস্বকর্ম্মানুরূপ সুখদুঃখভোগ। এই সুখদুঃখ-ভোগই পারলৌকিক স্বর্গনরকভোগের নামান্তর। স্থূলদেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্বে আপনাদের সংশয়ের উদ্রেক হওয়া উচিত নহে। বেদানুশাসিত ঋষি-জনাধ্যুষিত, মহাপুরুষজন্মপবিত্রীকৃত ভারতবর্ষে নিরন্তরই এই সকল সংশয়ের সুন্দর মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আমি আপনাদিগকে সেই মীমাংসিত উত্তর

যথাযোগ্য যুক্তিসাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। তোমরা কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পোষণ করিবে, নচেৎ এই গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব অতীন্দ্রিয় পরলোক-রহস্য আয়ত্তীকৃত হইবে না।

দেখ, স্থূলদেহ শ্মশানে পড়িয়া থাকে, আত্মীয়স্বজনে তাহাকে ঘেরিয়া মর্ম্মন্তুদ রোদনে দিক্ ফাটাইয়া দেয়, তৎপর সেই শবদেহ দগ্ধ করিয়া স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যায়। স্থূলদেহ হইতে এমন একটি জিনিস চলিয়া গিয়াছে, যাহার অভাবে সবাই ম্রিয়মাণ, রোদনপরায়ণ। দেহ হইতে সেই জিনিসটি চলিয়া যাওয়ায় দেহকে কেহই আদর করে না, অগ্নিতে তাড়াতাড়ি দগ্ধ করিবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়। ঐ জিনিসটি অবশ্যই দেহ হইতে পৃথক্, দেহ সেই জিনিসটির আধার মাত্র ছিল। আধেয় নাই, আধার থাকিবার প্রয়োজন করে না। তবেই দেখ, দেহ বস্তুতঃ আমাদের প্রিয়জন নহে। আধেয়রূপী জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলভোগের জন্য, সংসারের খেলা খেলিবার জন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে মাত্র। আধেয়-রূপী জীব একটি আধার ছাড়িয়া অপর অনুরূপ আধারে গমন করে বলিয়া আধার অনিত্য, নাশশীল। আধেয়রূপী জীব নাশপ্রাপ্ত হয় না, উহা নিত্য, সনাতন। কাজেই এই আধেয় নিত্য আত্মার জীর্ণবস্ত্রপরিত্যাগের মত দেহ-ত্যাগের জন্য ধীর ব্যক্তির মুহ্যমান হওয়া বিধেয় নহে। এই জীর্ণদেহত্যাগ শুধু কর্ম্মার্জ্জিত নবদেহধারণের জন্যই হইয়া থাকে। জীবের মৃত্যু তাহার আধারের সাময়িক পরিবর্ত্তন মাত্র। অতএব দেহ ভৌতিক জড়পদার্থ। জীবরূপী আত্মা বা চৈতন্য ভৌতিক জড়পদার্থ হইতে যে অতিরিক্ত বস্তু, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রূপরসাদি বিষয়, জীবাত্মা দ্রষ্টা, ভোক্তা, অতএব বিষয়ী। বিষয়ী বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়াই থাকে। দেহসত্ত্বেও যখন আত্মার অবস্থিতি দৃষ্ট হয় না, তখন দেহাতিরিক্ত আত্মা, ইহা অবিসংবাদিত। স্বতন্ত্র চেতন কোন পদার্থ না থাকিলে, জড়পদার্থগুলি পরস্পর সংহত হইত না, চেতনাসমন্বিত জীব হইতেও পারিত না। জড়ই দেহ। জড়াতিরিক্ত চৈতন্যই আত্মা।

প্রৌঢ় ভদ্র। পণ্ডিত মহাশয়, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্বে আমরা অবিশ্বাসী নহি; কিন্তু সেই জীবের পারলৌকিক গতি, ভোগ, প্রত্যাবর্ত্তন-

সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কোন পণ্ডিত বলেন, (১) মৃত্যু হইলে জীবের কৃত কর্ম্মফল নিঃশেষে ভোগ হইয়া যায়, পাপপুণ্য নিঃশেষ ভুক্ত হওয়ায় নির্ব্বাণ-মুক্তি মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাভাবিক। কৃতকর্ম্মফলভোগ জীবদ্দশায় শেষ হইয়া যায়, যাহা অবশিষ্ট থাকে, মৃত্যুযন্ত্রণায় তাহাও শেষ হইয়া যায়। কেহ বলেন, (২) মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জীব জন্মপরিগ্রহ করিতে বাধ্য। জলৌকা যেমন তৃণ হইতে তৎক্ষণাৎ তৃণান্তরে গমন করে, জীবও তদ্রূপ দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ বা বলেন, (৩) স্বানুরূপ দেহধারণের অপেক্ষায় জীবকে কিয়দ্দিন লিঙ্গদেহে বাস করিতে হয়। সে অপেক্ষাকালের পরিমাণ বড় জোর এক বৎসর। আর কোন কোন পণ্ডিত বলেন, (৪) জীব স্বকর্ম্মানুরূপ কিয়দ্দিন বা বহুদিন কৃতকর্ম্মফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগকরতঃ পুনরায় মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ভট্টা। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। বেদের সার-সিদ্ধান্ত, যাহা উপনিষদে বিবৃত, বেদান্তদর্শনে যাহা ব্যাখ্যাত, তাহাই সংহিতা-পুরাণাদির সহিত একবাক্য করিয়া তোমাদিগকে বুঝাইব।

যে চারিটি মত তোমরা বলিলে, আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বাস্তবিক এইগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ নহে। প্রথম মতটি সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। ইহ জীবনে বাসনা-উচ্ছেদকারী অবিদ্যাতীত ব্রহ্মপ্রাপ্ত জ্ঞানীরই বর্ত্তমান শরীরে দীপনির্ব্বাণবৎ সর্ব্ববাসনার নিবৃত্তি। বাকী তিনটি মত একই জীবের পক্ষে ব্যবস্থাপিত নহে। জীবভেদে বিরোধগুলির মীমাংসা করিতে হইবে। এক্ষণে বুঝিলে, আপাততঃ বিরুদ্ধরূপে প্রতিভাত মত চারিটি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে।

প্রৌঢ়। বিশদরূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। আমরা যেরূপে বুঝিতে পারি, সেইরূপ সরল যুক্তি দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। প্রমাণশ্লোক-কণ্টকিত করিয়া বিষয়টিকে দুর্ব্বোধ্য, দুষ্প্রধৃষ্য করিয়া তুলিবেন না। আমরা সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ, আমাদিগের নিকট সংস্কৃত প্রমাণ উদ্ধৃত করা বৃথা।

ভট্টা। উত্তম প্রস্তাব। আমিও কথায় কথায় শ্লোক উদ্ধৃত করা পছন্দ করি না। প্রাশ্নিকপক্ষ যেখানে শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহেন, সেইরূপ বিচারক্ষেত্রেই প্রমাণপ্রয়োগ উদ্ধৃত করার আবশ্যকতা।

বলিয়াছি, প্রথম মতটি মুক্ত পুরুষের পক্ষেই। যিনি সংসারবন্ধন একেবারে

উচ্ছেদ করিতে পারিয়াছেন, ভগবানের ভক্তজনতারিণী করুণা লাভ করিয়া জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত। দীপনির্ব্বাণবৎ তাঁহারই সমস্ত কামনা, বন্ধকারণ সমস্ত কর্ম্ম চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। মুক্ত ব্যতীত পুরুষের পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মই সর্ব্বত্র নিঃশেষভুক্ত হয় না। কারণ, এমন পাপ ও পুণ্য আছে, যাহার ফল একজন্মে শেষ হইয়া যায় না। পূর্ব্বজন্মের কৃত-কর্ম্মের ভোগসমাপ্তি হইলেও অজ্ঞানবদ্ধ বাসনাপরবশ জীবের বাসনা সমূলে নাশ না পাওয়ায়, মুক্তির সম্ভব হয় না। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান জন্মের পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মফলও জীবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। তবেই দেখ, সংসারবন্ধ-কারণ মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান, জন্মান্তরীণ বাসনা, দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার আত্যন্তিক ছিন্ন করিতে হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রয়োজন। এমন অনেক পাপ-কর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম বিদ্যমান, যাহা বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক নহে, অর্থাৎ যাহার ফলে বর্ত্তমান দেহ ধারণ করিতে হয় নাই, সেই পাপপুণ্যাত্মক সঞ্চিত কর্ম্মই মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। যে পাপপুণ্যফলভোগের জন্য বর্ত্তমান দেহধারণ, তাহার নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম। আর যে পাপপুণ্যফলভোগের জন্য বর্ত্তমান জন্ম নহে, অথচ যাহা দেহীর অন্তঃকরণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, তাহারই নাম সঞ্চিত কর্ম্ম। এই সঞ্চিত কর্ম্মের ভোগ হয় না; কাজেই এই কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে। তবেই কর্ম্মচ্ছেদরূপ মোক্ষের সম্ভাবনা কোথায়? মুক্তিকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি মনে বিলীন হইয়া যায়, মনোবৃত্তি প্রাণে মিশিয়া যায়, প্রাণ জীবাত্মায় লীন হয়, আর জীবাত্মা স্বীয় জীবাত্মোপাধি ত্যাগ করিয়া অখণ্ড আত্মা বা পরমচৈতন্যের সহিত এক হইয়া যায়।

প্রৌঢ়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনে লয় হয় কিরূপ?

ভট্টাচার্য্য। কেন, ইহা কি দেখ নাই যে, যখন মন কোন একটি ভাবনায় তন্ময় থাকে, তখন চক্ষুকর্ণাদি বিদ্যমান থাকিলেও দর্শনশ্রবণাদি কার্য্য হইতে দেখা যায় না। মন একটি ইন্দ্রিয়ের সহিত একতান হইলে অপর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষীকৃত। মন যদি পরমাত্মায় বিলীন থাকে, তবে ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হইতে পারে না। ঐ পরমাত্মায় লীনভাব যদি বহুকাল অবিচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে ক্রমে চক্ষুকর্ণাদি অকর্ম্মণ্য হইয়া স্বকারণ মনে বিলীনবৎ হয়। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকিলেও তাহার

বৃত্তির লয়হেতু ইন্দ্রিয়গণই বিলীন হয়, ইহা বলা যায়। বাহ্য বিষয় হইতে মন আকৃষ্ট হইলেই ইন্দ্রিয়াদির মনঃসংযোগের অভাব হইয়া যায়, ফলে ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমে অন্তর্মুখীন হইতে আরম্ভ করে। মুক্তিকালে মনের লয়, ইন্দ্রিয়াদির লয়। তবে বৃত্তির লয় হয় বলিয়াই মন ও ইন্দ্রিয়াদির লয়, জীবদ্দশায় ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তির সাময়িক লয়, মুক্তিকালে আত্যন্তিক লয়। মনও স্বীয় উপাধি ত্যাগ করিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় বলিয়া ক্রমে প্রাণে মিশিয়া যায়। অধ্যাত্মভাবাপন্ন বায়ুবিশেষকে প্রাণ বলে। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সমস্তই ভৌতিক পদার্থ। মোক্ষে ভূতপ্রপঞ্চের লয়, কাজেই ভৌতিক ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণের লয়। ভৌতিক জগৎপ্রপঞ্চই ভেদজ্ঞানমূলক। মোক্ষকালে ভেদজ্ঞান সমূলে বিধ্বস্ত হওয়ায়, ভেদজ্ঞানমূলক ভৌতিক পদার্থের স্থিতি সম্ভবে না। বাসনার আত্যন্তিক উচ্ছেদে, সংস্কারের প্রবিলয়ে মন বৃত্তিরহিত হইয়া থাকে।

মুক্তপুরুষ ব্যতীত সকলকেই মৃত্যুর পর তৎক্ষণেই হউক, আর বহুকাল পরেই হউক, জন্মিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তৎক্ষণেই যে সকলেই জন্মে, ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যদি সকলে জন্মিত, তাহা হইলে পারলৌকিক সুখদুঃখ মিথ্যা হইয়া যায়, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি নিরর্থক হইয়া পড়ে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীবাত্মার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন ব্যাপারটি অপ্রমাণ বলিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আত্মঘাতীর গতি নাই, এই শাস্ত্রবাক্যেরও কোন মূল্য থাকে না; পারলৌকিক মহদুদ্দেশ্যসাধনার্থ শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগিতাও অস্বীকার করিতে হয়। ইহলোকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরলোকে ফলদাতৃত্ব না থাকিলে, পাপকর্ম্মের প্রতি মানবের ভয় অনেকটা কমিয়া আইসে। ইহা পাপীর সান্ত্বনা, পুণ্যবানের হতাশ্বাস আনিয়া দেয়।

প্রৌঢ়। মৃত্যুর পর কাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ জন্মগ্রহণ করিতে হয়?

ভট্টা। যাহারা বর্ত্তমান দেহে ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া যায়, তাহারা আর ধর্ম্মাধর্ম্মফল পুণ্যপাপ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। কাজেই তাহাদিগকে পারলৌকিক সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অথচ তাহাদের মিথ্যাজ্ঞান বিধ্বস্ত হয় না, বা বাসনারও আত্যন্তিক উচ্ছেদ হয় না বলিয়া আত্যন্তিক সংসারোপরম বা মোক্ষের সম্ভাবনা থাকে না। পাপ ও পুণ্য দেহীর বিষম

ভার। পাপ যেমন মোক্ষের প্রতিবন্ধক, পুণ্যও তদ্রূপ মোক্ষের প্রতিবন্ধক। পাপ লৌহশৃঙ্খল, পুণ্য স্বর্ণশৃঙ্খল, বন্ধন সমানই। এই পাপপুণ্যভারের জন্য জীবের পারলৌকিক সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহাদের পাপপুণ্য-ভার নাই, তাহারাই তৎক্ষণাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জলৌকার তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমনের মত এই পাপপুণ্যভাররহিত জীবের দেহ হইতে দেহান্তরে গমন তৎক্ষণাৎ হইয়া থাকে।

প্রৌঢ়। পাপপুণ্যভার যাহাদের নাই, এমন ত কাহাদিগকে দেখিতেছি না।

ভট্টা। কেন, যাহারা ৩।৪ বৎসরের শিশু, তাহাদের তৎক্ষণাৎ জন্ম হইবে। কারণ, সেই অজ্ঞান শিশুদের নিশ্চয়ই বর্ত্তমান জন্মের কোন পাপপুণ্য সাধিত হয় নাই। তবেই পাপপুণ্যভার না থাকায় তাহাদের পারলৌকিক সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ঐহিক কর্ম্মও করিয়া যায় নাই বলিয়া নূতন দেহ-ধারণের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন থাকে না। কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি পারলৌকিক, কতকগুলি ঐহিক। পারলৌকিক কর্ম্ম পারলৌকিক সুখদুঃখের হেতু, ঐহিক কর্ম্ম লিঙ্গদেহে কিছুদিন অবস্থিতির নিয়ামক, আর বৈচিত্র্যময় জন্মের কারণ। শিশুদের জন্মান্তরীণ কর্ম্মের মত ঐহিক কর্ম্মও থাকে না, কাজেই লিঙ্গদেহে কিছুদিন অবস্থিতি সম্ভবে না; বৈচিত্র্যময় জন্মলাভও করিতে হয় না। শিশুদের বর্ত্তমান জন্মে কোনরূপ, কি পারলৌকিক কি ঐহিক কর্ম্ম না থাকায় অনুরূপ দেহধারণের জন্য অপেক্ষা করিবার আবশ্যক করে না। যাহারা ঐহিক কর্ম্ম করিয়া যায়, পারলৌকিক কর্ম্ম করে নাই, এমন সাধারণপাপপুণ্যবিশিষ্ট ব্যক্তি পারলৌকিক ভোগের অধিকারী নহে, কিন্তু বৈচিত্র্যময় জন্মের দেহান্তর লাভ সকল স্থলে সুলভ নহে, কাজেই ইহা-দিগকে নূতন দেহধারণের জন্য লিঙ্গদেহে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিতে হয়। শিশুদিগের মরণান্তে জন্মগ্রহণ তৎক্ষণাৎ হয় বলিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যবস্থাপিত হয় নাই, শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত দাহাদির প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন, দেহ-ধারণের অপেক্ষায় যে লিঙ্গদেহে অবস্থিতি করিতে হয়, সেই লিঙ্গদেহ এক প্রকার। আর যে লিঙ্গদেহে পারলৌকিক স্বর্গনরক ভোগ করিতে হয়, তাহা অন্য প্রকার। ইঁহাদের মতে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা ঐ প্রথমবিধ লিঙ্গদেহের নাশ ও

তৎপরে কাহার পক্ষে জন্মলাভ, কাহার পক্ষে স্বর্গনরক ভোগ। এই লিঙ্গ-দেহের নামই আতিবাহিকদেহ।

শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রথম, আতিবাহিকদেহবিমুক্তি, তৎপর স্বর্গভোগযোগ্য লিঙ্গদেহপ্রাপ্তি বা স্বানুরূপ জন্মলাভের সহায়তাকরণ। দ্বিতীয়, পরলোকে সংস্কারমূলক ক্ষুধাতৃষ্ণাদির নিবৃত্তি ও নানাবিধ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ। তৃতীয়, কষ্টকর অবস্থা হইতে উদ্ধার, স্বানুরূপ দেহগ্রহণের উপায়বিধান। এতদ্ব্যতীত সন্তানগণের মনঃশক্তি, উপাসনালভ্য ভগবৎকরুণা যে পারলৌকিক জীবের ঊর্দ্ধগতির অধিকার দিতে পারে না, ইহাও বলা যায় না।

বলিয়াছি, পারলৌকিকার্থ পাপপুণ্যফলে স্বর্গনরক। ঐহিকার্থ পাপ-পুণ্যফলে নূতন জন্মগ্রহণ। ঐহিকার্থ পাপপুণ্যবশে যে বৈচিত্র্যময় স্বানুরূপ দেহলাভ, তাহা সুলভ নহে বলিয়া জীবকে অপেক্ষা করিতে হয়। এই অপেক্ষাকালের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিকশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ বিহিত। এই একবৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা শিশুব্যতীত যাবতীয় পুরুষের পক্ষে বিহিত। এই একবৎসর সন্তানের মহাশৌচ। সকলপ্রকার নিয়মপালন, যথা হবিষ্যান্ন-ভোজন, পরান্নগ্রহণনিষেধ, ছত্রপাদুকাপরিহারপ্রভৃতি বিধি।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পূর্ব্ববাসনা অনুযায়িকই জন্মলাভ হইয়া থাকে। এমন কি, পরমেশ্বর জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও বাসনাকে অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বানুরূপ দেহপ্রাপ্তির অপেক্ষাকালে স্বর্গনরক ভোগ হয় না বটে, কিন্তু সে সময়ে দেহধারণার্থ উৎকণ্ঠানিবন্ধন বড়ই ব্যাকুলতা জন্মে।

প্রৌঢ়। পরেলৌকিকার্থ পাপপুণ্যে স্বর্গনরক, ঐহিকার্থ পাপপুণ্যে মাত্র বৎসরাবধিকাল অপেক্ষা, এই উভয় বিভাগ যাঁহারা না মানেন, তাঁহাদের কিরূপে বুঝাইবেন?

ভট্টা। এটি শাস্ত্রবাক্য, বিশ্বাসই কর্ত্তব্য। এই বিভাগ না থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাহারা উৎকট পাপ, অসীম পুণ্য করিয়া যায়, তাহারাই স্বর্গ-নরকভোগের অধিকারী। আর যাহারা সাধারণ পাপপুণ্য করে, তাহাদিগকে বৎসরাবধি কাল অপেক্ষা করিতে হয়। পাপপুণ্যের পরিমাণ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন, কাজেই স্বানুরূপ দেহ ভিন্ন ভিন্ন। একজনের গ্রহীতব্য শরীর, অপরের গ্রহণীয় হইতে পারে না। একবৎসরের মধ্যে কাহারা জন্মে, কাহারা স্বর্গ-

নরক ভোগ করে, তাহা জানিবার শক্তি মানবের নাই, কাজেই শ্রাদ্ধাদি বরাবরই করিতে হয়।

প্রৌঢ়। আত্মঘাতীর দাহশ্রাদ্ধাদি নাই কেন?

ভট্টা। আত্মহত্যাকারীর মত মহাপাপী নাই। যাহারা হৃদয়ের দুর্ব্বলতার এমতই অধীন যে, আত্মহত্যা করিতে পশ্চাৎপদ নহে, তাহারা মহাপাপী নয় ত কি? বর্ত্তমান যন্ত্রণার এতই বিহ্বলতা যে, তাহারা সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে নিতান্তই অপারগ। সেই সকল ব্যক্তিগণ এমন পাপ নাই যাহা তাহাদের অসাধ্য। আত্মঘাতীর পাপদোষ এত অধিক যে, ঐ দোষের জন্য কোন মতে জন্মগ্রহণ করিতে তাহারা সমর্থ হয় না। এই পাপভারের লঘুতা সম্পাদন করা সন্তানগণের বলবতী মনঃশক্তিরও সাধ্য নহে। কাজেই দাহশ্রাদ্ধাদি ব্যর্থ। আত্মঘাতীজন কোন মতেই ভৌতিক যোনি হইতে অব্যাহতি পায় না। নিরন্তরই মৃত্যুর পর কেবল আত্মহত্যা করে, মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়তই ভোগ করে, পরক্ষণেই স্বপ্নদর্শনের মত এ মৃত্যুযন্ত্রণা মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারে। কিন্তু মানস পাপসৃষ্ট কল্পিত যন্ত্রণা পুনরায় পাইতে থাকে।

প্রৌঢ়। শ্রাদ্ধে উপকার কি? মৃত ব্যক্তি সত্যই কি শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে?

ভট্টা। বলা ত হইয়াছে, শ্রাদ্ধের উপকার আতিবাহিক দেহবিমুক্তি। স্বানুরূপ দেহধারণের সাহায্যসম্পাদন, পারলৌকিক আত্মার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি। আর সন্তানের উপাসনালভ্য ভগবৎকৃপা ও বলবতী মনঃশক্তি দ্বারা পারলৌকিক জীবের উর্দ্ধগতির ব্যবস্থাকরণ।

প্রৌঢ়। আমাদের জিজ্ঞাস্য, মৃত ব্যক্তির ক্ষুধাপিপাসা কিরূপ, পানভোজন কিরূপ, তৃপ্তিই বা কি প্রকার? আমরা যেমন পানভোজন করিয়া স্থূলদেহের পুষ্টি করি, সে পুষ্টি ত লিঙ্গদেহে সম্ভব নহে, তবে পানভোজনে কি উপকার?

ভট্টা। জীবদ্দশায় জীব এরূপই ক্ষুৎপিপাসার অভ্যাসের দাস হইয়া থাকে যে, দেহান্তেও সেই অভ্যাসের হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। স্থূলশরীরের যাবতীয় ভাবই সংস্কাররূপে লিঙ্গদেহে অনুবর্ত্তিত হয়। সেই সংস্কারবশে ক্ষুৎপিপাসাত্মিকা বাসনার উদয় হইয়া থাকে, জীবও ক্ষুৎপিপাসাকাতর হইয়া

তজ্জন্য কষ্ট বোধ করে। সংস্কারবশতঃই ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্ভব, সংস্কারবশতঃই তজ্জন্য কষ্ট, সংস্কারজন্যই তাহার আবার নিবৃত্তি। স্থূলদেহে ক্ষুধা ও পিপাসা দৈহিক, সূক্ষ্মদেহে উহা মানসিক। দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধাতৃষ্ণার পার্থক্য থাকিলেও কষ্টভোগ সমানই, তাহার পূরণ জন্য তৃপ্তিও একরূপই। আপনার শুভ কর্ম্মফল থাকিলে ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, কিন্তু কাহার শুভ কর্ম্মফল আছে, তাহা জানা ত কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব পিতৃগণের ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত কষ্ট হইতে যাহাতে অব্যাহতি লাভ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক সন্তানেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আজিকালি মৃতব্যক্তিকে বিজ্ঞানসাহায্যে আনয়ন করার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। তবেই দেখ, কষ্ট দিয়া পিতৃগণকে বৃথা আনয়ন করা অপেক্ষা অন্নজল সম্মুখে রাখিয়া পবিত্র-মন্ত্রসাহায্যে শাস্ত্রের অনুমোদনে পিতৃগণকে আনয়ন করা কি উত্তম কর্ম্ম নহে? নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি যদি জোর করিয়া বৃথা কষ্ট দিতে পরলোকস্থ জীবকে সম্মুখে আনিতে সমর্থ হয়, তবে এক রক্তে জাত সন্তান মন্ত্রশক্তিসাহায্যে পিতৃগণকে অভিপ্রেত স্থানে আকাঙ্ক্ষিত অন্নজলপানের জন্য আনিতে সমর্থ হইবে না কেন?

"ন বৈ দেবা অমৃতমশ্নন্তি দৃষ্ট্বা তু অমৃতেন তৃপ্যন্তি।" দেবতারা যেমন অমৃত দৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত হয়েন, পিতৃগণও তদ্রূপ সন্তানদত্ত শ্রাদ্ধান্ন দৃষ্টি করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। ঐ দৃষ্টিই তাঁহাদের পানভোজন। আকাশস্থ বায়ুভূত নিরালম্ব পিতৃগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া সংস্কারবশতঃ অন্নভোজন করিতেছেন, এইরূপ তদ্গতভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহাদের ক্ষুধা দূরে যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

কবিকথা।

(ভবভূতি)

মালতীমাধব।

(৭)

মকরন্দের সুন্দর শরীরে মালতীর বেশ সন্নিবেশিত হওয়ায়, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। নন্দন বধূভবনে আসিয়া মালতীবেশী মকরন্দের পাণি-গ্রহণ করিলেন। পরিব্রাজিকার কৌশলে মকরন্দ অন্তঃপুরে গুপ্তভাবেই রহিলেন। তাহার পর সকলে নন্দনের বাটীতে আসিলেন। কামন্দকী নন্দনকে সম্ভাষণ করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা মকরন্দের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মিলনের চেষ্টায় ছিলেন। নববধূর আগমনে পরিজনবর্গ অকালে কৌমুদী-মহোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, সেই অবসরে প্রদোষসময়ে তাঁহারা কার্য্যসিদ্ধির উপায় স্থির করিলেন। কিন্তু নন্দন মদনব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সময়ে বধূগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও মালতীবেশী মকরন্দকে প্রসন্ন করার জন্য অনেক অনুনয়বিনয় করিয়া পরিশেষে পাদবন্দনা পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নবপ্রণয়িনী অনুকূলা না হওয়ায়, নন্দন তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে, মকরন্দ তাঁহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার দিলেন। তখন নন্দন ক্রোধে ও দুঃখে স্খলিতবচনে ও স্ফুরিতনয়নে দিব্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'যে আপন কৌমার বন্ধক দিয়াছে, তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই'। এই বলিয়া তিনি বাসভবন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বুদ্ধরক্ষিতা এই সুযোগে লবঙ্গিকাকে মকরন্দের নিকট রাখিয়া মদয়ন্তিকাকে সেখানে আনিবার জন্য তাঁহার নিকট চলিলেন।

মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতার নিকট বরবধূর কথা কিছু কিছু শুনিয়া, বধূগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে মকরন্দ লবঙ্গিকাকে বলিতেছিলেন,—

"লবঙ্গিকে, ভগবতী বুদ্ধরক্ষিতার প্রতি যে কৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কি সফল হইবে?"

লবঙ্গিকা উত্তর দিয়া কহিল,—"তাহাতে আপনার সন্দেহের কারণ নাই। অধিক কি, ঐ শুনুন, নূপুরের শব্দ হইতেছে। বুদ্ধরক্ষিতা আপনাদের এই ব্যাপারের ছলে মদয়ন্তিকাকে লইয়াই আসিতেছে। আপনি উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ ঢাকিয়া নিদ্রিতের ন্যায় হইয়া থাকুন।"

আসিতে আসিতে মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিতেছিলেন,—"সখি, সত্য সত্যই কি মালতী আমার ভ্রাতাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে?"

বুদ্ধরক্ষিতা 'তাহাই যথার্থ' বলিলে, মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"তবে ত দেখিতেছি, অত্যাহিত ঘটিয়াছে। চল, এক্ষণে গিয়া বামশীলা মালতীকে ভৎর্সনা করি।"

তাহার পর তাঁহারা দুই জনে বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সখি, তোমার প্রিয়সখী নিদ্রিতা কি না, জান দেখি?"

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—"সখি, তাঁহাকে আর জাগাইও না। প্রিয়সখী অনেকক্ষণ বিমনা থাকিয়া এইমাত্র একটু ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছি, এস, ধীরে ধীরে এই শয্যাপার্শ্বে উপবেশন কর।"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"এই বামশীলা আবার বিমনা হইল কেন?"

লবঙ্গিকা বলিতে লাগিল,—"আহা! তোমার ভ্রাতার ন্যায় নববধূর বশীকরণে চতুর, রসিক, মধুরভাষী, প্রণয়ী, শান্ত বর লাভ করিয়া, আমার প্রিয়সখী বিমনা না হইয়া কি করিবেন?"

তাহাতে মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিলেন,—"সখি, দেখ, আমরাই এখন বিপরীত তিরস্কার লাভ করিতেছি।"

বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর দিলেন,—"ইহা বিপরীত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে।"

মদয়ন্তিকা তাহা কিরূপ জানিতে চাহিলে, বুদ্ধরক্ষিতা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মালতী যে চরণপতিত স্বামীর প্রতি সম্মান দেখায় নাই, তাহা

লজ্জবাশে বলিয়াই বোধ হয়। তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার করাও যাইতে পারে। কিন্তু প্রিয়সখি, তোমার ভ্রাতা নববধূসমাগমের বিরুদ্ধ সাহসপ্রদর্শনে অকৃত-কার্য্য হইয়া, পরে অস্বাভাবিক ভাবে মহত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, যে অনুচিত বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তোমরাই তিরস্কারের যোগ্য। 'নারীগণ কুসুম-সদৃশ, মৃদুভাবেই তাহাদিগকে ব্যবহারে আনিতে হয়। তাহাদের অভিপ্রায় না জানিয়া বলপ্রয়োগের উপক্রম করিলে, তাহারা মিলনে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে।' ইহাই প্রেমসূত্রকারগণেরই উক্তি।"

লবঙ্গিকাও অশ্রুমোচন করিয়া বলিতে লাগিল,—"ঘরে ঘরে পুরুষেরা কুলকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু কেহই লজ্জাশীলা, নিরীহা, সরলা ও সুন্দরস্বভাবা কুলবালাকে প্রভুত্ব দেখাইব বলিয়া বাক্যানলে প্রজ্বালিত করিয়া তুলে না। এ সকল মহাপমান হৃদয়ের শল্যস্বরূপ, ও আমরণ স্মরণপথে উদিত হইয়া দুঃসহ হইয়া উঠে, এবং পতিগৃহবাসে বিরাগ জন্মাইয়া দেয়। সেইজন্য স্ত্রীজন্ম আত্মীয়স্বজনের নিকট নিন্দনীয় বলিয়াই মনে হয়।"

সে কথায় মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিলেন,—"সখি, প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকে অত্যন্ত সন্তপ্ত দেখিতেছি। আমার ভ্রাতা কি কোন গুরুতর বাক্যাপরাধ করিয়াছেন?"

বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর দিয়া কহিলেন,—"তাহাই বটে। আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি মালতীকে বলিয়াছেন, 'যে আপনার কৌমার বন্ধক দিয়াছে, তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই'।"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা কানে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কি অমর্য্যাদা, কি অনবধানতা! সখি লবঙ্গিকে, এখন তোমাকে মুখ দেখাইতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। তাহা হইলেও সখীস্নেহে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—"আমি তোমারই। যাহা ইচ্ছা অসঙ্কোচে বলিতে পার।"

তখন মদয়ন্তিকা বলিতে লাগিলেন,—"আমার ভ্রাতার দুঃশীলতা ও অনুচিত ব্যবহার থাকুক, তথাপি তিনি যখন তোমার প্রিয়সখীর ভর্ত্তা, তখন তাঁহার চিত্তবৃত্তিরই অনুসরণ করা উচিত। তোমরা যে তাঁহার নীচজনের ন্যায় তিরস্কারের মূল না জান, এমন নহে।"

লবঙ্গিকা কহিল,—"তোমার ভ্রাতা কথার ভঙ্গিতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি আর জানি না ?"

মদয়ন্তিকা বলিলেন,—"আমি যাহা বলিতেছি, শুন। মাধবের প্রতি মালতীর তারামৈত্রক অনুরাগের প্রবাদ সকল লোকের নিকট অধিক পরিমাণে প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাই বলিতেছি প্রিয়সখি, যাহাতে মালতীর হৃদয় হইতে তাঁহার ভর্ত্তার প্রতি উপেক্ষা উন্মুলিত হয়, তাহারই চেষ্টা কর, নতুবা অত্যন্ত দোষ ঘটিবে। এরূপ দূষণীয় অনুরাগের জন্য নির্লজ্জা ও কঠোরা কুলকন্যাগণ লোকের মনে কষ্ট দিয়া থাকে।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"তুমি দেখিতেছি অতি অসাবধান, এবং মিথ্যা লোকপ্রবাদেও মোহিত হইয়া পড়িয়াছ, তুমি দূর হও, তোমার সহিত আমি কোন কথা কহিতে ইচ্ছা করি না।"

তখন মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখি, ক্ষমা কর। আমি তোমাদিগকে স্পষ্টভাবে না বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি না। আমরা সত্য সত্যই মালতীকে মাধবগতপ্রাণা বলিয়া জানি। মালতীর কৃশ ও পরিণত-কেতকীগর্ভের ন্যায় ধূসর অঙ্গে মাধবের স্বহস্তরচিত বকুলমালা যে জীবনস্বরূপ হইয়াছিল, তাহা কে না জানে ? আর মাধবের শরীরটিও যে প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষীণ ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কি আমরা জানি না ? সে দিন কুসুমাকর উদ্যানের পথমুখে যখন উভয়ের মিলন ঘটিল, তখন বিলাসে উল্লসিত, কৌতূহলে উৎফুল্ল ও প্রসারিত নয়নোৎপলের স্নিগ্ধ চারুতারার প্রকাশে, অনঙ্গনাট্যাচার্য্যের উপদেশে যখন তাহাদের দৃষ্টি চতুর, মুগ্ধ ও মধুর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তুমিও কি লক্ষ্য কর নাই ? আবার যখন আমার ভ্রাতার দানের কথা শুনিয়া উচ্ছলিত গভীরাবেগে উভয়ের দেহশোভা মলিন হইয়া উঠিল, এবং হৃদয়ের মৃণবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, তাহাও কি স্মরণ হয় না ? ইহা ব্যতীত আরও মনে হইতেছে।"

সে কথায় লবঙ্গিকা বলিল,—"আরও কি আছে, শুনি।"

তখন মদয়ন্তিকা আবার বলিতে লাগিলেন,—"তবে বলি শুন, যখন আমার সেই মহানুভব জীবনদাতার চৈতন্যলাভের কথা মালতীর নিকট শুনিয়া ভগ-

বতার বচনকৌশলে মাধব আপনার মনঃপ্রাণ পারিতোষিকস্বরূপ মালতীকে স্বয়ং গ্রহণ করিতে বলিলেন, তখন তুমিই লবঙ্গিকা না বলিয়াছিলে, 'এই প্রসাদ আমার প্রিয়সখীরও অভীষ্ট বটে'।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"কে সেই মহাভাগ, তাঁহাকে ত মনে পড়িতেছে না।"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখি, মনে করিয়া দেখ, সে দিন বিকট দুষ্ট ব্যাঘ্ররূপী যমের গোচরে নিপতিতা অশরণা আমাকে যে অকারণ-বান্ধব জীবনদাতা সেই যমসমীপে আসিয়া সকলভুবনসার নিজ দেহ উপহার-প্রদানের সাহসে আমাকে পীবর ভুজদণ্ড দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি আমারই জন্য করুণাবশে নিজ বিশাল বক্ষঃস্থলে দশনাঘাত সহ্য করিয়া, রুধির-ধারায় প্রস্ফুটিত জবাকুসুমমালার ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন, অবশেষে সেই মহারাক্ষস শ্বাপদটাকে নিহত করিয়া ফেলেন, তাঁহারই কথা বলিতেছি।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"তবে কি মকরন্দ?"

মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"প্রিয়সখি, কি বলিলে?"

লবঙ্গিকা আবার বলিল,—"মকরন্দের কথা বলিতেছি।"

শুনিতে শুনিতে মদয়ন্তিকার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। লবঙ্গিকা তখন মদয়ন্তিকার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমাদের সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা যেন মানিয়া লইলাম। কিন্তু তোমার ন্যায় বিশুদ্ধ ও সরল কুলকন্যাজন কথামাত্র শুনিয়া যে অকস্মাৎ বিহ্বল ও কদম্বগোলকের ন্যায় হইয়া উঠিলে, সে বিষয়ে কি বলিব বল দেখি।"

সে কথায় মদয়ন্তিকা কিছু লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখি, আমাকে উপহাস করিতেছ কেন? যে আত্ম-নিরপেক্ষ ব্যক্তি কৃতান্তকবলিত আমার জীবনটি ফিরাইয়া আনিয়া মহোপকার-সাধন করিয়াছেন, কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নামগ্রহণে ও স্মরণে আমি যে শীতল হইয়া উঠি, সে কথা নিশ্চয়ই বলিব। যখন সেই মহাভাগ গাঢ় প্রহারের বেদনায় স্বেদাক্তকলেবরে, মুকুলিত নেত্রনীলোৎপলে ভূমিতলে অসিলতা স্থাপন করিয়া দেহভার বহন করিতেছিলেন, ও কেবল মদয়ন্তিকার নিমিত্তই দুর্লভ জীবলোক পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা ত নিজ চক্ষেই দেখিয়াছ।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার শরীরে স্বেদচিহ্নাদির বিকাশ হইতে লাগিল। বুদ্ধরক্ষিতা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়সখীর শরীরেই মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত হইতেছে।"

মদয়ন্তিকা তাহার উত্তরে বলিলেন,—"তুমি দূর হও, আমি তোমাদের বিশ্বস্ত আলাপনেই পুলকিত হইয়া উঠিতেছি।"

সে কথায় লবঙ্গিকা বলিতে লাগিল,—"সখি মদয়ন্তিকে, যাহা জানিবার, আমরা তাহা জানি, ক্ষমা কর, আর ছলে কাজ নাই, এস, বিশ্বাসভরে অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখী হই।"

শুনিয়া বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে বলিলেন,—"সখি, লবঙ্গিকা ভালই বলিয়াছে।"

মদয়ন্তিকার মনে তাহাই জাগিতেছিল, তিনি তখন বলিয়া ফেলিলেন,—"আমি এখন তোমাদেরই অধীন।"

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তুমি কিরূপে সময় কাটাও বল দেখি।"

মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তবে শুন, প্রিয়সখী বুদ্ধরক্ষিতার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া বিশ্বাসবশে আমার অনুরাগ প্রগাঢ় হইয়া উঠে। ক্রমে হৃদয় কৌতূহল, উৎকণ্ঠা ও মনোরথে পূর্ণ হইতে লাগিল। তাহার পর বিধিনির্দ্দেশে দর্শনলাভ ঘটিলে, দুর্ব্বার দারুণ মদনানলে সন্তাপিত আমার জীবন গতপ্রায় হয়। সে আগুন বাড়িতে বাড়িতে সর্ব্বাঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহার দুঃসহ যন্ত্রণা দেখিয়া সখীগণ বিমনা হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করায় আমি মরণরূপ সুলভ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিতাম, কিন্তু বুদ্ধরক্ষিতা আশ্বাসবাক্যে উদ্বেগ বর্দ্ধিত করায়, সংশয়পূর্ণ চিত্তে দশা-পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছি। সঙ্কল্প ও স্বপ্নসময়ে মনোরথোন্মাদে মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। তিনিও তখন প্রিয়সখি, বর্দ্ধিত বিস্ময়ে অস্থির, চঞ্চল, বিস্তারিত, মদভরে ঘূর্ণিতের ন্যায় ললিত নয়নকমলে আমাকে নিরীক্ষণ করেন। আবার যেন অরবিন্দকেসরভক্ষণে সুরভিতকণ্ঠ রাজহংসের ন্যায় গম্ভীরস্বরে আমাকে 'প্রিয়ে মদয়ন্তিকে' বলিয়া আহ্বান করিয়া, উত্তরীয়াঞ্চল আকর্ষণে প্রবৃত্ত হন। আমি ভীত ও কম্পিত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইলে,

উরুদেশে মেখলা জড়াইয়া যায়, তখন গমনে অশক্ত হইয়া পড়ি। তিনি পরিহাস করিতে করিতে আমাকে ব্যাঘ্রনখক্ষতরূপ পত্রাবলীশোভিত বক্ষঃস্থলে টানিয়া লন, ও বাম কপোলে মধুর অধর স্পর্শ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করিয়া তুলেন। আমি তখন ভয় ও আনন্দে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠি, নয়নযুগল স্তিমিত ও বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। মিলন প্রগাঢ় হইয়া উঠিলে, মন্দভাগিনী আমি সহসা জাগরিত হইয়া পড়ি, ও জীবলোক শূন্যারণ্যের ন্যায় মনে করি।"

লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"সখি, সত্য বল দেখি, তখন বুদ্ধরক্ষিতা স্নেহভরে সস্মিতভাবে তোমায় দেখিতে থাকে কি না, ও তুমি তোমার পরিজনের নিকট আত্মগোপনের চেষ্টা কর কি না ?"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"তুমি দূর হও, কেবল মিথ্যা পরিহাসেই তোমার মতি।"

বুদ্ধরক্ষিতা বলিয়া উঠিলেন,—"সখি মদয়ন্তিকে, মালতীর প্রিয়সখী এই সকল কথা বলিতেই ভাল জানে।"

তাহাতে মদয়ন্তিকা বলিলেন,—"সখি, মালতীকে এইরূপ উপহাস কর কেন ?"

তাহার পর বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"সখি, যদি বিশ্বাস ভঙ্গ না কর, তাহা হইলে তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"সখি, কখনও প্রণয়ভঙ্গে অপরাধিনী হইতে দেখিয়াছ কি ? তুমি ও লবঙ্গিকা এক্ষণে আমার হৃদয়স্বরূপ।"

তখন বুদ্ধরক্ষিতা বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা, আবার যদি মকরন্দ কোনরূপে তোমার নয়নপথে পতিত হন, তাহা হইলে তুমি কি কর বল দেখি ?"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিয়া কহিলেন,—"তাহা হইলে তাঁহার এক একটি অবয়বে চক্ষু দুইটিকে চিরনিশ্চল রাখিয়া সুশীতল করিয়া তুলি।"

বুদ্ধরক্ষিতা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আর যদি সেই পুরুষোত্তম মদনপ্রেরিত হইয়া তোমাকে কন্দর্পজননী রুক্মিণীর ন্যায় স্বয়ংগ্রহণে সহধর্ম্মচারিণী করিয়া বসেন, তাহা হইলে কেমন হয় বল দেখি ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"কেন এরূপ আশ্বাস দিতেছ ?"

বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন,—"না, না, সখি, বল।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"হৃদয়াবেগের সূচক দীর্ঘনিঃশ্বাসই তাহা বলিয়া দিতেছে।"

মদয়ন্তিকা বলিতে লাগিলেন,—"সখি, তিনি আপনাকে পণ দিয়া দুষ্ট শার্দ্দূলের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া যে শরীর কিনিয়া লইয়াছেন, আমি তাহার কে ?"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"এ কথা কৃতজ্ঞতার অনুরূপই বটে।"

বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন,—"ইহাই যেন স্মরণ থাকে।"

সেই সময়ে দ্বিতীয় প্রহরের ঘটিকাবাদ্য বাজিয়া উঠিল। তখন মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"আমি তবে যাই, ও ভ্রাতাকে দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়া মালতীর পায়ে ধরিয়া প্রসন্ন করার চেষ্টা করিতে বলি।"

এই বলিয়া তিনি যেমন উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইবেন, অমনি মকরন্দ মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। মদয়ন্তিকা তাঁহাকে মালতী মনে করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সখি মালতি, নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে কি ?"

তাহার পর মকরন্দকে বুঝিতে পারিয়া সানন্দে ও সভয়ে বলিলেন,—"এ যে আর এক ব্যাপার ঘটিল দেখিতেছি।"

তখন মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"সুন্দরি, ভয় পরিত্যাগ কর। তোমার ক্ষীণ কটি বক্ষোভারের কম্প সহ্য করিতে পারিতেছে না। তুমি যাহার প্রণয়ানুগ্রহের কথা বলিতেছিলে, এই সেই তোমার সঙ্কল্পসুখে পরিচিত দাস উপস্থিত।"

বুদ্ধরক্ষিতা তখন মদয়ন্তিকার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"যাহাকে সহস্র সহস্র মনোরথে বরণ করিয়াছ, এই সেই প্রিয়তম। অমাত্যভবনে এক্ষণে লোকসকল সুপ্ত ও প্রমত্ত, অন্ধকারও প্রগাঢ়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মণিনূপুর উপরে তুলিয়া নীরব করিয়া দাও, এস, আমরা পলায়ন করি।"

মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাইব ?"

বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর দিলেন,—"যেখানে মালতী আছে।"

মদয়ন্তিকা বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি মালতী আত্মনিবেদন সম্পন্ন করিয়াছে ?"

বুদ্ধরক্ষিতা কহিলেন,—"তাহাই বটে। আর তুমিও না বলিয়াছ, ইনি আপনাকে পণ দিয়া তোমার শরীর কিনিয়া লইয়াছেন?"

তখন মদয়ন্তিকার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বুদ্ধরক্ষিতা মকরন্দকে বলিলেন,—"মহাভাগ, প্রিয়সখী আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।"

মকরন্দ তখন বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমার সাতিশয় বিজয়লাভ হইল, আজ আমার সফল যৌবনের উৎসবদিবস, ইহার পর আর কি থাকিতে পারে? আজ ভগবান্ কামদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বন্ধুকার্য্য সম্পাদন করিলেন। চল, এই পার্শ্বদ্বার দিয়া আমরা বাহির হইয়া যাই।"

এই বলিয়া গোপনে তাঁহারা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইতে যাইতে সকলে সেই নিশীথকালে জনশূন্য রাজপথের রমণীয়তা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সে সময়ে প্রাসাদশিখরের বাতায়নপথে পরিভ্রমণের পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, উৎকট মদ্যগন্ধে আমোদিত, পুষ্পমালার সৌরভে পূর্ণ, কর্পূরবাসিত সমীরতরঙ্গ যুবকদিগের নববধূসমাগম ব্যক্ত করিতেছিল।

প্রতিধ্বনি।

দেবকণ্ঠচ্যুত বাণী পড়িয়া ধরায়
যবে অপমৃত্যু লভি জীবন হারায়
প্রেতাত্মা রহিল তার প্রতিধ্বনিরূপে
ঘুরে সদা গুহা বনে বৃক্ষে শৈলে কূপে।
অট্টহাসে ব্যঙ্গ করে প্রতিশব্দে তাই
এ প্রেতের লাগি বিশ্বে কোন গয়া নাই।
ভূতের উৎপাত এ যে বিষম ব্যাপার
নীরব করাতে চাহে সমগ্র সংসার।

শ্রীকালিদাস রায়।

দিল্লী।

মুসলমান রাজত্ব।

(পাঠান শাসনকাল—তোগলকবংশ)

গিয়াসুদ্দীনের পিতা তোগলক তুর্কী জাতীয় ও বল্‌বন বাদসাহের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি এক জাঠ রমণীকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে গিয়াসুদ্দীনের জন্ম হয়। তোগলকের পর হইতে তাঁহার বংশধরগণের উপাধিও তোগলক হইয়া উঠে। গিয়াসুদ্দীন তোগলক রাজ্যশাসনে সুব্যবস্থা করিয়া পুরাতন প্রাসাদ ও দুর্গাদির সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্বে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন, এবং তাহা তোগলকাবাদ নামে অভিহিত হয়। আমীর ওমরারা সপরিবারে তথায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন।* অদ্যাপি তোগলকাবাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

গিয়াসুদ্দীনের পুত্র ফকিরুদ্দীন জুনা খাঁ দাক্ষিণাত্যের গোলযোগ নিবারণের জন্য প্রেরিত হন। দেবগিরি ও আরঙ্গল দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করায়, জুনা খাঁ দেবগিরি লুণ্ঠন করিয়া আরঙ্গল অবরোধ করেন, এবং রুদ্দরদেবকে সপরিবারে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন।

বল্‌বনের পুত্র নাসিরুদ্দীন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আলাউদ্দীন খিলিজীর সময় পূর্ব্ববঙ্গ একটি স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, বাহাদুর খাঁ তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, এবং সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপিত হয়। বাহাদুর খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করায়, গিয়াসুদ্দীন তাঁহার দমনের জন্য বঙ্গরাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেন, তাঁহার পালিত পুত্র তাতার খাঁ বাহাদুর খাঁকে পরাজিত ও বহরম খাঁ উপাধি ধারণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। গিয়াসুদ্দীন এই সময়ে ত্রিহুত জয় করিয়া আমেদ খাঁকে তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গিয়াসুদ্দীন আফ্‌গানপুর নামক স্থানে

* "The Sultan had made Tughlikabad his capital, and the nobles and officials, with their wives and families, had taken up their abode there, and had built houses." (Elliot vol III p. 234.)

জ্যেষ্ঠপুত্র জুনা খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কাষ্ঠময় প্রাসাদে প্রবেশ করিলে, সহসা তাহা পতিত হইয়া তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান ঘটাইয়া দেয়। কেহ কেহ বজ্রাঘাত এবং কেহ কেহ জুনার কৌশলই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

জুনা খাঁ মহম্মদ সা উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি অনেক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, ও বিদ্যার সমাদর করিতেন। কিন্তু অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় তাঁহার চরিত্রকে কঠোর করিয়া তুলে। প্রাণদণ্ডে তিনি হিন্দু মুসলমান কাহাকেও অব্যাহতি দিতেন না। তজ্জন্য মুসলমানেরা তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে ও অদ্ভুত খেয়ালে প্রজাগণ উত্যক্ত হইয়া উঠে, রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। গুজরাট ও দেবগিরি ব্যতীত সমগ্র দূরবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, অবশেষে দেবগিরিও হস্তচ্যুত হয়। দুর্ভিক্ষে তাঁহার রাজ্য ছারখার হইয়া যায়।

মোগলেরাও ভারতবর্ষে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করে। তর্ম্মশিরিন্ নামে মোগল সর্দ্দার ভারত আক্রমণ করিলে মহম্মদ তোগলক তাঁহাকে অনেক ধন-রত্ন দিয়া বিদায় করিয়া দেন।

মহম্মদ তোগলক গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব প্রদেশে প্রজাদিগের কর-বৃদ্ধি করায়, তাহারা সমস্ত ভূমি ছাড়িয়া পলায়ন করে। অন্যান্য স্থানের প্রজারাও করবৃদ্ধির ভয়ে ভীত হইয়া জঙ্গলে পলাইয়া যায়। রাজ্যমধ্যে শস্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে।

দেবগিরিকে দৌলতাবাদ নামে অভিহিত করিয়া মহম্মদ তোগলক তথায় রাজধানী স্থাপনের ইচ্ছা করেন, এবং আমীর, ওমরা, সৈনিক প্রভৃতিকে বাধ্য করিয়া সপরিবারে তথায় লইয়া যান। পথিমধ্যে অনেকে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। এ দিকে দিল্লীও জনশূন্য হইয়া উঠে, অন্যান্য স্থান হইতে দিল্লীতে লোকজন লইয়া আসিলেও দিল্লী হতশ্রী হইয়া পড়ে কিছুকাল পরে আবার তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন।

মহম্মদ তোগলকের আর এক খেয়াল, তাম্রমুদ্রার প্রচলন। ইহাতে স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার অপ্রচলিত হওয়ায় রাজ্যমধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্বর্ণরৌপ্যের স্থান তাম্রই অধিকার করিয়া বসে, অবশেষে তিনি তাহা

প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। চীন দেশের অনুকরণে তিনি কাগজের নোট প্রচলনেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজ্যবিস্তারের লোভে মহম্মদ তোগলক খোরাসান প্রভৃতি আক্রমণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চীনদেশ জয়ের জন্ম অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহারা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

ক্রমে সমস্ত রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে থাকে। মুলতানের শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিলে, তাঁহাকে দমন করা হয়। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে, ফকিরুদ্দীন নামে এক ব্যক্তি লক্ষ্মণাবতীর কদর খাঁকে নিহত করিয়া লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম অধিকারের পর সমগ্র বঙ্গে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। দাক্ষিণাত্যে লঙ্গরদেবের পুত্র কৃষ্ণনায়ক স্বাধীন হইয়া উঠেন, কর্ণাটের বিললদেব তাঁহার সহিত যোগ দেন, দাক্ষিণাত্যে আবার হিন্দুপ্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠে। অবশেষে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃকও বিদ্রোহের সূচনা হয়। হাসেন কাঙ্গু (গঙ্গু) নামে একজন মুসলমান, দেবগিরি প্রভৃতি অধিকার করিয়া দাক্ষিণাত্যে বামনীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিম ভারতবর্ষেও বিদ্রোহের সূচনা হইলে মহম্মদ তোগলক তাহার দমনে সিন্ধুনদের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন ও তথায় ঠাটার নিকট অবশেষে তিনি নিজ জীবন বিসর্জ্জন দেন।

মহম্মদ তোগলকের পর গিয়াসুদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ খাঁ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। খাজা জাহান নামে আমীর মহম্মদ সাহের এক পুত্রকে মসনদে স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অবশেষে তিনি ফিরোজেরই বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হন। ফিরোজ বাকী কর হইতে প্রজাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়া এবং কর্ম্মচারিগণকে অনেক পরিমাণে পারিতোষিক ও জায়গীর প্রদান করিয়া সকলের নিকট আদরণীয় হইয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুদিগের প্রতি তিনি কঠোর ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে দগ্ধ ও তাঁহাদের প্রতি জিজিয়া-করস্থাপন উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাঙ্গালার স্বাধীন শাসনকর্ত্তা ফকিরুদ্দীন আলি মোবারক নামে রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিহত হইলে আলি মোবারক আলাউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া

বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনিও অল্পকাল পরে তাঁহার ধাত্রীপুত্র হাজি ইলায়স কর্ত্তৃক নিহত হন। ফিরোজ সা হাজি ইলায়সকে দমন করিবার জন্য বঙ্গরাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। ইলায়স একডালা দুর্গে আশ্রয় লন। তাঁহার পুত্র পাণ্ডুয়ার বাদসাহকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। বাদসাহ অনেকদিন পর্য্যন্ত একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া বর্ষাগমের জন্য ইলায়সের সহিত সন্ধি করিতে স্বীকার করেন। সামান্যমাত্র করপ্রদানে বাঙ্গালা স্বাধীন হইয়া উঠে। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যকেও সামান্য করগ্রহণে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা হয়।

ইলায়সের মৃত্যুর পর ফিরোজ আবার বাঙ্গালা অধিকারে গমন করেন। তিনি পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে ইলায়সের পুত্র সেকেন্দার একডালা দুর্গে পলাইয়া যান। কয়েক সপ্তাহ একডালা অবরোধের পর বাদসাহ আবার সেকেন্দারের সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই সময়ে তিনি উড়িষ্যার রাজনগর অধিকার করিয়া আসেন।

ইহার পর নাগরকোট আক্রমণ এবং তথাকার দেবতাকে চূর্ণবিচূর্ণ ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া ফিরোজ সা সিন্ধুনদীর তীরে ঠাটা প্রদেশ অভিমুখে ধাবিত হন। উক্ত প্রদেশের অধীশ্বর দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান অধীশ্বর জাম ও বাবীণীয় স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করায় ফিরোজ সা তাঁহাদেরই দমনে গমন করেন। জাম ও বাবীণীও অবশেষে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

ক্রমে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায় ফিরোজ সা তাঁহার উজীরের বশীভূত হইয়া পড়েন। উজীর সাজাদা মহম্মদের প্রতি বাদসাহের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দেন। সাজাদা কিন্তু পিতার নিকট আপনার নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়া তাঁহার অনুমতি-ক্রমে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। নূতন বাদসাহের প্রতি কর্ম্মচারিগণ অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠে। অবশেষে কর্ম্মচারিগণ আবার ফিরোজ সাকেই মসনদে বসাইবার ব্যবস্থা করেন। মহম্মদ পলাইয়া যান। অল্পদিন পরে নব্বই বৎসর বয়সে ফিরোজের প্রাণ-বায়ুর অবসান ঘটে।

ফিরোজ সার গৌরবের জন্য মিশরের খলিফা সম্মানচিহ্ন পাঠাইয়া দেন।

তাঁহার সময়ে প্রজারা সুখে কালযাপন করিত, কর্ম্মচারীরাও যথেষ্ট সুখভোগ করিয়াছিলেন। ফিরোজ ৪৮, ২৫, ২৪, ১২, ১০, ৮, ৬ ও ১৲ টাকা মূল্যের মুদ্রার প্রচলন করেন। তাসি ঘড়িয়াল বা ঘটিকাযন্ত্রের আবিষ্কারে তিনি লোকের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে পাঁচক্রোশ দূরে যমুনার তীরে তিনি ফিরোজাবাদ নামক নূতন দিল্লীর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা সৌধাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ক্রমে দিল্লী ও ফিরোজাবাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান প্রতিনিয়ত জনসমূহে পূর্ণ হইতে থাকে। * অদ্যাপি ফিরোজাবাদের ধ্বংসাবশেষ নয়নপথে নিপতিত হয়।

* "The Sultan having selected a site at the village of Gawin, on the banks of Jamuna, founded the city of Firozabad, before he went to Lakhnauti the second time. Here he commenced a place and the nobles of his court having also obtained (giriftand) houses there, a new town sprang up, five Kos distant from Delhi. Eighteen places were included in this town, the kasba of Indrapat, the sarai of Shaikh Malik Yar Paran, the Sarai of Shaikh Abu Bakr Tusi, the village of Gawin, the land of Khitwara, the land of Lahrawat, the land of Andhawali, the land of the Sarai of Malika, the land of the tomb of Sultan Razya, the land of Bhare, the land of Mohrola, and the land of Sultanpur. So many buildings were erected that from the Kasba to Inarpat to the Kushk-i shikar, five kos apart, all the land was occupied. There were eight public mosques and one private mosque. The public mosques were each large enough to accommodate 10,000 supplicants.

During the forty years of the reign of the excellent Sultan Firoz, people used to go for pleasure from Delhi to Firozabad, and from Firozabad to Dilhi, in such numbers, that every kos of the five kos between the two towns swarmed with people, as with ants or locusts. To accommodate this great traffic, there were public carriers who kept carriages; mules (sutur), and horses, which were ready for hire at a settled rate every morning after prayers, so that the traveller could make the trip as seemed to him best, and arrive at a stated time Palankin-bearers were also ready to convey passengers. The fare of carriage was four silver jitals for each person : of a mule (sutur) six, of a horse, twelve ; and of a palankin, half a tanka. There was also plenty of porters ready for employment by any one, and they earned a good livelihood. Such was the prosperity of this district ; but it was so ravaged by the Mughals, that the inhabitants were scattered in all directions. This was the will of God, and none can gainsay it." (Elliot vol III p.p. 302-303.)

ফিরোজাবাদ ব্যতীত ফিরোজ সা হিসারফিরোজ প্রভৃতি আরও কয়েকটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং যমুনা প্রভৃতি হইতে খাল কাটাইয়া প্রজাগণের উপকার সাধন করাইয়াছিলেন। * তিনি অনেক সৌধ নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, মস্জীদ প্রতিষ্ঠা, দুর্গ ও সমাধিস্থান প্রভৃতি সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া প্রশংসা লাভ করেন। † তদ্ভিন্ন রোগীদিগের জন্য

* "In the year 755, Feroze built the city of Ferozabad adjoining to Delhi; and on the 12th of Shaban he marched to Depalpoor, and constructed a canal 48 coss in length, from the Sutloog to the Kugur. In the year 757 he constructed another canal, between the hills of Mundvy and Surmore, from the Jumna, into which he had seven other minor streams, which all uniting, ran in one chanel through Hansy, and from thence to Raiseen, where he built a strong fort which he called Hissar Feroza. He also conveyed an aqueduct from the Kugur, over the river Soorsulty, to the village of Pery Kehra, where he founded a city named after him Ferozabad. At the same time he introduced another canal from the Jumna, which filled a large lake he caused to be constructed Hissar Feroza." (Briggs Ferishta).

† "Sultan Firoz excelled all his predecessors on the throne of Delhi in the erection of buildings, indeed no monarch of any country surpassed him. He built cities forts, palaces, bands, mosques, and tombs, in great numbers. Of cities, there were Hisar Firozah and Fath abad, of which the author has given an account in a previous chapter. Firoz abad, Firoz-abad Harni, Khira, Tughlikpur-i Kasna, Tughlikpur-i Muluk-i Kamut, and Jaunpur, besides sundry other places and forts which he repaired and strengthened. His places (Kushk) were those of Firoz, Nuzul, Mahandwari, Hisar Firozah, Fath-abad, Jaunpur, Shikar, Band-i Fath Khan and Salaura. Bands: Fath Khan Malja (into which he threw a body of fresh water, ab- zamzam) Mahpalpur Shukr Khan Salaura, Wazirabad, and other similar strongs and substantial lands.

He also built monasteries, and inns for the accommodation of travellers. One hundred and twenty Khankahs (monasteries) were built in Dehli and Firozabad for the accommodation of the people of God, in which travellers from all directions were receivable as guests for three days. These one hundred and twenty buildings were full of guests on

all the three hundred and sixty days of the year. Superintendants and officers of the Sunni persuasion were appointed to these Khankahs, and the funds for their expences were furnished from the public treasury. Malik Ghazi Shahana was the chief architect, and was very efficient, he held the gold staff (of office). Abdu-l Hakk, otherwise Jahir Sundhar (was deputy, and) held the golden axe. A clever and qualified superintendent was appointed over every class of artisans. The Sultan also repaired the tombs of former kings. It is a custom among kings while they are on the throne to appropriate villages and lands to religious men in order to provide means for the maintenance and repair of their tombs. But these endowments had all been destroyed, and the grantees being divested of them, were reduced to distress. The Sultan carefully repaired all the tombs and restored the lands and villages after bringing into cultivation such as had been laid waste. He also sought out and restored the superintendents and officers of these endowments who had been driven out of them. The financial officer (dewan-i wizarat) examined the plan of every proposed building, and made provision so that the work should not be stopped for want of funds. The necessary money was issued from the royal treasury to the manager of the building and then the work was begun. Thus it was that so many buildings of different kinds were erected in the reign of Firoz Shah." (Elliot vol III p.p. 354-355)

"The following are the public works constructed during the reign of this prince :—

50 Dams across rivers to promote irrigation.
40 Mosques.
30 Colleges with mosques attached.
20 Palaces.
100 Caravausaras,
200 Towns.
30 Reservoirs or lakes for irrigating lands,
100 Hospitals,
5 Mausoalea,
100 Public baths,
10 Monumental pillars,
10 Public wells,
150 Bridges ;

Besides numerous gardens and pleasure houses. Lands were alienated, at the same time, for the maintenance of these public buildings, in-ord keep them in through repair." (Briggs Ferishta.)

হাঁসপাতালও স্থাপিত হয়। * ধর্ম্মকার্য্যেও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন।

দিল্লীতে যে দুইটি অশোকস্তম্ভ দৃষ্ট হয়, তাহা ফিরোজ শাহাই আনয়ন করেন, একটি খিজিরাবাদ প্রদেশের তোরবা নামক স্থান হইতে ও আর একটি মিরাটের নিকট হইতে আনীত হয়। ফিরোজ শা একটিকে ফিরোজাবাদের প্রাসাদে ও অপরটিকে শীকারভবনে স্থাপিত করেন। † প্রথমটি অদ্যাপি ফিরোজ শার কোটিলা নামক স্থানে ও দ্বিতীয়টি সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভের নিকট অবস্থিতি করিতেছে।

ফিরোজ শাহার পর তাঁহার পৌত্র ও শাজাদা ফতে খাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন মসনদে উপবিষ্ট হন। তিনি নিজ আত্মীয়স্বজনের প্রতি অত্যাচার করায় তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। গিয়াসুদ্দীন অবশেষে জীবন বিসর্জ্জন দেন। তাহার পর শাজাদা জাফর খাঁর পুত্র আবুবকর কিছু কাল বাদশাহ হন, কিন্তু শাজাদা নাসিরুদ্দীন মহম্মদ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়বার সিংহাসনে

* "The Sultan, in his great kindness and humanity, established a hospital for the relief of the sick and afflicted, whether natives (ashna) or strangers. Ably physicians and doctors were appointed to superintend it, and provision was made for the supply of medicines. The poor afflicted went to the hospital and stated their cases. The doctors duly considered and applied their skill to the restoration of health. Medicines food, and drinks were supplied at the expense of the treasury." (Elliot voll III p. 361).

† After Sultan Firoz returned from his expedition against Thatta, he often made excursions in the neighbourhood of Delhi, In this part of the country there were two stone columns. One was in the village of Tobra, in the district (Shikk) of salaura and Khizrabad, in the hills (koh-payah); the other in the vicinity of .the town of Mirat. These columns had stood in those places from the days of the Pandavas, but had never attracted the attention of any of the kings who sat upon the throne of Delhi, till Sultan Firoz noticed them, and, with great exertion. brought them away. One was erected in the palace (kushk) at Firoza bad, near the Masjid-i jama' and was called the Minara-i zarin, or Golden column, and the other was erected in the Kushk-i Shikar or Hunting Palace with great labour and skill." (Elliot vol III p. 350).

আরোহণ করেন। মহম্মদের সময় গুজরাট ও লাহোরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর রাজত্বের পর মহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন কয়েক দিবসের জন্য মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের পর মহম্মদের অল্পবয়স্ক পুত্র মামুদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু কোন কোন ওমরা শাজাদা ফতে খাঁর পুত্র নসরৎ খাঁকে লইয়া মামুদকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করেন। তিন বৎসর ব্যাপিয়া এই গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মোগলবীর তৈমুরের পৌত্র পীরমহম্মদ জাহাঙ্গীর সিন্ধুপার হইয়া পাঞ্জাবপ্রদেশে উপস্থিত হন। তাহার পর স্বয়ং তৈমুরই আগমন করেন।

তৈমুর গাজি বা ধর্ম্মবীর হওয়ার অভিলাষে হিন্দুদিগকে ধ্বংস করার জন্য ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। সে সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্যও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সিন্ধুনদ পার হইয়া তৈমুর মুলতানে পীরমহম্মদের সহিত মিলিত হন। তাহার পর ভাটনীর দুর্গ অধিকার করিয়া সরস্বতী বা পানিপথের পথে দিল্লী আগমন করেন। প্রথমে তাঁহার কতিপয় সৈন্য দিল্লীর চারিদিক্ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময়ে মামুদ তোগলকের সৈন্যেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতে বাধ্য হয়। মামুদ তোগলক পলায়ন করেন। তৈমুরের সহিত যে সমস্ত হিন্দু বন্দী ছিল, তাহারা মোগলদিগকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করায়, তৈমুর প্রায় লক্ষ হিন্দুর মস্তকচ্ছেদের আদেশ দেন। ক্রমে মোগল সৈন্যেরা দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া নররক্তে রাজপথ সকল রঞ্জিত করিয়া তুলে, নগর-বাসিগণের ধনরত্ন বিলুণ্ঠিত হইয়া যায়, অনেকে বন্দী হইতে বাধ্য হয়। হিন্দুরা নিজ নিজ বাসভবনে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগকে অনলমুখে সমর্পণ করে। সমগ্র নগরীতে নরহত্যার এক বিরাট্ অভিনয় সংঘটিত হয়। আমীর ওমরা ও বণিক্ মহাজনদিগের নিকট হইতে ধনরত্ন সংগ্রহের চেষ্টা হইলে, তাঁহারা নিজ নিজ ভবনদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন, কিন্তু মোগল সৈন্যেরা সে সকল ভঙ্গ করিয়া সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া আনে। পুরাতন দিল্লী, নূতন দিল্লী সকল স্থানই বিলুণ্ঠিত হয়। এইরূপে দিল্লী নগরীকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়া তৈমুর মিরাট অভিমুখে অগ্রসর হন। মিরাট দুর্গ অধিকারের পর তিনি শিবালিক, নাগরকোট, জম্বু প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া

নিজ রাজধানী সমরখণ্ড অভিমুখে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি খিজির খাঁকে আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান।

তৈমুরের দিল্লী পরিত্যাগের পর নসরৎ খাঁ তথায় প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি অচিরেই বিতাড়িত হন। তাহার পর মামুদ তোগলক ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্য সামান্য কয়েকখানি গ্রামে বিস্তৃত ছিল। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠে। কিছুকাল পরে মামুদ তোগলকের মৃত্যু হইলে, দৌলত খাঁ লোদী মসনদে উপবেশন করেন, কিন্তু তিনি খিজির খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খিজির খাঁই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আমি কে ?

আমি কি রাধা, মাধব,
অর্জ্জুন, উদ্ধব ;
বিশ্বামিত্র, মিল, নক্স,
ভীষ্ম, অত্রি, ফক্স ;
জর্জ, ভিক্টোরিয়া, সীতা,
স্নেহময়ী মাতা ;
ভবের কাণ্ডারী গুরু
দাতাকল্পতরু ?
আমি কি বেদ, বেদান্ত,
সিসিরো বেশান্ত ;
মৈত্রী, শুক, বাইবেল,
পুরু, দান্তে, টেল ;

বিদ্যাসাগর, কেশব,
মিল্টন, বাসব ;
চৈতন্য, নগেন্দ্র, বার্ক,
মহম্মদ, মার্ক ?
আমি কি ধন, মাণিক্য,
পাতঞ্জল, শাক্য ;
টলষ্টয়, রুসোপ্লিনি,
কমটি, ম্যাজিনি ;
ওয়াট্, ষ্টিফেন্‌সন্,
ভল্টা, নিউটন ;
ঈশা, জনা, আকবর,
প্রহ্লাদ, ভাস্কর ?
আমি কি গিরি, সমুদ্র,
উচ্চ, নীচ, ভদ্র ;
প্লেটো, ভীম, সক্রেটিস,
নল, জগদীশ ;
কালিদাস, সাংখ্য, ব্যাস,
শৌচ, যোগাভ্যাস ;
পৃথিবীর উর্ব্বরতা,
জাতির একতা ?
আমি কি বৈকুণ্ঠ, ব্যোম,
রসাতল, সোম ;
ক্যাণ্ট, ধ্রুব, সেক্ষপির,
রাম, যুধিষ্ঠির ;

জগতের কেন্দ্র ভানু
নিয়ামক মনু ;
রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য,
ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ?

আমি কি জরা, মরণ,
অন্তিম শরণ ;
অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর,
প্রতাপ, শঙ্কর ;

অহিংসা, দয়া, আতিথ্য,
স্বাস্থ্য, রোগ, পথ্য ;
নানক, নিতাই, মীরা,
বাণী, বুদ্ধি ধীরা ?

আমি কি সোতি, মন্মথ,
রবীন্দ্র, প্রমথ ;
ব্রহ্মা, যম, রমানাথ,
বরুণ, শ্রীনাথ ;

বর্ষা, কোকিল, বসন্ত,
নিশীথ, হেমন্ত ;
ঠগ, পঙ্গু, মূক, অন্ধ,
কুসুমের গন্ধ ?

আমি কি ন্যায়বাগীশ,
প্রফুল্ল, হরিশ ;
উনপঞ্চাশ পবন,
তারা অগণন ;

ভৈরবী, কালী, কেদার,
হোম, বৈশ্বানর ;
পুরাণ, কোরাণ, গীতা,
পূজনীয় পিতা ?

আমি কি অশ্বত্থ, জাম,
হরীতকী আম ;
জীবের স্বাধীন ইচ্ছা,
ভক্তমনোবাঞ্ছা ;

সমাজ, ধৃতি, বিজ্ঞান,
সমাধি, অজ্ঞান ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম, খনি, কৃষি,
নারদাদি ঋষি ?

আমি কি দ্বেষানুরাগ,
মস্তিষ্ক, সোহাগ ;
পদ্মিনী, ক্ষমা, ধরিত্রী,
গো, গঙ্গা, সাবিত্রী ;

তস্কর, অরাতি, হেয়,
স্বামী পুত্র প্রেয়,
মধু, ভরদ্বাজ, বলি,
পাখীর কাকলি ?

এ সবের কিছু নই,
অথচ সকলি ;
ছায়া কায়ার প্রভেদ
বুঝহ হেঁয়ালি।

আমি একমাত্র নিত্য,
সকলি অনিত্য ;
কাম্নণসলিলে ছায়া,
জেন সব মায়া।

সকলই জলবুদ্বুদ প্রায় ;
আমাতে উৎপত্তি, স্থিতি, আমাতেই লয়।
ক্ষণেকের তরে বুদ্বুদ রয়,
ঘুরে ঘুরে খেলা করে পুনঃ ফেটে যায় ;

ফাটার কালের সমবেত বলে
নূতন বুদ্বুদ তোলে ;
হেলে ছুলে আবার পায় লয়।
তাই এ জন্মের সতী যিনি
পরজন্মের পার্ব্বতীই তিনি।

শ্রীঅমরনাথ সিংহ।

পৃথ্বীরাজ।

প্রথম খণ্ড।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহপ্রস্তাব।

ফাল্গুনমাস, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, শিবরাত্রির উৎসব, সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। শিবমন্দিরে পুরনারীগণ দলে দলে পুষ্প, বিল্বপত্র, চন্দন, নৈবেদ্য লইয়া যাইতে লাগিলেন। শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রদোষ হইতেই মহাদেবের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। আবার নিজ নিজ ভবনে অনেকে পার্থিব শিবলিঙ্গেরও অর্চ্চনা করিতেছেন।

রাজা সোমেশ্বর পূজা, জপ, হোম প্রভৃতিতে চারি প্রহর রাত্রি জাগরণ করিয়া যথারীতি শিবশিবার অর্চনা ও স্তুতি করিলেন। প্রাতঃস্নান ও পঞ্চগব্য-পানের পর তিনি স্বর্ণতুলা করিয়া দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ ও অতিথি ভোজনের ব্যবস্থা হইল। এইরূপে ব্রত সম্পন্ন করিয়া সোমেশ্বর পৃথ্বীরাজের বিবাহপত্র পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজের আট বৎসর বয়সের সময় মাতামহালয় দিল্লীতে যান, সেখানে মন্তোবরের রাজা নাহর রায়ও আসেন, নাহর রায়—একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, সে সময়ে পত্তনে চালুক্য ভীমদেব, আবুগড়ে প্রমার সলখ, মেবারে শিশোদীয় সমরসিংহ, দিল্লীতে তোমর অনঙ্গপাল ও মন্তোবরে পরিহার নাহর রায়ের পরাক্রমের কথাই শুনা যাইত। নাহর রায় পৃথ্বীরাজের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গলে মালা পরাইয়া দেন, ও তাঁহার ষোল বৎসর বয়সে তাঁহাকে নিজ কন্যা দান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। নাহর রায়ের সেই অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া সোমেশ্বর মন্তোবরে পৃথ্বীরাজের বিবাহপত্র পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন।

একজন বিচক্ষণ দূত বিবাহপত্র লইয়া চলিল। তাহাতে পৃথ্বীরাজের রূপগুণ ও নাহর রায়ের গৌরবের কথা লিখিত ছিল। নাহর রায় কিন্তু ইহার মধ্যে নিজের মতপরিবর্তন করিয়া ফেলেন। দূত পত্র দিলে তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, আজমীরের চৌহানকুল তাঁহার বংশের উপযোগী নহে। কাজেই তিনি বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না। দূত পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল, ও সোমেশ্বরের হস্তে তাহা দিল। উত্তর দেখিয়া সোমেশ্বর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, ক্রমে পৃথ্বীরাজের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। তখন তিনি সামন্তগণ সহ পিতার নিকট আসিলেন। নাহর রায়ের উত্তর শুনিয়া সামন্তগণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

কাকা কণ্হ বলিলেন,—"যেরূপে হউক, কন্যা আনিতেই হইবে।"

সোমেশ্বর—"এক্ষণে বিনা যুদ্ধে কি তাহাই ঘটিবে?"

কাকা কণ্হ—"আমরা ত তাহাই চাই।"

চামণ্ড রায় বলিতে লাগিলেন—"সোমেশ্বর ও পৃথ্বীরাজের শক্তির পরিচয় এখনও পর্য্যন্ত কি রাজপুত রাজারা পান নাই?"

কাকা কণ্ব—"চৌহানকুল কি শক্তিশূন্য হইয়াছে ?"

লোহানা বলিলেন—"মন্তোবর লইতে বেশী শক্তির প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না।"

সোমেশ্বর উত্তর করিলেন,—"তবে তোমরা যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর।"

কাকা কণ্ব—"না দাদা, পরিহারের কুলকন্যা চৌহানের ঘরে আনিতেই হইবে।"

এইবার পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"পিতার আজ্ঞা পাইলে সেবক নাহর রায়কে বাঁধিয়া শ্রীচরণে উপস্থিত করিতে পারে।"

সোমেশ্বর—"নাহর রায় আসুক বা না আসুক, তাহার কন্যাকেই আনার প্রয়োজন।"

তখন পৃথ্বীরাজ ও সামন্তগণ বলিয়া উঠিলেন,—"আজমীরেশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া তাঁহারা তথা হইতে চলিয়া গেলেন ও মন্তোবর যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

—:০:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শক্তিপরীক্ষা।

পত্তনপুরের নিকট একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছিল। তাহার তীরে অনেকগুলি শিবির স্বচ্ছ সলিলে আপনাদের শ্বেতচ্ছবি প্রতিবিম্বিত করিতেছিল। শিবিরমধ্যে অস্ত্রের ঝঞ্চনা, জনকোলাহল, হস্তী ও অশ্বের বিকট শব্দে একটি তুমুল তুফান উঠিতেছিল, দেখিতে দেখিতে শিবিরগুলি তীর হইতে উঠিয়া গেল। তখন নদীগর্ভে সেই তুফানটি আসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা পরপারে আসিয়া পৌছিল। চৌহানের শক্তিপরীক্ষার জন্য এই জঙ্গম তুফানটি আজমীর হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে, পৃথ্বীরাজ সৈন্যসামন্ত সহ নাহর রায়কে আক্রমণের জন্য ধাবিত হইয়াছেন। এইবার চৌহান ও পরিহারের শক্তিপরীক্ষা হইবে।

পৃথ্বীরাজ আসিতেছেন শুনিয়া নাহর রায় কিছু চিন্তিত হইয়া পড়েন। মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের পরামর্শে তিনি শক্তির পরীক্ষা দিতেই প্রস্তুত হন, এবং চালুক্যের প্রধান মন্ত্রীর আশ্রয় লন। চালুক্যে ও চৌহানে চিরবিরোধ। নাহর রায় প্রথমে কতকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু আরও সুসজ্জিত হওয়ার ইচ্ছায় পিছাইয়া আসেন। ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজ নদী পার হন।

পরপারে আসিয়া পৃথ্বীরাজ দেখিলেন যে, নাহর রায়ের আদেশে তাঁহার সামন্ত পর্ব্বত রায় ঘাটী আগলাইয়া আছেন। পৃথ্বীরাজ ঘাটী পরিষ্কারের জন্য কাকা কণ্বকে পাঠাইলেন। পর্ব্বত রায় অসংখ্য ধনুর্দ্ধারী ভীলে বেষ্টিত হইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভীলগণ বাণে বাণে কণ্বের সৈন্য-দিগকে ছাইয়া ফেলিল। কণ্ব তখন পরাক্রমের সহিত পর্ব্বত রায়ের উপর পড়িলেন, কণ্বের পরাক্রম পর্ব্বত রায় সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল।

পর্ব্বত রায়ের মৃত্যু শুনিয়া নাহর রায় শক্তির পরীক্ষা দিতে আসিলেন। এ দিকে পৃথ্বীরাজ ও চামণ্ড রায়, লোহানা, আজানবাহু প্রভৃতি সামন্তের সহিত অগ্রসর হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে চৌহান ও পরিহারে শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। চৌহানের শক্তিই পরিহারকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। পৃথ্বীরাজের তরবারির আঘাতে নাহর রায়ের অশ্ব দুই খণ্ড হইয়া গেল, তিনি ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন, পৃথ্বীরাজ তাঁহার প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। সহসা নাহরের পিতৃব্যপুত্র কনক রায় পৃথ্বীরাজের সম্মুখে আসিলেন, তাঁহার অশ্বটিও দুই খণ্ড হইয়া গেল। তখন উভয় পক্ষের সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। হস্তীতে হস্তীতে, অশ্বে অশ্বে, পদাতিকে পদাতিকে শক্তিপরীক্ষা হইতে লাগিল। কণ্ব, চামণ্ড রায়, লোহানা প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ শক্তির পরীক্ষা দিলেন। নাহর রায় শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, চৌহানের নিকট পরিহারের শক্তি ব্যর্থ হইয়া গেল। নাহর রায় রণস্থল ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, পৃথ্বীরাজও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। পত্তনপুরে উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজ তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। তথায় শক্তিপরীক্ষার আলোচনা হইতে লাগিল।

কাকা কণ্ব—"কেমন, চৌহানের শক্তিপরীক্ষা হইল ত ?"

লোহানা—"পরিহার আবার কিসের শক্তি পরীক্ষা দিবে ?"

চামণ্ড রায়—"পৃথ্বীরাজের শক্তির নিকট নাহর রায়ের শক্তি কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে ?"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"মাতা শাকম্ভরী ও আশাপূর্ণার ইচ্ছায় এবং তোমাদের বাহুবলে চৌহান আজ শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।"

কাকা কণ্ব –"চৌহানের শক্তিপরীক্ষা ত হইয়াই গেল, এখন পত্তনপুরে কুমারের রাজ্যাভিষেক হ'ক।"

অন্যান্য সামন্ত তাহাতে সম্মতি দিলেন। তখন পত্তনপুরে মহা সমারোহে পৃথ্বীরাজের রাজ্যাভিষেক হইল। সামন্ত ও সৈন্যগণের মধ্যে আনন্দের কোলাহল উঠিল, চৌহানের পতাকা পত্তনপুরে উড়িতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরাভব স্বীকার।

গির্ণার একটি ক্ষুদ্র নগর। কিন্তু আজ সেখানে লোক ধরে না, অনেক লোকের সমাগমে তাহা যেন একটি প্রকাণ্ড নগর হইয়া উঠিয়াছে। রাজপথে অবিরত জনস্রোত চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম তোরণ হইতে নহবতের সুর উঠিতেছে। নানাবিধ বাদ্যধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া পড়িতেছে। সুসজ্জিত হস্তী অশ্বে নগরটিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সৈনিকেরা বেশভূষায় সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পুরনারীগণ শঙ্খ বাজাইতেছেন, ও হুলুধ্বনি দিতে-ছেন। রাজপথের স্থানে স্থানে দোকানপসার বসিয়াছে। কোথাও বা নৃত্যগীত হইতেছে, ক্ষুদ্র নগরটার বুকে যেন আনন্দের একটা প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে।

এই আনন্দোৎসবের কারণ কি, এখন তাহা বলিতেছি। নাহর রায় যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গির্ণারে আসিলেন, গির্ণার তাঁহারই রাজ্যভুক্ত। সেখানে রাজধানীর প্রধান প্রধান লোক সকল আসিয়া জুটিলেন। পত্তনপুর অধিকারের পর পৃথ্বীরাজ যে মন্তোবর অধিকার করিয়া লইবেন, তাহাতে কাহারও সন্দেহ

ছিল না। সে জন্য সকলে নাহর রায়কে আসিয়া ধরিলেন ও রাজকুমারীর সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ দিতে বলিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নাহর রায় শেষে সম্মত হইলেন। পৃথ্বীরাজের নিকট বিবাহের লগ্ন পাঠান হইল, আনন্দ সহকারে পৃথ্বীরাজ তাহা স্বীকার করিলেন। তাহার পর গির্ণারে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল. পৃথ্বীরাজও সৈন্যসামন্ত সহ সুসজ্জিত হইয়া সেখানে আসিলেন। তাই উভয় পক্ষের লোকজনে গির্ণারকে সমারোহময় করিয়া তুলিয়াছে।

গির্ণারের গ্রাম্য দেবতার মন্দিরে পুরনারীগণ আসিয়া মিলিয়াছেন, সেখানে একটা আনন্দস্রোত চলিতেছিল। দেবতাকে প্রণাম করিতে রাজকুমারী জম্ভাবতীও আসিয়াছেন, তাঁহার সহচরীগণ হাস্যপরিহাসে তাঁহাকে কিছু উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

চঞ্চলা বলিল,—"রাজকুমারী বর দেখিয়াছ" ?

জম্ভাবতী। "পরিহাস রাখ, আমি কোথা হইতে দেখিব ?"

চঞ্চলা। "ও মা, আমি বলি তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছ" ?

জম্ভাবতী। "সে কি, আমি একলা যাইব কিরূপে" ?

চঞ্চলা। "প্রাণের আবেগে"।

জম্ভাবতী। "মরণ আর কি, আবেগ দেখিলে কোথায় ?"

চঞ্চলা। "প্রাণে গো প্রাণে, মনে গো মনে, দেহে গো দেহে।"

বিমলা বলিল,—"এ কথাটি কিন্তু সত্য।"

জম্ভাবতী। "কেন ভাই, আমার দেহ মন প্রাণে তোমরা কি দেখিয়াছ ?"

চঞ্চলা। "থর থর কম্প।"

জম্ভাবতী। "আমি কি তোমার মত চঞ্চলা ?"

চঞ্চলা। "আমি নামে, তুমি কাজে।"

কমলা বলিল,—"সত্য ভাই, এ কয়দিন তোমার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল, আজ যেন ফুটন্ত পদ্মের মত ঢল ঢল কচ্ছে।"

চঞ্চলা। "কেমন, শুনিলে ত ?"

জম্ভাবতী। "তোমরা যখন সকলে লাগিয়াছ, তখন আমারই হার।"

চঞ্চলা। "ছোট বেলা হ'তে যে বরটিকে মনে মনে মালা পরাইয়াছিলে,

মাঝে ত তাহাকে হারাইতে বসিয়াছিলে। এখন তাহার পায়ে শিকল লাগাইয়া দেও, যেন পলাইতে না পারে।"

বিমলা বলিয়া উঠিল,—"সত্য, সে কথা ভাবিতে শরীর কাঁপিয়া উঠে। রাজা যদি সত্য সত্য বিবাহ না দিতেন, তাহা হইলে কি হইত বল দেখি!"

কমলা বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইত আর কি?"

চঞ্চলা। "তাহাতে ভাবনার কিছুই ছিল না। রুক্মিণীহরণ হইতই।"

জম্ভাবতী। "তুমি নিপাত যাও।"

চঞ্চলা। "তা না হয় গেলাম, কিন্তু আমি কি মিথ্যা বলিতেছি, এ রত্ন পৃথ্বীরাজ নিজ কণ্ঠে না রাখিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেন না। আর তাঁহার বিক্রমের কথা শুনিতে কি বাকি আছে?"

সেই সময়ে একটা কোলাহল উঠিল, সকলে দেখিলেন, কয়েকটি সুন্দর যুবক রমণীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মন্দিরে আসিতেছেন। পৃথ্বীরাজই সহচরগণের সঙ্গে গ্রাম্য দেবতাকে প্রণাম করিতে আসিতেছিলেন। চঞ্চলা তাহা বুঝিতে পারিয়া জম্ভাবতীকে বলিল,—"ঐ দেখ ভাই, বর আসিল, এইখানেই শাঁখ বাজাইয়া দিব নাকি?"

"চুপ" বলিয়া জম্ভাবতী একটু অন্তরালে লুকাইলেন। পৃথ্বীরাজকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চঞ্চলা একটু অগ্রসর হইয়া বলিল,—"মহাশয়, আপনি ত অতি অভদ্র।"

পৃথ্বীরাজ। "ও কথা বলিতেছেন কেন?"

চঞ্চলা। "দেখিতেছেন না, মন্দিরে পুরনারীরা রহিয়াছেন?"

পৃথ্বীরাজ। "আমি তাহা লক্ষ্য করি নাই।"

চঞ্চলা। "আজমীরের যুবরাজ এত নির্ব্বোধ, আমরা তাহা জানিতাম না।"

পৃথ্বীরাজ। "আমি আপনাদের নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছি।"

চঞ্চলা। "আমাদের নিকট করিতে হইবে না, যাঁহার নিকট করিতে হইবে, ঐ দেখুন, তিনি দেওয়ালের সহিত মিশিয়া আছেন।"

তখন পৃথ্বীরাজের চক্ষু জম্ভাবতীর দিকে পড়িল, জম্ভাবতীও নিমেষের জন্য তাঁহাকে দেখিয়া লইলেন। চারি চক্ষের মিলন হইয়া গেল। সে এক অপূর্ব্ব

মধুর ভাব, সঙ্গে সঙ্গে জম্ভাবতী মুখ অবনত করিলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজের চক্ষু সে রূপসুধার পান হইতে সহসা নিবৃত্ত হইতে পারিল না।

চঞ্চলা বলিয়া উঠিল,—"এখনই যে পরাভবস্বীকার দেখিতেছি, চৌহানের শক্তিপরীক্ষা বুঝা গেল।"

পৃথ্বীরাজ লজ্জিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। তাহার পর তিনি গ্রাম্য দেবতাকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। সহচরীরা জম্ভাবতীকে দেবতার সম্মুখে মাঙ্গল্য দ্রব্যে সাজাইয়া দিলেন, জম্ভাবতীও দেবতাকে প্রণাম করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন; পুরনারীগণ শঙ্খ ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন, রাজকুমারীর শিবিকা ক্রমে রাজভবনে গিয়া পৌঁছিল।

রাজভবনে মনোরম বিবাহমণ্ডপটি দানসামগ্রীতে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, লোকজনে তাহা পরিপূর্ণ, বাদ্যধ্বনিতে রাজভবন কাঁপিয়া উঠিতেছে। অল্পক্ষণমধ্যেই বরযাত্র আসিয়া পঁহুছিল, বরপক্ষে বধূপক্ষে আদর আপ্যায়নের পর বিবাহানুষ্ঠান আরম্ভ হইল। যথানিয়মে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যাদান করিয়া নাহর রায় পৃথ্বীরাজকে বলিলেন,—"চৌহানকুলপ্রদীপ, আপনার ভাণ্ডারে আমি আর কি রত্ন পাঠাইব, আমার এই কন্যারত্নটিই পাঠাইলাম।"

উত্তরে পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"আপনার বিনয়ে আমি পরাভব স্বীকার করিতেছি।"

জম্ভাবতীর নিকট কয়েকটি পুরনারী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন,—"গ্রাম্য দেবতার মন্দিরেও একবার পরাভব স্বীকার হইয়াছে।"

সকলে চাহিয়া দেখিলেন চঞ্চলা, চঞ্চলার কথা কেহ বুঝিলেন, কেহ বা বুঝিলেন না, কিন্তু পৃথ্বীরাজের মুখে লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল।

শ্বশুরকুলের আদর আপ্যায়ন, পুরনারীগণের হাস্যপরিহাস ও বিবাহের আনুসঙ্গিক কার্য্যে দুই এক দিন কাটিয়া গেল, তাহার পর শিবিকারোহণে জম্ভাবতীকে লইয়া পৃথ্বীরাজ আজমীর যাত্রা করিলেন। সৈন্যসামন্তগণ আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আজমীরে উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজ সস্ত্রীক পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। চৌহানের গৌরব রক্ষা হইল

জানিয়া সোমেশ্বর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নববধূ পাইয়া কমলা-দেবীরও আনন্দসঞ্চার হইল। কয়েকদিন আবার আজমীরে সমারোহ চলিতে লাগিল।

নাহর রায়ের পরাভবস্বীকারের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রাজপুত রাজগণ সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। মেবাতের মঙ্গল রায় আজমীরের অধীনতা অস্বীকার করায় সোমেশ্বর ও পৃথ্বীরাজ পিতাপুত্রে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়া আনিলেন। চৌহানের গৌরববৃদ্ধিতে কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের শত্রু হইয়া উঠিলেন। অল্পদিনের মধ্যে পৃথ্বীরাজের প্রবল শত্রুর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিল। এই প্রবল শত্রুর নাম শাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী। আমরা পরে সে কথা বলিতেছি।

মনুষ্যপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

বিধাতার কি বিচিত্র বিধান! পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, ভূমণ্ডলের যে কোন দেশ পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, সেইখানেই আমরা দেখিতে পাই, কোন দুইটি বস্তু ঠিক একরূপ নহে। নীল গগনের কোলে কত শত মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়—কেহ নীল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ পীত, কেহ বা শ্যামল; তাহারা সকলেই একরূপ নহে। গাছে গাছে কত পাখী উড়িয়া বেড়ায়,—কাহারও স্বর পঞ্চমে উঠে, কাহারও চতুর্থে, কাহারও বা সপ্তমে; তাহারা সকলেই সমস্বর-বিশিষ্ট নহে। মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, কত শত জন্তু চরিয়া বেড়ায়—কেহ ঘাস খায়, কেহ ফলমূল খায়, কেহ বা মাংস খায়। তাহারা সকলেই কিন্তু সমভুক্ নহে। সেইরূপ যদি আমরা মানবপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই—তাহারা সমপ্রকৃতির নহে। কেহ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, কেহ রজোগুণময়, কেহ বা তমোগুণান্বিত। তাই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্" ॥

অর্থাৎ

সত্ত্ব রজ তম প্রকৃতিসম্ভূত
ধরার মাঝারে ত্রিগুণ আছে।
এই তিন গুণ সকল দেহীরে
নিযুক্ত করিছে আপন কাজে ॥

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা আমরা কিরূপ বুঝিয়া থাকি। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, সত্ত্বগুণের লক্ষণ এই যে, উহা স্বয়ং নির্ম্মল, ভাস্বর, প্রকাশক ও শান্ত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ" ॥

অর্থাৎ

সত্ত্বগুণ শান্ত অতীব নির্ম্মল
সকল পদার্থ প্রকাশ করে।
আমি সুখী হই আমি অতি জ্ঞানী
এরূপ ধারণা প্রদানে নরে ॥

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে, সত্ত্বগুণ শান্তভাবাপন্ন, কাজেই সত্ত্বগুণ সুখকর কার্য্যে মানবকে নিযুক্ত করিয়া থাকে। এই সত্ত্বগুণ যখন প্রবল হয়, তখন মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি অত্যধিক সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের কর্ণের যতটা শব্দগ্রাহিতা গুণ আছে, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট নরগণের কর্ণের সে গুণ অনেকাংশে অধিক। আমাদের চক্ষুর রূপগ্রাহিতা যতটা, তাঁহাদের চক্ষুর তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক। এইরূপ আমরা দেখিতে পাই, যে সমস্ত বিষয় হইতে আমরা কিছুমাত্র জ্ঞানলাভ করিতে পারি না, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সামান্য বিষয় হইতেও জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। এই ত গেল সত্ত্বগুণের কথা। রজোগুণ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনাম্" ॥

অর্থাৎ

রজোগুণ যাহা অপ্রাপ্ত বিষয়ে
অসীম আকাঙ্ক্ষা জন্মায়ে দেয়।
প্রাপ্ত বিষয়েতে আসক্তি জন্মায়ে
ফলসঙ্গ কর্ম্মে লইয়া যায়॥

কাজেই দেখিতেছি, রজোগুণের লক্ষণ এই যে, ইহাতে সুখের আকাঙ্ক্ষা হয় বটে, কিন্তু সুখলাভ ঘটে না। একটি আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইতে না হইতে অন্য বহুবিধ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে। আকাঙ্ক্ষামাত্রই সুখদায়ক; কাজেই রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ প্রাপ্ত হয় না। মনু বলিতেছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"॥

অর্থাৎ

উপভোগ দ্বারা কামনার শেষ
কখন কাহার হয় না হেথা।
ঘৃত সহযোগে আগুনের বেগ
ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় গো যথা॥

রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির এই দশাই ঘটিয়া থাকে। এক কামনার অবসান হইতে না হইতেই অন্য কামনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। জীবনে সুখ ঘটে না, শান্তি ঘটে না, দুঃখ লইয়াই থাকিতে হয়। আমাদের প্রকৃতিতে রজোগুণ যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কামনার দীপ্ত অনলও ততই অধিকতর বেগে প্রজ্বলিত হইতে থাকে। হে মানব, তুমি সুরম্য হর্ম্ম্যনিবাসী, দুগ্ধফেন-নিভ সুকোমল শয্যাশায়ী, তুমি যদি রজোগুণসম্পন্ন হও, তোমার আরও আকাঙ্ক্ষা হইবে, তুমি মনে করিবে, আরও চাই, এখনও অনেক সুখভোগ বাকী আছে—তড়িৎবিজলি (electric fan) চাই, এতদপেক্ষা আরও অধিক দূরবিস্তৃত রাজ্যের আধিপত্য চাই। কাজেই ঋষি বলিতেছেন—"নিঃস্বো ব্যষ্টি-শতং শতী দশশতং, লক্ষং সহস্রাধিপঃ" ইত্যাদি। এইরূপ আমরা দেখিতে পাই, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কামনার তীব্র আগুনে মুহুর্মুহুঃ বিচলিত হইয়া সুখান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহাদের জীবনে সুখলেশমাত্রও ঘটে না।

এক্ষণে আমাদিগকে তমোগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত" ॥

অর্থাৎ

তমোগুণ যাহা অজ্ঞানতা আনে
সকল দেহীরে মুগ্ধ করে।
প্রমাদ আলস্য মোহ নিদ্রা আদি
ক্রমে ক্রমে আসি মানবে ধরে ॥

কাজেই দেখিতেছি, তমোগুণ অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তির আকর। তমোগুণ আমাদিগকে কোন বস্তুরই প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে দেয় না। তমোগুণ-বিশিষ্ট মানব প্রমাদ, আলস্য, মোহ, নিদ্রা প্রভৃতির বশতাপন্ন হইয়া থাকে। এই তমোগুণ আমাদের প্রকৃতির উপর যতই অধিকতর আধিপত্য করিতে থাকে, আমাদেরও তত অধিকতর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিতে থাকে, শত্রুকে মিত্র এবং মিত্রকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান জন্মে। অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং সৎকার্য্যে নিবৃত্তি উপস্থিত হয়। কাজেই আমরা দেখিতেছি, সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, রজোগুণের স্বভাব প্রকৃতি এবং তমোগুণের স্বভাব আবরণ। সুতরাং ঋষি বলিতেছেন,—

"সত্ত্বং প্রকাশকং বিদ্যাৎ রজো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্।
তমোঽপ্রকাশকং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নামসংজ্ঞিতম্" ॥

অর্থাৎ

সত্ত্বগুণ করে সবারে প্রকাশ
রজোগুণ করে নিয়োগ কাজে।
তমোগুণে যাহা করে আবরণ
ইহাই ত্রৈগুণ্য সবাই বুঝে ॥

এ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥"

উপরি-উক্ত কয়েকটি শ্লোকেরই অর্থ এই যে, সত্ত্বগুণ সুখের আকর, জ্ঞানের প্রস্রবণ এবং সদ্গতির কারণ; রজোগুণ দুঃখের আকর, লোভের কারণ এবং মধ্যলোকপ্রদায়ক; আর তমোগুণ অজ্ঞানতার আকর, প্রমাদমোহের হেতু এবং অধোগতির সহায়ক।

এই গেল প্রাচ্যমতে মানবপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ, এক্ষণে পাশ্চাত্যমতে কিরূপে মানবপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে, তাহাই দেখাইব।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, মানবপ্রকৃতিতে তিনটি বিভিন্ন বৃত্তি (Function) রহিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি চিন্তা (Thinking), একটি ইচ্ছা (Willing) এবং অন্যটি ভাব (Feeling)। প্রতি মানবেই ইহার সমস্তগুলি আছে বটে, কিন্তু কাহারও একটি, কাহারও বা অন্যটি প্রবল। কেহ চিন্তাপ্রধান (intellectualist), কেহ ইচ্ছাপ্রধান (active), আবার কেহ বা ভাবপ্রধান (sentimentalist)। যাঁহারা চিন্তাপ্রধান, তাঁহারা দার্শনিক শ্রেণীভুক্ত। জগতের সদসৎ কি, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন, মানবের কর্ত্তব্য কি, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন। সংসারের নশ্বরতা, জগতের অলীকতা তাঁহারা বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন—বাসনা আমাদের দুঃখের কারণ এবং আমাদের সুখ ত্যাগে, ভোগে নয়—ইহা তাঁহারা বিশেষ বুঝিতে পারেন। কাজেই তাঁহারা বাসনাঝঞ্ঝাঘাতে বিচলিত হন না। তাঁহারা যোগী! তাঁহারা সাধু! তাঁহারা সাত্ত্বিক!

যাঁহারা ইচ্ছাপ্রধান, তাঁহারা কর্ম্মশ্রেণীভুক্ত। কর্ম্ম তাঁহাদের আশ্রয়—বাসনা তাঁহাদের জীবনের অঙ্গ। তাঁহারা সদাসর্ব্বদা কামনাতাড়িত। এক বাসনার তৃপ্তি হইতে না হইতে অন্য বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তির শেষ নাই, বাসনার অন্ত নাই! কাজে কাজেই দুঃখেরও অবসান নাই। তাঁহারা জীবনে কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের জীবনে শুধু আকাঙ্ক্ষার তাড়না—প্রেরণার তীব্র জ্বালাতন এবং বাসনার ভীষণ প্রদাহ।

আবার যাঁহারা ভাবপ্রধান, তাঁহারা অলসশ্রেণীভুক্ত। তাঁহাদের সদসৎজ্ঞান থাকে না—কর্ত্তব্যবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়—হিতাহিতধারণা লোপ প্রাপ্ত হয়। মোহ, আলস্য ও প্রমাদ তাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—মানবপ্রকৃতির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য ও কতটা পার্থক্য রহিয়াছে। সামঞ্জস্যের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবপ্রকৃতি এবং চিন্তাপ্রধান মানবপ্রকৃতি প্রায় একইরূপ; এবং রজোগুণবিশিষ্ট মানবপ্রকৃতি এবং ইচ্ছাপ্রধান মানবপ্রকৃতি প্রায় তুল্যরূপ; আবার তমোগুণবিশিষ্ট মানবপ্রকৃতি এবং ভাবপ্রধান মানবপ্রকৃতিও একই প্রকার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥"

অর্থাৎ

সত্ত্ব গুণ যাহা সুখ দেয় নরে
রজোগুণ করে নিয়োগ কাজে।
তমোগুণ যাহা জ্ঞান হরি লয়
প্রমাদাদি আনে মানব কাছে॥

কাজেই দেখিতেছি—পাশ্চাত্য মতের চিন্তাপ্রধান প্রকৃতি, ইচ্ছাপ্রধান প্রকৃতি এবং ভাবপ্রধান প্রকৃতির সহিত প্রাচ্য মতের সত্ত্বগুণবিশিষ্ট প্রকৃতি, রজোগুণবিশিষ্ট প্রকৃতি এবং তমোগুণবিশিষ্ট প্রকৃতির সহিত বিশেষ একত্ব বা সমত্ব রহিয়াছে। প্রবৃত্তির ভীষণ তাড়না নাই বলিয়া এবং হিতাহিত, সদসৎজ্ঞান আছে বলিয়া চিন্তাপ্রধান ব্যক্তি ও সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি উভয়েই বিশেষভাবে সুখ পাইয়া থাকেন। কামনার উদ্দীপনা, বাসনার তীব্র জ্বালা, আকাঙ্ক্ষার ভীষণ দাহন আছে বলিয়াই ইচ্ছাপ্রধান ব্যক্তি এবং রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি উভয়েই বিশেষ দুঃখ পাইয়া থাকেন। আবার ভাবের প্রাবল্য আছে, কর্ত্তব্যে অপ্রবৃত্তি, অকর্ত্তব্যে প্রবৃত্তি প্রভৃতি আছে বলিয়াই ভাবপ্রধান ব্যক্তি এবং তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি উভয়েই মোহ, নিদ্রা, আলস্য, জড়তা প্রভৃতির বিশেষ বশতাপন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত সমতাপ্রদর্শনের আরও কয়েকটি বিষয় আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥"

অর্থাৎ

সত্ত্বগুণ যাহা রজস্তম নাশে
রজোগুণ নাশে সত্ত্ব ও তমঃ।
তমোগুণ পুনঃ নাশে সত্ত্বরজঃ
এরূপ সম্বন্ধ পৃথকৃতম॥

পাশ্চাত্য দর্শন মতেও এইরূপ কোন এক বৃত্তির প্রাবল্য জন্মিলে অন্য বৃত্তিগুলি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। যখন আমাদের চিন্তা প্রবল হয়, তখন ভাবগুলি আপনা আপনিই লোপ প্রাপ্ত হইতে থাকে। রমণীয় ইন্দ্রধনু দর্শনে আমাদের মনে যে স্বতঃই প্রীতির উচ্ছ্বাস উত্থিত হয়, যখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ক্রমে আমাদের মানসক্ষেত্র অধিকার করিতে থাকে, তখন সে উচ্ছ্বাস—সে আনন্দ—সে প্রীতির ভাব আর থাকে না—কোথা হইতে একটা শৈত্য আসিয়া উপস্থিত হয়। চিন্তাপ্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিরও এইরূপ একটা বৈরভাব রহিয়াছে। অধিক চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকে না। মহর্ষিগণের চরিত্রে এই ঘটনাটি আমরা বিশেষরূপে দেখিতে পাইয়া থাকি। যাঁহারা একান্তমনে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের সুখদুঃখবোধ থাকে না। কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিও লোপ প্রাপ্ত হয়। রত্নাকর ঈশ্বরচিন্তায় এত নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহোপরি একটি বল্মীক উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহা তিনি অনুভব করিতেই পারিয়াছিলেন না। চিন্তাপ্রাবল্য যে কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া দেয়, তাহার বিশেষ একটি উদাহরণ Shakespeare এর Hamlet চরিত্রে দেখিতে পাইয়া থাকি।

আমাদের ইচ্ছাপ্রবৃত্তি প্রবল হইলে চিন্তা ও ভাবকে অনেকাংশে দমিত করিয়া দেয়। প্রবৃত্তির ভীষণ তাড়নে আমাদের হিতাহিতজ্ঞান থাকে না। সুখদুঃখবোধও তিরোহিত হইয়া যায়। কর্ম্ম করিতেই হইবে, এই জ্ঞানটি আমাদের প্রবল থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধার অবস্থাটি দেখিলেই এ সম্বন্ধে সম্যক্

উপলব্ধি হইতে পারে। Shakespeare এর Mackbeth চরিত্রে ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

আবার যখন আমাদের ভাবগুলি আধিক্য প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদের চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। রমণীয় বস্তুদর্শনে যখন আমাদের চিত্তমোহ উপস্থিত হইয়া থাকে, যখন আমরা অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকি, তখন আমাদের নয়ন পলকশূন্য—অঙ্গনিচয় নিস্পন্দ এবং বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চল হইয়া পড়ে।

এইরূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি, যেমন প্রাচ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে একের প্রাবল্য ঘটিলে অপরগুলির শৈথিল্য জন্মে, সেইরূপ পাশ্চাত্যমতেও চিন্তা, ইচ্ছা ও ভাববৃত্তিগুলির মধ্যে একের প্রাধান্য জন্মিলে অপরগুলি নিস্তেজ হইয়া থাকে। কাজে কাজেই দেখিতেছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে মানবপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অনেকটা সমত্ব রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের বৈষম্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইবে।

প্রাচ্যমতে সত্ত্বঃ, রজঃ, তম প্রভৃতি গুণ আত্মজ নহে, তাহারা প্রকৃতিজ। হিন্দুমতে আত্মা নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নির্গুণ। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্" ॥

অর্থাৎ

প্রকৃতি পুরুষ উভয় পদার্থ
জানিবে তাদেরে অনাদি বলে।
সকল বিকার ত্রিগুণ সহিত
হ'তেছে কেবল প্রকৃতিফলে ॥

আত্মা নির্ব্বিকার—নির্লিপ্ত। প্রকৃতিই সমস্ত ভূতের জননী। সত্ত্বঃ, রজঃ তমঃ প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ আছে এবং যে সমস্ত বিকার আছে, তাহারা সমস্তই প্রকৃতিসম্ভূত। প্রকৃতি ইহাদের একমাত্র কারণ। এক্ষণে এই প্রকৃতি কি? এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে লিখিত আছে,—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ॥"

অর্থাৎ

একা যে প্রকৃতি আছে তিন গুণ,
লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ বরণ।
সমান জাতীয় বহুবিধ প্রজা,
করিয়া থাকে নিয়ত সৃজন॥

কাজেই দেখিতেছি, গুণবিকার প্রভৃতি সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য। বস্তুতঃ ধরিতে গেলে প্রকৃতিই কর্ত্তা। কেবল মায়াবশে মানব আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"॥

অর্থাৎ

প্রকৃতির গুণে হয় কর্ম্ম সমাধান।
অহঙ্কারী নর ভাবে তাহার বিধান॥

গীতায় ভগবান্ আরও বলিতেছেন,—

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
ন পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি"॥

অর্থাৎ

প্রকৃতির গুণে সর্ব্বকর্ম্ম ঘটে
আত্মা আমাদের অকর্ত্তা হন।
এইরূপ জ্ঞান জন্মেছে যাহার
তিনিই প্রকৃতি দেখিতে পান॥

হিন্দু দর্শন আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে না। আত্মা নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প, ইহাই হিন্দু দর্শনের সিদ্ধান্ত। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, আত্মা যদি বাস্তবিকই নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প হয়, তাহা হইলে আমাদের এই সুখদুঃখজ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হয়? আমরা দেখিতে পাই, আমরা প্রিয়বস্তুপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হই এবং অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হই। আত্মা যদি নির্ব্বিকার, তাহা হইলে আমাদের এই ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন :—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্"।

অর্থাৎ

পুরুষ রহিয়া সদা প্রকৃতির সনে।
আপনি রঞ্জিত হয় প্রকৃতির গুণে॥

পুরুষ (আত্মা) কিছু করে না। প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা। কেবল-মাত্র প্রকৃতির সান্নিধ্য হেতুই পুরুষের এইরূপ কর্ত্তৃত্ব অনুভূত হয়। একটি স্ফাটিক পাথরের সন্নিকটে জবাফুল থাকিলে তার লোহিতবর্ণ আভাটি যেমন স্ফাটিক পাথরের উপর প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির সন্নিকটে পুরুষ থাকায় প্রকৃতির বিকারগুলি পুরুষের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পুরুষের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি অচেতন, কাজে কাজেই তাহা অন্ধস্থানীয়; পুরুষ কর্ত্তৃত্ববিহীন, কাজে কাজেই তিনি পঙ্গুস্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইলে একে অন্যের অভাব পূরণ করে। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে;—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ"॥

অন্ধ দেখিতে পায় না, আবার পঙ্গুও চলিতে পারে না, কিন্তু যদি উভয়ের সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে তাহাদের কার্য্য চলিতে পারে। অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গুকে তুলিয়া দাও, পঙ্গু পথ দেখাইয়া দিবে, অন্ধ বহিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে গন্তব্য স্থানে যাওয়া ঘটিবে। পুরুষপ্রকৃতির সম্বন্ধ ঠিক এইরূপ। পুরুষ চক্ষুষ্মান্, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দর্শন করিতে পারে। আর প্রকৃতি অঙ্গবান্, সমস্ত আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। অনুভব, গুণ, বিকারাদি সমস্তই প্রকৃতির, পুরুষের কিছুই নহে। কাজে কাজেই প্রাচ্য দর্শনমতে আত্মার সঙ্গে গুণবিকারাদির সম্বন্ধ এই যে, আত্মা নির্ব্বিকার, গুণবিকারাদি সমস্তই প্রকৃতির।

এক্ষণে পাশ্চাত্যদর্শনমতে তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাই দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের এক দল আছেন—যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আমাদের যে চিন্তা (thinking), ভাব (feeling) এবং ইচ্ছাশক্তি (willing) আছে, তাহাদের সমবায়েই আত্মা গঠিত। আত্মা নামে

কোন একটি স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আবার তাঁহাদের অন্য একটি দল আছেন, তাঁহারা বলেন, আত্মা একটি পরম সত্তা (reality) এবং চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মারই বিভিন্ন বিকার মাত্র। হিন্দু দার্শনিকদিগের ন্যায় তাঁহারা আত্মাকে নির্গুণ, নির্ব্বিকার বলেন না, তাঁহাদের মতে আত্মা চিন্তা করে, আত্মা অনুভব করে এবং আত্মাই ইচ্ছা প্রকাশ করে। হিন্দুদর্শনমতে গুণ প্রকৃতির—পুরুষের নয় ; পাশ্চাত্য দর্শনমতে গুণ পুরুষের (আত্মার) ;—প্রকৃতির নয়। এই বিষয়ে উভয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধীরে ধীরে যষ্টি হস্তে আমরা একত্রে অনেকগুলি যাত্রী হনুমান চটী পরিত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলাম। আজ বদরিকাশ্রম পৌঁছিতে পারিব বলিয়া মহানন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যাত্রিগণের আজ মহা উল্লাস। সমস্বরে জয় রোল তুলিয়া যাত্রিগণ মহোৎসাহে অগ্রসর হইতেছে। এখান হইতে নারায়ণধাম মাত্র ৪ মাইল। কিন্তু এই সমস্ত পথই প্রায় চড়াই ও এমন অসংস্কৃত যে, আমাদের চলিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। প্রাণে তীব্র আনন্দ, কিন্তু চরণের গতি ধীর। কোনরূপে দেহটাকে বহিয়া লইয়া নারায়ণপুরীর দ্বারদেশে ফেলিতে পারিলে বাঁচা যায়। আর বেশী দূর নহে ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম এবং আমরা যথাসম্ভব দ্রুতপাদবিক্ষেপে বদরী নারায়ণপুরী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অলকানন্দা অনেকটা নীচে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বত সকল উন্নত মস্তক উত্তোলন করিয়া নির্ভীকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রবলবলশালিনী অলকানন্দার ভয়ঙ্কর বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের পাষাণগাত্র হইতে প্রস্তররাশি স্থানচ্যুত হইয়া কতক রাস্তায় এবং কতক নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে। সেই জন্যই নদীর বেগ এত প্রখর। ক্রমে আমরা একটি বরফস্তূপের সম্মুখীন

হইলাম। অলকানন্দার চঞ্চল প্রবাহও সেখানে বরফরাশিতে আচ্ছন্ন; মনুষ্য-পশ্বাদি সেই দূরবিস্তৃত বরফের উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছে; কোথাও দেখিলাম, বরফাচ্ছাদিত নদীর মধ্যবর্ত্তী একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর গতিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছে সেখানে পাষাণনন্দিনী স্বীয় তুষারময় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতঃ প্রমত্তা সিংহিনীর ন্যায় ভীমবিক্রমে সেই পথরোধী শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন। কোথাও তুষাররাশি নদীপ্রবাহে ভগ্ন হইয়াছে, আর অবশিষ্টাংশ শুভ্র রজতখণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমাদের গন্তব্যপথে যে যে স্থান বরফাবৃত, মনুষ্যাদির পদধূলিতে তাহা মলিন হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটি বরফের ক্ষেত্র দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইল। দ্রবীভূত তুষারস্পর্শে সুশীতল সমীরপ্রবাহ মৃদু মৃদু বহিয়া যাইতেছে। যদিও সেই বায়ুতে আমরা শীতে আড়ষ্ট হইতেছি, তবুও পথশ্রমের অনেক লাঘব বোধ হইতেছে। কাষ্ঠভার পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া দলে দলে পাহাড়ী নরনারী ধাবিত হইতেছে। আগে পাছে যাত্রীর দল সমস্বরে জয় গান করিতে করিতে চলিয়াছে। প্রফুল্লচিত্তে আমরাও জয়রোল তুলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই একটি সুন্দর সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। সমগ্রপুরী একখানি ছবির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অগ্রবর্ত্তী যাত্রিগণ শ্রীমন্দিরের সুবর্ণময় চূড়া দেখিতে পাইয়া আহ্লাদিতমনে সমস্বরে "বদরীবিশাললালাকি জয়" রবে জয়ধ্বনি করিলেন। উন্নতাবনত দুর্গম রাস্তা আর নাই। এখন একটি প্রশস্ত সমতল ভূমি দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইতেছে। সম্মুখে একটু নিম্নভূমিতে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত পুল পার হইয়া পুনরায় সামান্য উচ্চ ভূমিতে উঠিতে হইল। প্রথমে ঋষিগঙ্গা নামক একটি ক্ষুদ্র ঝরণা পার হইয়া বাজারে প্রবেশ করিলাম। প্রশস্ত রাস্তার দুই ধারে অনেকগুলি দোকান। আমরা সেই সমস্ত নানাবিধ দোকান দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাগ্রে "ধুলিপায়ে" দেবদর্শন মানসে মন্দিরের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। বাজার পরিত্যাগ করিয়া সামান্য উচ্চে কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমরা প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক মন্দিরপ্রাঙ্গণে দেখিতে পাইলাম, অসংখ্য যাত্রীর ভিড়, আর সমগ্র দেবালয়টি যাত্রীতে একেবারে পরিপূর্ণ। ঐ বিশাল জনতার মধ্যে কি উপায়ে নারায়ণ দর্শন করিব, ভাবিতে লাগিলাম। স্থির

ইয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই, পশ্চাতের যাত্রিবর্গ অগ্রগমন আশায় ক্রমাগত ঠেলাঠেলি করিতেছে, ক্রমে আমরা অগ্রসর হইতে হইতে প্রহরিবেষ্টিত মন্দিরের বারান্দায় উপস্থিত হইলাম।

বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। সম্মুখের যাত্রিবর্গ দর্শনাদি করিয়া মন্দির পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, সেই মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীনারায়ণ দর্শন করিলাম। জীবন সার্থক হইল। মন্দিরের ভিতরে বড় অন্ধকার। অস্পষ্টরূপে দেবতাদর্শন হইল। পাণ্ডাগণ নারায়ণের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে। যাত্রীদিগকে দর্শনের নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র সময় দিয়া বিদায় করিয়া দিতেছে। দ্বাররক্ষকগণ যথারীতি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যাত্রীর দর্শনাদি করাইয়া অপর পার্শ্বস্থ দ্বার দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। দূর হইতে অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্টরূপে চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। মসৃণ, শ্যাম প্রস্তরময় মূর্ত্তি, পুষ্পমাল্য এবং বিবিধ মণিমাণিক্য সুবর্ণভূষণে ভূষিত। মস্তকে রত্নকিরীট, তদুপরি সুবর্ণের ছত্র শোভা পাইতেছে, বামে দক্ষিণে লক্ষ্মী, কুবের, উদ্ধব, নারদাদি দেবতাগণ। দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কি এক অননুভূত অচিন্তনীয় মধুরভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। শীঘ্রই মন্দিরদ্বার বন্ধ হইবে বলিয়া পাণ্ডাগণ তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিল। আমরা অল্পক্ষণে দর্শনাদি করিয়া মন্দিরের অন্যদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পুনরায় ৪ টার সময়ে মন্দির খুলিবে, সেই সময় প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিব মনে করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। তখনও সঙ্গিদ্বয়ের বাসা করা হয় নাই, পাণ্ডাগণ আমার সঙ্গী ভদ্রলোকদ্বয়কে বিশেষরূপে ধরিয়াছে। আমি প্রথমতঃ ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিলাম। তাঁহাদের মত হইল না। আমাকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে অনুরোধ করিলেন, আমিও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সঙ্গিদ্বয়ের অনুবর্ত্তী হইলাম। মন্দির হইতে অল্পদূরে সামান্য উচ্চভূমিতে জনৈক পাণ্ডার দ্বিতল গৃহে আমাদের স্থান হইল। পাণ্ডাজী আমাদের খুব যত্ন করিতে লাগিলেন এবং আমাদিগের যাহাতে কোনরূপে কষ্ট না হয়, তাহা করিতে তিনি সর্ব্বদ [illegible] হে।, এ কথা বলিতেও ত্রুটি করিলেন না। আমরা সেই পাণ্ডার অ[illegible] গৃহে "তল্পী-তল্পা" নামাইয়া তপ্তকুণ্ডে স্নান করিতে চলিলাম, বাজারের মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত রাস্তা দিয়া মন্দিরের নিকটে পৌঁছিলাম এবং কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তপ্তকুণ্ডের

নিকটবর্ত্তী হইলাম, উপরে ছাদবিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ কুণ্ডের ভিতরে দুই দিক্ হইতে দুইটি ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। জল তেমন গরম নহে, বেশ স্নান করিবার উপযুক্ত। সেই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার মধ্যে এইরূপ জলে স্নান করা বড়ই আরামজনক। কয়েক জন পাণ্ডা কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কোন যাত্রী স্নান করিতে নামিলেই অশুদ্ধ অর্থশূন্য মন্ত্রে সংকল্প করাইতেছে। কেহ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, এইরূপ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সংকল্প না করিলে তাহার যে নারায়ণদর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। আমরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উত্তমরূপে স্নান করতঃ উঠিয়া আসিলাম। পাণ্ডাজী আপন মনে কত কি বকিতে লাগিলেন। আমরা কুণ্ড হইতে উপরে উঠিয়া মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী রাস্তায় বরাবর বাজারে আসিলাম। বাজারের মধ্যে জনৈক মাড়বারদেশীয় গৃহস্থ ভক্ত আমাকে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। অতিশয় বিনয়নম্রবচনে জানাইল যে, আমি তাহার সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে সে ধন্য হয়। আমি তাহার বিনীত প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখি, তথায় আরও কয়েক-জন হিন্দুস্থানী সাধু, ভক্ত গৃহস্থকে ধন্য করিতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যথোপচারে উদরপূজা সমাপ্ত করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। সঙ্গি-দ্বয়ের সহিত কিছুক্ষণ সৎপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া বাজারের দিকে বহির্গত হইলাম। নিকটেই পোষ্টাফিস। আমি পুনরায় মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মন্দিরের দরজা খুলিতে অনেক বিলম্ব আছে। আমি মন্দিরের সোপান-তলে বসিয়া হিমালয়ের অলৌকিক রহস্য এবং বদরিকাশ্রমের অতুল মাহাত্ম্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

হিমালয়ে প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্যভাণ্ডার চির উন্মুক্ত। যে হিমালয়ান্তর্ব্বর্ত্তী পরম পবিত্র তপঃক্ষেত্র বদরিকাশ্রমে স্বয়ং ভগবান্ নরনারায়ণরূপ ধারণ করিয়া সুদীর্ঘকাল তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে তপস্যার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ যথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, অনুরক্ত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মহামুনি বেদব্যাসের সুমধুর বেদধ্বনিতে যে স্থান সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত, পতিতপাবনী অলকানন্দা শ্রীমন্দিরের পাদতলে বিধৌত করিয়া অবিরাম কল-কলনাদে যে স্থানে প্রবহমানা, এবং যে স্থান ভাবে, সৌন্দর্য্যে ও রমণীয়তায়

অতুলনীয়, জগদ্গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত ত্রিদিববাঞ্ছিত এই মহাপুণ্য-ধাম বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা যে আমার কত জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফল, তাহা বলিতে পারি না। বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রিবর্গ কোন্ দূরদূরান্তর হইতে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতঃ যাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছেন, সেই পরম সুন্দর চতুর্ভুজমূর্ত্তি নারায়ণ দর্শন আমি করিতে পারিলাম, ইহা আমার কম সৌভাগ্যের কথা নহে। পরম করুণাময়ের অসীম মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিত্যলীলানিকেতন এই আনন্দপুরীতে বহু আয়াসে প্রবেশ করিয়াছি। আহা! কি সুন্দর স্থান! কত দেশের কত সঙ্গতিসম্পন্ন নরনারী স্বদেশের গৃহপরিজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণদর্শন মানসে এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। কত শত নির্ধন, দরিদ্র, খঞ্জ, অন্ধ এবং অন্যান্য নানাবিধ দুরবস্থাপন্ন সম্পূর্ণ অক্ষম ব্যক্তি ভগবানের অলৌকিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সুদুর্গম গিরিসঙ্কট অবলীলাক্রমে অতিক্রম পূর্ব্বক প্রাণের আকুল আবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। চির-নির্ভর বিশ্বপিতার অভয় চরণে উৎসর্গীকৃতজীবন শত সহস্র সাধু মহাত্মার সমাগম হইয়াছে। কয়েকজন পরিণতবয়স্কা বাঙ্গালী বিধবা এই সুকঠিন পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া নারায়ণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। পরম শোভার আস্পদ হিমালয়ে প্রকৃতি দেবীর অসামান্য রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। স্বর্গধাম বদরিকাশ্রমের মন্দিরসোপানতলে বসিয়া আমার প্রকৃতই মনে হইতে লাগিল যে, মর্ত্ত্যের কোলাহল অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধ গম্ভীর গিরিশ্রেণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীভগবানের অপার মহিমা আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলাম। কি আনন্দে, কি উৎসাহে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহা বলিতে পারি না। ঐ সম্মুখে ত্রিলোকপাবনী অলকানন্দা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া সশব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সে পবিত্র বারিরাশিতে মন্দিরের পাদতল সর্ব্বদাই ধৌত হইতেছে। হিমালয়ের কি বিরাট্ মূর্ত্তি! বিচিত্র সম্পদ্শালী এবং যাবতীয় সৌন্দর্য্যের আকর এই সুবিশাল পর্ব্বতের অন্তঃস্থিত পরম পবিত্র রমণীয় বদরিকাশ্রম যে কত শত সাধু মহাত্মার সাধনাস্থান, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। সংসারের অসারতা উপলব্ধি

করিয়া কত শত ত্যাগী মহাপুরুষ এই মহাপুণ্যধামে ত্রিলোকপাবনী অলকানন্দার সুমধুর কলতানের সহিত আপনার হৃদয় মিশাইয়া দিয়া অনন্তের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। বিহঙ্গকুল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীভগবানের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভাবুকের শ্রবণে সুধা বর্ষণ করিতেছে। সুশীতল সমীরপ্রবাহে নানাবিধ পার্ব্বত্য কুসুমের মনোহর সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে। কি সুন্দর স্থান! এ স্থানে প্রাণ যেন আপনা আপনি মাতোয়ারা হইয়া উঠে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে এই চিরশুভ্র তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের যে স্বর্ণকান্তি ফুটিয়া উঠে, তাহা দেখিলে নয়ন সার্থক হয়। ধন্য ভগবন্! ধন্য তোমার লীলাভূমি!!

ঠং ঠং করিয়া মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে দেখিয়া যাত্রিবর্গ অতিশয় ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। আমিও মন্দিরে যাইবার নিমিত্ত সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখি, যাত্রিদল প্রবেশের নিমিত্ত কেবলই ঠেলাঠেলি করিতেছে। সেই জনতার মধ্যে পড়িয়া আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। কি করা যাইবে, এইরূপ কষ্টস্বীকার করিয়াই নারায়ণ দর্শন করিতে হইবে। দর্শনের নিমিত্ত সকলেরই ত সমান আগ্রহ। সকলেই দর্শনার্থী, ব্যাকুলতা সকলেরই সমান। ঘুরিয়া ফিরিয়া ধাক্কা খাইয়া যে যেমন দ্বাররক্ষকের সম্মুখবর্ত্তী হইতেছে, অমনি দ্বাররক্ষক তাহাকে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে সে অতি অল্প সময়ের জন্য দর্শনাদি করতঃ অন্য দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি সেই সময়ে কয়েকজন সাধুর সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে দ্বাররক্ষকের নিকটবর্ত্তী হইলে সে আমাদিগকে কথঞ্চিৎ সম্মান দেখাইয়া দেবতার সম্মুখীন করিয়া দিল। আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একটু বেশী সময়ের জন্য দর্শনাদি করিতে অধিকার পাইয়াছিলাম। প্রাণ ভরিয়া নারায়ণ দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। বেশীক্ষণ দাঁড়াইবার উপায় নাই, আমার ন্যায় শত শত যাত্রী দর্শন আশায় ব্যাকুল হইয়া মন্দিরদ্বারে সমবেত হইয়াছে দর্শনাদি করিয়া বাহিরে আসিলাম। দক্ষিণপার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। আশে পাশে অনেকে সিন্দুররঞ্জিত দেবতা খাড়া করিয়া জোরজুলুমের সহিত পয়সা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। প্রাঙ্গণে দ্বারের পার্শ্বে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত গরুড়ের মূর্ত্তি। মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ সমস্ত

দর্শনাদি করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। সম্মুখেই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাওল সাহেবের বিস্তৃত গদী।

একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষের ভিতরে বেশ মোলায়েম গদীতে বিবিধ মূল্যবান্ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া স্থিরগম্ভীরভাবে তিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান। ভিতরের দেয়ালে একটি ক্লকঘড়ীও শোভা পাইতেছে দেখিলাম। কয়েকজন লোক দর্শনীর টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানী এবং অলঙ্কাররাশি পৃথক্ করিয়া রাখিতেছে। অনেক যাত্রী টাকাপয়সা ছাড়াও স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কার ভেট দিয়া থাকেন। মোহান্তজী দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দুই হাতে সোনার বালা, কর্ণে বীরবৌলী, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় সুসজ্জিত। ইনি রাওল উপাধিধারী দক্ষিণাপথের কেরলদেশীয় ব্রাহ্মণ। শুনিলাম, টিহরীর রাজা দেবালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। দেবসেবার জন্য বহুসংখ্যক পুরোহিত ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত আছে। দেবোত্তর সম্পত্তি ও যাত্রিদত্ত অর্থে মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। ইহার দুই তৃতীয়াংশ দেবসেবার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট অর্থ ব্যাঙ্কে ডিপজিট না হইয়া দেশের জনসাধারণের হিতকল্পে ব্যয় হইলে অনেক কাজ হইত। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য, পালনকর্ত্তা নারায়ণ, তাঁহার মন্দিরের উদ্বৃত্ত অর্থ জীবসেবায় ব্যয় হইবে!! মানুষ দেবতার অর্থ ভোগ করিতে চায়!! যাহা হউক, অনেকক্ষণ নারায়ণজীর সদর কাছারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দিরের অপর পার্শ্ব হইতে কীর্ত্তনগীত শুনিতে পাইয়া আস্তে আস্তে সেই দিকেই অগ্রসর হইলাম। কয়েকজন সন্ন্যাসী সম্মিলিত কণ্ঠে সুস্বরে স্তব গান করিতেছেন,—

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল
হেম মন্দির শোভিতম্।
নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল
বদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন
ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্।

বেদ ব্রহ্মা করত অস্তুতি
বদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ধুনিকর
ধূপ দীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয়
বদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্॥

শুনিয়া শ্রবণ মন পরিতৃপ্ত হইল। রাওল সাহেবের গদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে যেমন মনটা খারাপ হইয়াছিল, তেমনি সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মিলিত কণ্ঠে এই মধুর স্তোত্রগাথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইলাম। এখানে একটি সাধুর জমায়েত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা রকমের সাধু একত্র হইয়াছেন। কোন ধনাঢ্য গৃহস্থ ভক্ত বদরিকাশ্রম মহাতীর্থে সাধু ভাণ্ডারা দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন। জনৈক সাধু আমাকে তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বেলা ১১টায় মাড়োয়ারী ভক্ত-প্রদত্ত পুরী হালুয়া ধারণ করিয়াছিলাম, এখন বেলা ৪টা। কিঞ্চিৎ ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া আমি আর অসম্মতি জানাইতে পারিলাম না। সাধু-দিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া অন্ন প্রসাদ ধারণ করা গেল। অনতি-দূরেই ব্রহ্মকপাল। এই স্থানে পিণ্ডদান করা যাত্রীদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার এইরূপ ফলশ্রুতি আছে যে, পিতৃলোক যতই কেন দুর্গতি প্রাপ্ত হউন না, বদরিকাশ্রমে আসিয়া অলকানন্দার তীরবর্ত্তী ব্রহ্মকপাল নামক স্থানে পিণ্ডদান করিলে তাঁহারা উদ্ধার পাইবেন। ব্রহ্মকপালে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে আর গয়া বা অন্য কোন তীর্থগমনের প্রয়োজন হয় না। এমনই স্থানমাহাত্ম্য!!

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবী।

Mohila Press, Calcutta.

মদন ভস্ম।

Mohila Press, Calcutta.

আলোচনা।

ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়।

আজকাল আমাদের সমাজে ধর্ম্মের নামে বেশ ব্যবসায় চলিতেছে। গুরু ব্যবসায়ী, পুরোহিত ব্যবসায়ী, পাণ্ডা ব্যবসায়ী। শিষ্যের সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকুক না থাকুক, আর্থিক সম্বন্ধটা যে আছেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে গুরু শিষ্য দুজনেই সমান দোষী। গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ্য করেন না, অথচ শিষ্যের নিকট অর্থ আদায়ে ব্যগ্র। শিষ্য ভোগাভিলাষে অর্থের শ্রাদ্ধ করিবেন, অথচ গুরুসেবার জন্য সামান্য কিছু ব্যয় করিতেও কাতর। পুরোহিতযজমানের ব্যবহারও তাহাই। আর পাণ্ডা মহাশয়দিগের ত কথাই নাই। লোকের তীর্থে যাওয়ার অভিলাষ থাকিলেও, পাণ্ডা মহাশয়দিগের অত্যাচারে সেখানে যাওয়া কাহারও সাধ্য নাই, তীর্থে গেলে পরিধানের বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত দিয়া আসিতে হয়। পাণ্ডা মহাশয়েরা কেবল যে ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করেন, তাহা নহে, অত্যাচারও করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে যে লোকের ধর্ম্মকার্য্যে অনাস্থা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সমস্ত বিষয়ের সংশোধন আবশ্যক। এ কথা আমরা বলি না যে, সদ্‌গুরু, সৎপুরোহিত ও সৎ-পাণ্ডার একেবারেই অভাব হইয়াছে। আজিও আদর্শ গুরু, পুরোহিত ও পাণ্ডা আমাদের সমাজে বিদ্যমান আছেন। কিন্তু অনেকে যে ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, সত্যের অনুরোধে তাহাও বলিতে হইতেছে। যাঁহারা সমা-জের মেরুদণ্ড, তাঁহারা যদি পচিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সমাজও যে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। সমাজের এ সকল দোষের সংস্কার না হইলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। সকলে ইহার প্রতিকারে যত্নবান্ হউন।

—:o:—

জীবিকাসমস্যা।

আমাদের সমাজের ভদ্রসন্তানগণের জীবিকা সমস্যাময় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রধান অবলম্বন চাকুরী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছে না। তাহার পর আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলে একই চাকুরীর উদ্দেশে ধাবিত। অধিকাংশ লোকে স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া চাকুরীর চেষ্টায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সেই জন্য জীবিকাসমস্যা দিন দিন গুরুতরই হইয়া উঠিতেছে। এ সমস্যার মীমাংসা হইবে কিরূপে? অনেকের মত—বিদেশ হইতে ব্যবসায়বাণিজ্য শিখিয়া আসা। তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা হইল, কিন্তু কোন সুফল ত দেখিলাম না। লাভের মধ্যে কতকগুলি যুবক সমাজভ্রষ্ট হইয়া গেল। সমাজ হইতে বাহির হইয়া যদি জীবিকার উপায় করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবিকার যে অধিক মূল্য আছে, ইহা আমরা মনে করি না। তবে সমাজে থাকিয়া কিরূপে জীবিকার উপায় হয়, ইহাও চিন্তার বিষয় বটে, এ সমস্যার পূরণ করিতে হইলে প্রথমে সকলকে জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। তাহাতে না কুলাইলে তখন অন্য উপায়ের চিন্তার প্রয়োজন। তাই বলিয়া আমরা সমাজের বাহির হইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। সমাজভ্রষ্ট হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করা অপেক্ষা সমাজে থাকিয়া ধীরে ধীরে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও ভাল। তাহাতে নিজত্ব ও মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। 'জাত গেল, পেট ভরিল না' ইহা লজ্জারও কথা বটে।

—:—

বেদ (৯)।

বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রণালী।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, পরিব্রাজকগণ অর্থাৎ আত্মবিদ্গণ বেদ মন্ত্রের দেবতাগণকে আত্মভাবেই দেখিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের মতে বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যাও সেইরূপ ভাবেই (আত্মভাবেই) করিতে হইবে। তাঁহারা যে সেইরূপ ভাবে মন্ত্রের অর্থ করিয়া থাকেন, তাহার একটি উদাহরণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে

প্রদর্শিত হইয়াছে। নৈরুক্তগণের মতে দেবতা তিন; অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র ও সূর্য্য। বেদোক্ত অপর দেবগণ এই ত্রিবিধ দেবগণের মূর্ত্তিভেদ বা নামভেদ; সুতরাং তাঁহাদের মতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাও ঐরূপ ভাবে করিতে হইবে। যাজ্ঞিক-গণ বেদমন্ত্রের বিভিন্ননামধেয় বহুদেবতাই স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাও ঐরূপ বিভিন্ন স্বতন্ত্র দেবতাগণের স্তুতিভাবেই করিতে হইবে। নৈরুক্তগণও বিভিন্ন দেবতার স্তুতিস্থলে তত্তৎদেবতাভাবেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। তবে তাঁহারা সেই সেই দেবতাকে তাঁহাদের মতানুযায়ী অগ্নি, ইন্দ্র বা বায়ু ও সূর্য্যের রূপভেদ মনে করিয়া তত্তৎস্থলে অগ্নি, ইন্দ্র বা সূর্য্য স্তুত হইতেছেন বুঝিয়া থাকেন।

আমরা ৭ম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় তিন; যজ্ঞ, দেবতা ও আত্মা; সুতরাং বেদমন্ত্রও স্থলবিশেষে অধিযজ্ঞ, অধিদেব ও অধ্যাত্ম ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যে স্থানে বেদমন্ত্রে যজ্ঞের উপকরণ দ্রব্যাদির বিষয় বর্ণিত হয়, সেই স্থলে মন্ত্রের অধিযজ্ঞ অর্থ মনে করিতে হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যাই মন্ত্রের অধিযজ্ঞভাবে ব্যাখ্যা। কারণ, উক্ত প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কার্য্যেই দেবগণ প্রধানতঃ স্তুত হইয়া থাকেন। সুতরাং যে স্থলে দেবগণের স্তুতি বর্ণিত হইয়া থাকে, সে স্থলে যজ্ঞব্যাপারও সংসাধিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে অধিদৈবের মধ্যে অধিযজ্ঞ অন্তর্ভূত রহিয়াছে বলিয়া একভাবে অধিদৈবকেও অধিযজ্ঞ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন বেদমন্ত্রের কোন দেবতার স্তুতিভাবে অর্থ করা হইয়া থাকে, সে স্থলে অধিযজ্ঞ অর্থ না বলিয়া অধিদৈব অর্থই কথিত হইয়া থাকে।

"সোমং মন্যতে পপিবান্" * এই মন্ত্রের ৩য় পাদস্থ সোম শব্দের অর্থ সোমরস ধরিয়া অর্থ করিলে মন্ত্রের অধিযজ্ঞ অর্থ হইবে। সোম শব্দের সোম দেবতা ধরিয়া অর্থ করিলে মন্ত্রের অধিদৈব অর্থ হইবে। এই মন্ত্রটি যাস্ক কর্ত্তৃক এই দুই অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে স্থলে অধিদৈবভাবে মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে, সে স্থলে আত্মপক্ষেও অর্থ হইবে। কারণ, পরিব্রাজকগণ প্রত্যেক দেবতাকে আত্মভাবে দেখিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের মতে মন্ত্রার্থও সেইরূপ হইবে।

* ঋ, স, ১০৷৮৫৷৩

দেবতাপক্ষে অর্থ আবার দুইপ্রকার হইয়া থাকে। কারণ, আর্য্যগণ দেবতাগণকে দুইভাবে দেখিয়া থাকেন। একভাবে দেবতা সূর্য্যচন্দ্রাদিভূতাভিমানিনী, অপরভাবে তাঁহারা বাগাদীন্দ্রিয়াভিমানিনী। ঋষিগণ যেমন সূর্য্যাদি ভূতপদার্থের চেতন অধিষ্ঠাতা পুরুষকে (চৈতন্যকে) সূর্য্যাদিদেবভাবে দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় (জ্ঞানময়) ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা পুরুষকে (চৈতন্যকে) দেবভাবে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝিতেন, চিদনধিষ্ঠিত জড় ও প্রকৃত্যনধিষ্ঠিত পুরুষ কোন কার্য্যই করিতে পারে না। জগতে তাঁহারা চিজ্জড়েরই সমাবেশ দেখিতেন। জগতের প্রত্যেক ব্যাপারেই চিৎ ও জড়ের অধিষ্ঠাত্রধিষ্ঠেয়ভাব রহিয়াছে। চৈতন্যই আত্মা, চৈতন্যই ব্রহ্ম, চৈতন্যই দেব। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন উপাধির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেবতানামে অভিহিত হইয়াছেন। আর্য্যগণ শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডভাবে দেখিয়া থাকেন। যেমন বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড নানাশক্তির লীলাক্ষেত্র, শরীরও সেইরূপ নানাশক্তির লীলানিকেতন। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্য যেরূপ বিভিন্ন দেবভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ দেহের নানাশক্ত্যধিষ্ঠাতৃ চৈতন্যও দেবভাবে দৃষ্ট ও উপাসিত হইয়া থাকেন। এই জন্যই দেবগণ দ্বিবিধ। সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে এক স্থলে বলিয়াছেন, "দ্বিবিধা দেবা হবির্ভুজ ইন্দ্রবরুণাদয়ঃ, শরীরনির্ব্বাহকাঃ, প্রাণাত্মকাঃ প্রাণাপানাদয়শ্চ দিব্যতীতি ব্যুৎপত্তেরুভয়ত্রাপি সম্ভবঃ।" অর্থাৎ দেবগণ উভয়বিধ, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি যজ্ঞের হবির্ভোক্তৃগণ ও শরীরনির্ব্বাহক প্রাণাত্মক (ইন্দ্রিয়াত্মক) প্রাণাপানাদি ইন্দ্রিয়নিচয়। দিব্‌ধাতুনিষ্পন্ন দ্যুত্যর্থ উভয়ত্রই সঙ্গত হইতে পারে। নৈরুক্তগণের মতে দেবতা তিন; অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র ও সূর্য্য। পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রকাশক সূর্য্যাভিমানী পুরুষ সূর্য্যদেবতা, আবার শরীরাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধ্যভিমানিচৈতন্যই আন্তর সূর্য্যদেবতা। তিনিই বুদ্ধির প্রকাশক ও প্রেরক, এজন্য তিনি গায়ত্রীমন্ত্রের প্রতিপাদ্য পরমদেবতা। চৈতন্যের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই সাংখ্যদর্শনে কথিত হইয়াছে,—"তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ চেতনাবদিব ভাতি লিঙ্গম্" আত্মচৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বুদ্ধি চেতনাবতী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই কারণে বাহ্য সূর্য্যদেবতার প্রতিরূপ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত আত্মচৈতন্যদেব। এইরূপে বাহ্য

বায়ুদেবতার প্রতিরূপ আন্তর প্রাণদেবতা। বাহ্য অগ্নিদেবতার প্রতিরূপ শারীর অগ্নি বা বৈশ্বানর। এইরূপ ইন্দ্রের প্রতিরূপও প্রাণদেবতা। আবার বহুদেবভাবে দেখিলে এক এক ইন্দ্রিয় এক এক দেবতা। বাহ্যসূর্য্যজ্যোতিঃ-প্রকাশিত ভূতচন্দ্রাভিমানী দেবই চন্দ্রদেব, সেইরূপ আত্মচৈতন্যপ্রকাশিত ও তদধিষ্ঠিত মনই আন্তর চন্দ্রদেব। উপাসনাস্থলে দেবতা বাহ্য ও আন্তরভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা প্রত্যেক আর্য্য উপাসকগণই অবগত আছেন। দেবগণের বাহ্য ও আন্তর ভাবে উপাসনাও শাস্ত্রে বিহিত আছে। দেবগণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত আছেন, এইরূপ বর্ণনা শাস্ত্রের বহু স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"ইদন্ত একং পর উত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সংবিশস্ব।
সংবেশনস্তন্বে চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে॥"

ঋ, অ, ৮।১।১৮।১, সা, বে, ভূ, আ, ১প্র, ২অ, ২দ

এই মন্ত্রে বৃহদুকৃথ ঋষি বাজিন নামক মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে পুত্র, তোমার দেহের মধ্যে যে অগ্নি আছে, সেই দেহগত অগ্নি-অংশদ্বারা বাহ্য অগ্নিতে প্রবেশ কর। তোমার দেহের মধ্যে যে বায়ু আছে, সেই প্রাণবায়ুরূপ অংশদ্বারা বাহ্য বায়ুতে প্রবেশ কর, তোমার দেহের মধ্যে যে আত্মাখ্য সূর্য্য আছেন, তাঁহার দ্বারা বাহ্য সূর্য্যে প্রবেশ কর। পুনর্ব্বার শরীরগ্রহণার্থে কল্যাণরূপ ধারণ করিয়া ও সূর্য্যদ্বারা তর্পিত হইয়া দেবগণের মধ্যে উত্তম ও তাঁহাদের জনক সূর্য্যে প্রবিষ্ট হও। *

* এতয়া বৃহদুকৃথো বাজিনং নাম স্বপুত্রং মৃতং বদতি। হে মৃত পুত্র, তে তব, ইদং জ্যোতিরগ্ন্যাখ্যং একং একোহংশঃ। অতঃ তে তব দেহগতাগ্ন্যংশেন বাহ্যমগ্নিং সবিশস্ব সংগচ্ছস্ব। তথা পর উ অন্যোহপি তে তব একং বায্বাখ্যোহংশঃ তেন চ প্রাণবায়্বাখ্যেনাংশেন বাহ্যং বায়ু সংবিশস্ব। শরীরাগ্নিপ্রাণনবায্বোঃ বাহ্যাগ্নিবায্বোশ্চৈকত্বাদংশত্বমিতি ভাবঃ। তথা তৃতীয়েন জ্যোতিষা আদিত্যাখ্যেন তেজসা তবাত্মনা (সূর্য্যং) সংবিশস্ব সূর্য্যগতাত্মচৈতন্যয়োর-ভেদাদংশত্বম্। "যোহহং সোহসৌ" "যোহসৌ সোহহম্" 'সূর্য্য আত্মা জগতঃ' ইত্যাদি শ্রুতে-রাত্মনঃ সূর্য্যপ্রবেশো যুক্তঃ। তন্বে তনবে পুনঃ শরীরগ্রহণায় চারুঃ কল্যাণো ভূত্বা তস্মিন্ সূর্য্যে সংবেশনঃ সম্যক্ প্রবেষ্টা এধি ভব। কীদৃশঃ ত্বম্। প্রিয়ঃ তেন হি প্রিয়মাণঃ। কীদৃশি:তস্মিন্। দেবানাং পরমে উত্তমে। জনিত্রে জনকে। "দেবানাং হ্যেতিৎ পরমং জনিত্রং যৎ সূর্য্যঃ' ইতি হি শ্রুতিঃ।

ইতি সায়নঃ।

এই খণ্ড মন্ত্রে বাহ্য সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নি দেবতার প্রতিরূপ সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নি শরীরাভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে, তাহা কথিত হইয়াছে। "যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহং" 'সূর্য্য আত্মা জগত' ইত্যাদি শ্রুতি সূর্য্যাধিষ্ঠিত চৈতন্য ও বুদ্ধ্যধিষ্ঠিত চৈতন্যের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণেন্দ্রিয়রূপে নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন. আদিত্য চক্ষুরূপে অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন ইত্যাদি বর্ণনা ঐতরেয় উপনিষদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। *

হৃদয়স্থিত আন্তর অগ্নি বা বৈশ্বানরদেবের বিস্তৃত বর্ণনা আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখিতে পাই। তাঁহার বর্ণনা এইরূপ; নারায়ণ সত্য, জ্ঞান, ও সানন্দাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্মতত্ত্ব; অতএব নারায়ণ পরমাত্মা, তিনি পরজ্যোতিঃস্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান জগতে সমীপবর্ত্তী যে কোন বস্তু দৃষ্ট ও দূরবর্ত্তী যে কোন বিষয় শ্রুত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই নারায়ণ। যেমন কটকমুকুটাদি আভরণের উপাদানকারণ সুবর্ণ ঐ সকল আভরণের বাহ্য ও আন্তর প্রদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদানকারণ নারায়ণ জগতের আন্তর ও বাহ্য দেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। তিনি দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তাঁহার বিনাশ নাই, তিনি চিদ্রূপে সর্ব্বজ্ঞ এবং সংসারের অবসানস্বরূপ। তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীবের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি সমস্ত সংসারসুখের মূল উপাদান সুখস্বরূপ। এইরূপে শ্রুতি নারায়ণের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার উপাসনার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রীবাবন্ধের নিম্নে ও নাভিপ্রদেশের দ্বাদশাঙ্গুলি উচ্চে অধোমুখ পদ্মকোরক সদৃশ অংশবিশেষকে হৃদয় বলিয়া জানিবে। এই হৃদয় বিশ্বের মহৎ আয়তনস্বরূপ, কারণ, তথায় মন অবস্থিত আছে, এই মনই স্বপ্নসদৃশ জগৎ কল্পনা করিয়া থাকে। এই যে শরীরের মধ্যে অধোভাবে লম্বমান পদ্মকোরক সদৃশ হৃদয়, ইহা চতুর্দ্দিকে শিরাদ্বারা ব্যাপ্ত। এই হৃদয়ের নিকটে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র (সুষুম্নানাড়ীনাল)

* অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ' ইত্যাদি।
ঐতরেয়োপনিষৎ ২।৪

বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সূক্ষ্ম ছিদ্রে সর্ব্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ এই ছিদ্রে মনঃসমাধান করিতে পারিলে জগতের আধারস্বরূপ পরমব্রহ্মের অনুভব হইয়া থাকে। সেই সুষুম্নানালমধ্যে মহান্ (প্রৌঢ়) অগ্নি বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই অগ্নি বহুশিখাযুক্ত ও চতুর্দ্দিকে অবস্থিত সর্ব্বনাড়ীমধ্যে সংসরণহেতু বহুমুখ (বিশ্বতোমুখ) এবং নিজ সম্মুখস্থ অন্ন সর্ব্বাগ্রে গ্রহণহেতু অগ্রভুক্। তিনি ভুক্ত আহার শরীরে সর্ব্বাবয়বে বিভাগ করিয়া অবস্থিত থাকেন। তিনি প্রাণিগণের দেহে অবস্থিত থাকিয়া, তাহাদের ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করিয়া, নিজে অজরভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন; অতএব তিনি অভিজ্ঞ বা কুশল। তিনি পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ সর্ব্বদা তাপযুক্ত করিয়া থাকেন। সেই জ্বালাবিশেষ দ্বারা সর্ব্বশরীরব্যাপী অগ্নির মধ্যস্থিত একটি বহ্নিশিখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম শিখা সুষুম্নানাড়ীনালদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যান্ত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। নীলতোয়দমধ্যস্থ বিদ্যুল্লেখার ন্যায় এই শিখা ভাস্বর। নীবার-বীজের শূকের (শুঁয়া) ন্যায় সূক্ষ্ম ও পীতবর্ণদীপ্তিযুক্ত এই শিখা জগতের সূক্ষ্ম বস্তুনিচয়ের উপমান হইবার যোগ্য। এই সূক্ষ্ম বহ্নিশিখার মধ্যে জগৎকারণ-ভূত পরমাত্মা বিশেষরূপে অবস্থিত আছেন। তিনি সর্ব্বদেবতাত্মক, তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব, তিনি হরি, তিনি ইন্দ্র, তিনি জগতের হেতুভূত মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর, অথচ তিনি মায়ারহিত, শুদ্ধ, চিদ্রূপ; অতএব তিনি স্বরাট্।*

নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥
অনন্তমব্যয়ং কবিং সমুদ্রেঽন্তং বিশ্বশম্ভুবম্।
পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্।
অধোনিষ্ট্যা বিতস্ত্যাং তু নাভ্যামুপরি তিষ্ঠতি॥
জ্বালামালাকুলং ভাতি বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সন্ততং শিরাভিস্তু লম্বত্যাকাশসন্নিভম্।
তস্যান্তে শুষিরং সূক্ষ্মং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
তস্য মধ্যে মহানগ্নির্বিশ্বার্চ্চির্বিশ্বতোমুখঃ।
সোঽগ্রভুগ্বিভজন্ তিষ্ঠন্নাহারমজরঃ কবিঃ॥
সন্তাপয়তি স্বং দেহমাপাদতলমস্তকম্।
তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা॥
নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।

এই বৈশ্বানর অগ্নির বিষয় বৃহদারণ্যকোপনিষদেও উপাসনার জন্য কথিত হইয়াছে। "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে।" এই অগ্নি বৈশ্বানর যিনি পুরুষের অন্তরে অবস্থিত আছেন, যাঁহার দ্বারা ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, 'তিনিই বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের ভুক্ত চতুর্ব্বিধ অন্নের পরিপাক করিয়া থাকেন।'* সূর্য্য বা আদিত্যদেবের মণ্ডলাধিষ্ঠাতৃভাব ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃভাব বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সত্য হিরণ্যগর্ভ, প্রথমজ, ব্রহ্ম, আদিত্য। আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ, তিনিই আদিত্য। তিনিই আবার দক্ষিণাক্ষিস্থ পুরুষ ॥১॥ চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনি আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা অভয়, ইহা ব্রহ্ম। এইরূপে ছান্দোগ্যোপনিষদে আত্মচৈতন্যই যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। † একই দেবতা আদিত্যে, হৃদয়ে ও দক্ষিণাক্ষিতে বিরাজিত আছেন। তিনিই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী। এই জন্যই কাত্যায়ন ঋষি তাঁহার শুক্ল যজুর্ব্বেদের অনুক্রমণী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—"ওঁ মণ্ডলং দক্ষিণমক্ষি হৃদয়ঞ্চাধিষ্ঠিতং যেন, শুক্লানি যজূংষি যাজ্ঞবল্ক্যো যতঃ প্রাপ তং ত্রয়ীময়মর্চ্চিষ্মন্তমভিধ্যায় মাধ্যন্দিনীয়ে বাজসনেয়কে + + + ঋষিদৈবতচ্ছন্দাংসি অনুক্রমিষ্যামঃ"। অর্থাৎ যিনি সূর্য্যমণ্ডল, দক্ষিণ অক্ষি ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুর্ব্বেদ যাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বেদময় ও অর্চ্চিষ্মান্ দেবকে অভিধ্যান করিয়া মাধ্যন্দিন বাজসনেয় বেদের (শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার) ঋষি, দেবতা

নীবারশূকবত্তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা।
তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে তু পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্॥

তৈত্তিরীয়রাণ্যকে ১০।১১

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥"

গীতা ১৫।১৪

॥১॥ তদ্যত্তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণে ঽক্ষন্ পুরুষঃ॥

বৃঃ আঃ ৫।৫।২

† "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি।"

ছা-উ ৪।১৫।১, ও ৮।৭।৪

ও ছন্দের অনুক্রমে বর্ণনা করিব। কাত্যায়নের এই বাক্যের অনুকরণ করিয়া উবট তাঁহার শুক্লযজুর্ব্বেদভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন,—

"হৃদয়ং দক্ষিণং চাক্ষি মণ্ডলঞ্চাধিরুহ্য যঃ।
চেষ্টতে তমহং নৌমি ঋগ্‌যজুঃসামবিগ্রহম্॥"

যিনি হৃদয়, দক্ষিণ অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলে অধিরোহণ করিয়া প্রাণিগণের সর্ব্বক্রিয়ার প্রেরকরূপে অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।

উপাসনাকালে বাহ্যভাবে ও আন্তরভাবে দেবতার চিন্তা করিতে হয়, তাহা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও অন্যান্য উপনিষদে বর্ণিত আছে। এ কথা আর অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করি না।

উপরি উল্লিখিত বেদমন্ত্র ও উপনিষদাদি হইতে আমরা অবগত হইলাম যে, নৈরুক্তগণের প্রধান তিন দেবতা ইন্দ্র বা বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য যেরূপ বাহ্য জগতে অধিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ দেহাভ্যন্তরে বা আন্তর জগতেও বিরাজিত রহিয়াছেন। দেবতাগণকে বহুভাবে দেখিলেও নৈরুক্তগণের মতে তাঁহারা এই তিন প্রধান দেবের রূপভেদ বা নামভেদ; সুতরাং তাঁহাদের আন্তর প্রতিরূপ বা দেহান্তরবর্ত্তী প্রতিরূপ আন্তর অগ্নি বা বৈশ্বানর, আন্তর বায়ু বা প্রাণ ও বুদ্ধিপ্রতিফলিত আত্মা বা সূর্য্য। তাহা হইলে বেদমন্ত্রের দেবতা-স্তুতিভাবে অর্থ হইলেই এই দুইপ্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে।

বাহ্য অগ্ন্যাদিভাবে অর্থ অধিদৈব অর্থ, আন্তর অগ্ন্যাদিভাবে অর্থ অধ্যাত্ম অর্থ, বেদমন্ত্রের আত্ম বা ব্রহ্মভাবে অর্থও অধ্যাত্ম অর্থ, এই অর্থই পরিব্রাজক বা আত্মবিদ্‌গণের অনুমোদিত। কোন কোন মন্ত্রে ভৌতিক পদার্থের স্বরূপ প্রধানভাবে কথিত হইয়াছে, সেইভাবে অর্থ করিলে তাহা মন্ত্রের অধিভূত অর্থ হইবে। তবে যদি ভৌতিক পদার্থ প্রধানতঃ যজ্ঞের উপকরণভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অর্থ অধিযজ্ঞ অর্থরূপে কথিত হইয়া থাকে। যখনই কোন ভৌতিক পদার্থের বিষয় বেদমন্ত্রে কথিত হইয়াছে, তখন প্রায়ই যজ্ঞের উপকরণভাবে অথবা অন্য কোনরূপে যজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধভাবেই কথিত হইয়া থাকে, সেজন্য অধিভূত অর্থও অধিযজ্ঞ নামেই ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে দেখা গেল, বেদমন্ত্র প্রধানতঃ অধিযজ্ঞভাবে, অধিদৈবভাবে ও অধ্যাত্মভাবে এই ত্রিবিধভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যে স্থলে বেদমন্ত্র অধিদৈব অর্থে

ব্যাখ্যাত হয়, সে স্থলে অধ্যাত্ম অর্থে ব্যাখ্যাত না হইলেও দেবতার বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে সেই স্থলে উপাসকের নিকট যে অধ্যাত্ম অর্থ হইবে, তাহাতে আর কোনরূপ সংশয় হইবার কারণ নাই। যাস্কপ্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যকারগণ এই ত্রিবিধ ভাবেই বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আগামী প্রবন্ধে তাঁহাদের প্রদর্শিত ব্যাখ্যার উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী।

মায়াবাদ।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দার্শনিকগণ যখন জগতের মূলতত্ত্বগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা এই প্রপঞ্চের মূলে একটি অবিনশ্বর ব্যাপক বস্তুর অস্তিত্ব অবগত হইলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুকালের গবেষণার পর স্থির করিলেন যে, বাহ্য জগতেও এই অবিনশ্বর সর্ব্বব্যাপী একত্বের অস্তিত্ব নিত্য সত্যরূপে বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের মতে আকাশই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব। আর্য্যও আকাশই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূল, তাহা হইতে আর সকল ভৌতিক অবস্থা প্রাকৃতিক পরিণাম দ্বারা উদ্ভূত হয়। এই সিদ্ধান্তই শেষ নয়—তাঁহারা আরও স্থির যোগবলে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন—স্থূল ভৌতিক প্রপঞ্চের পশ্চাতে একটি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ আছে, এই প্রপঞ্চের মূল ভৌতিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম আকাশ। এই আকাশও শেষ বস্তু নয়—প্রকৃতি বা জগন্ময়ী ক্রিয়াশক্তি তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী স্পন্দনে এই প্রধান সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে কোটি কোটি অণু উৎপাদন করেন এবং এই অণু দ্বারা সূক্ষ্ম ভূত গঠিত হয়। প্রকৃতি বা ক্রিয়াশক্তি আপনার জন্য কিছুই করেন না, যাঁহার শক্তি, তাঁহারই তুষ্টিসম্পাদনার্থ এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি ও নানাগতি। আত্মা বা পুরুষ এই প্রকৃতির ক্রীড়ায় অধ্যক্ষ ও সাক্ষী। পুরুষ ও প্রকৃতি যাহার স্বরূপ ও ক্রিয়া, সেই অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্ম জগতের অবিনশ্বর অদ্বিতীয় মূল সত্য। মুখ্য উপনিষদসমূহে আর্য্য ঋষিগণের তত্ত্বানুসন্ধানে যে সত্যগুলির আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহাদের কেন্দ্রস্বরূপ এই ব্রহ্মবাদ ও পুরুষপ্রকৃতিবাদ

প্রতিষ্ঠিত আছে। তত্ত্বদর্শিগণ এই মূল সত্যগুলি লইয়া নানা চিন্তাপ্রণালীর সৃষ্টি করিলেন। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা বেদান্তদর্শনের প্রবর্ত্তক; যাঁহারা প্রকৃতিবাদের পক্ষপাতী, তাঁহারা সাঙ্খ্যদর্শন প্রচার করিলেন। তাহা ভিন্ন অনেকে পরমাণুকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূল তত্ত্ব বলিয়া স্বতন্ত্র পথের পথিক হইলেন। নানা পথ বাহির হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই সকল চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্যাসদেবের মুখে উপনিষদের সত্যগুলি পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলেন, পুরাণকর্ত্তৃগণও ব্যাসদেবের রচিত পুরাণকে আধার করিয়া সেই সত্যগুলির নানা ব্যাখ্যা—উপন্যাস ও রূপকচ্ছলে সাধারণ লোকের নিকট উপস্থিত করিলেন। ইহাতে বিদ্বানের বাদবিবাদ বন্ধ হইল না, তাঁহারা নিজের মত প্রকাশপূর্ব্বক বিশদরূপে দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সিদ্ধান্ত সকল তর্কদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের ষড়্দর্শনের আধুনিক স্বরূপ এই পরবর্ত্তী চিন্তার ফল। শেষে শঙ্করাচার্য্য দেশময় বেদান্তপ্রচারের অপূর্ব্ব ও স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদান্তের আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন। তাহার পর অবশিষ্ট পঞ্চদর্শন অল্পসংখ্যক বিদ্বানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের আধিপত্য ও প্রভাব চিন্তাজগৎ হইতে প্রায় তিরোহিত হইল। সর্ব্বজনসম্মত বেদান্তদর্শনের মধ্যে মতভেদ উৎপন্ন হইয়া তিনটি মুখ্য শাখা ও অনেকগুলি গৌণ শাখা স্থাপিত হইল। জ্ঞানপ্রধান অদ্বৈতবাদ এবং ভক্তিপ্রধান বিশিষ্টদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিরোধ এখনও হিন্দুর মধ্যে বর্ত্তমান। জ্ঞানমার্গী ভক্তের উদ্দাম প্রেম ও ভাবপ্রবণতাকে উদ্দাম লক্ষণ বলিয়া উড়াইয়া দেন; ভক্ত জ্ঞানমার্গীর তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহাকে শুষ্ক তর্ক বলিয়া উপেক্ষা করেন। উভয় মতই ভ্রান্ত এবং সঙ্কীর্ণ। ভক্তিশূন্য তত্ত্বজ্ঞানে অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া মুক্তিপথ অবরুদ্ধ থাকে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রম-সঙ্কুল তামসিকতা উৎপাদন করে। প্রকৃত উপনিষদ্দর্শিত ধর্ম্মপথে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য ও পরস্পর সহায়তা রক্ষিত হইয়াছে।

যদি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজনসম্মত আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত আর্য্যজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত করিতে হয়। দর্শনশাস্ত্র চিরকাল একপক্ষপ্রকাশক ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত জগৎ এক সঙ্কীর্ণ মতের অনুযায়ী তর্কদ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে গেলে, সত্যের একদিক্ বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু

অপরদিকের অপলাপ হয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মায়াবাদ এইরূপ অপলাপের দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র যে জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রাবল্য প্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, সংসারে জ্ঞাতবিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক, অজ্ঞ অপ্রবৃত্তিমুগ্ধ অকর্ম্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তবে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন সর্ব্বচেষ্টা নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন অনেক প্রবল ও উপযোগী বৃত্তি ক্রীড়া করিতেছে, সেই সকলের উপেক্ষায় কোনও জাতি টিকিতে পারে না। এই অনর্থের ভয়ে শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক ও ব্যবহারিক বলিয়া জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ দেখাইয়া অধিকারভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি সেই যুগের ক্রিয়াসঙ্কুল কর্ম্মমার্গের প্রতিবাদ করায় বিপরীত ফল ফলিয়াছে। শঙ্করের প্রভাবে সেই কর্ম্মমার্গ লুপ্তপ্রায় হইল, বৈদিক ক্রিয়া সকল তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে জগৎ মায়াসৃষ্ট, কর্ম্ম অজ্ঞানপ্রসূত ও মুক্তির বিরোধী, অদৃষ্টই সুখদুঃখের কারণ ইত্যাদি তমঃপ্রবর্ত্তক মত এমন দৃঢ় বসিয়া গেল যে, রজঃশক্তির পুনঃপ্রকাশ অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির রক্ষার্থ ভগবান্ পুরাণ ও তন্ত্রপ্রচারে মায়াবাদের প্রতিরোধ করিলেন। পুরাণে উপনিষৎপ্রসূত আর্য্যধর্ম্মের নানাদিক্ কতকটা রক্ষিত হইল, তন্ত্রশক্তি-উপাসনায় মুক্তি ও ভক্তিরূপ বিবিধফলপ্রাপ্ত্যর্থ লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন। যাঁহারা জাতিরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছেন,—প্রতাপসিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়প্রভৃতি প্রায় সকলেই শক্তি-উপাসক বা তান্ত্রিক যোগীর শিষ্য ছিলেন। তমঃপ্রসূত অনর্থের নিষেধ করিবার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসন্ন্যাসের বিরোধী উপদেশ দিয়াছেন।

মায়াবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর পরম মায়াবী, তিনি তাঁহার মায়াদ্বারা দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। একই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম জগতের মূল সত্য, সমস্ত প্রপঞ্চ তাঁহার অভিব্যক্তিমাত্র,

স্বয়ং পরিণামশীল ও নশ্বর। যদি ব্রহ্ম একই সনাতন সত্য হয়, ভেদ ও বহুত্ব কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন, এই প্রশ্ন অনিবার্য্য। ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে ব্রহ্ম হইতেই ভেদ ও বহুত্ব প্রসূত। ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা উৎপন্ন, ইহাই উপনিষদের উত্তর। সেই শক্তিকে কোথায়ও মায়া, কোথায়ও পুরুষ অধিষ্ঠিত প্রকৃতি, কোথায়ও বা ঈশ্বরের বিদ্যা অবিদ্যাময়ী ইচ্ছাশক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে তার্কিকের মন সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই; কিরূপে এক বহু হয়, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় নাই। শেষে একটি সহজ উত্তর মনে উদয় হইল, এক বহু হয় না, সনাতন অভেদে ভেদ উৎপন্ন হইতে পারে না, বহু মিথ্যা, অভেদ অলীক, সনাতন অদ্বিতীয় আত্মার মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ভাসমান মায়ামাত্র, আত্মাই সত্য, আত্মাই সনাতন। ইহাতেও গোল, মায়া আবার কি, মায়া কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন? শঙ্কর উত্তর করিলেন, মায়া কি, তাহা বলা যায় না, মায়া অনির্ব্বচনীয়, মায়া প্রসূত হয় না, মায়া চিরকাল আছে, অথচ নাই। গোল মিটিল না, সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। এই তর্কে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে আর একটি সনাতন অনির্ব্বচনীয় বস্তু প্রতিষ্ঠিত হইল, একত্ব রক্ষিত হইল না।

শঙ্করের যুক্তি হইতে উপনিষদের যুক্তি উৎকৃষ্ট। ভগবানের প্রকৃতি জগতের মূল, সেই প্রকৃতিশক্তি, সচ্চিদানন্দের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। আত্মার পক্ষে ভগবান্ পরমাত্মা, জগতের পক্ষে পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তিময়ী; সেই ইচ্ছা দ্বারাই এক হইতে বহু, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়। পরমার্থের হিসাবে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, পরা মায়া প্রসূত, কারণব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। দেশকালের মধ্যেই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব, ব্রহ্মের দেশকালাতীত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মের মধ্যে প্রপঞ্চযুক্ত দেশকাল; ব্রহ্ম দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রসূত, ব্রহ্মের মধ্যে বর্ত্তমান, সনাতন অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মে আদ্যন্তবিশিষ্ট জগতের প্রতিষ্ঠাতা, তত্র ব্রহ্মের বিদ্যা অবিদ্যাময়ী শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। যেমন মানুষের সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি ব্যতীত কল্পনা দ্বারা অলীক বস্তু উপলব্ধি

করিবার শক্তি বিদ্যমান, তেমনি ব্রহ্মের মধ্যেও বিদ্যা ও অবিদ্যা, সত্য ও অনৃত বিদ্যমান আছে। তবে অনৃত দেশকালের সৃষ্টি। যেমন মানুষের কল্পনা দেশ-কালের গতিতে সত্যে পরিণত হয়, তেমনই যাহাকে আমরা অনৃত বলি, তাহা সর্ব্বথা অনৃত নহে, সত্যের অনমুভূত দিঙ্‌মাত্র। প্রকৃত পক্ষে "সর্ব্বং সত্যং"; দেশকালাতীত অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু আমরা দেশকালাতীত নহি, আমরা জগৎ মিথ্যা বলিবার অধিকারী নহি। দেশকালের মধ্যে জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ সত্য। যখন দেশকালাতীত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইবার সময় আসিবে ও শক্তি উৎপন্ন হইবে, তখন আমরা জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিব; অনধিকারী বলিলে মিথ্যাচারও ধর্ম্মের বিপরীত গতি হইয়া থাকে। আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলা অপেক্ষা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ব্রহ্ম বলা উচিত। ইহাই উপ-নিষদের উপদেশ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম." এই সত্যের উপর আর্য্যজাতির ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত।

শ্রীসুখরঞ্জন সেনগুপ্ত।

কবিকথা।

(ভবভূতি)

মালতীমাধব।

(৮)

কামন্দকীর আশ্রমে মালতীমাধবের পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল, তাঁহারা সেইখানেই রহিলেন, অবলোকিতা তাঁহাদের যত্ন লইতে লাগিলেন। পরিব্রাজিকা নন্দনের গৃহ হইতে আশ্রমে আসিলে, অবলোকিতা তাঁহার বন্দনাদি করিলেন।

সে দিন মালতীমাধব গ্রীষ্মের সান্ধ্য স্নান শেষ করিয়া সরোবরতীরে শিলা-তলে বসিয়াছিলেন, অবলোকিতা ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকট আসিলেন। ক্রমে

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ও চন্দ্রোদয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, মদনসুহৃৎ নিশীথ-কালের যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিল। পরিশুষ্ক তালীপত্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ চন্দ্রকিরণ স্ফুরিত হইবামাত্র তিমিররাশি বিদলিত হইয়া গেল। সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালহরী দেখিয়া বোধ হইল, যেন পবনবেগে কেতকীপুষ্পের ঘন পরাগসম্ভার উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশতলে মন্দ মন্দ প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে।

পরিণয়ের পর মালতী মাধবের সহিত আলাপাদি করেন নাই, মাধব সে জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, তিনি কিরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। মাধব মালতীকে বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমে, তুমি সান্ধ্য স্নানে সুশীতলা হইয়াছ, নিদাঘশান্তির জন্য যাহা বলি, তাহাতেই তুমি অন্যরূপ মনে কর কেন? আমার প্রার্থনা, যতক্ষণ কবরীর জলবিন্দু ক্ষরিত হইবে, যতক্ষণ বক্ষঃস্থল আর্দ্র থাকিবে, এবং যতক্ষণ তোমার অঙ্গযষ্টিতে পুলকোদ্গম প্রকাশ পাইবে, ততক্ষণ আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া অনুগৃহীত কর। আমার অনুরোধত তুমি শুনিতেছ না, কিন্তু আবার বলিতেছি, ইন্দুকিরণচুম্বনে জল-নিস্যন্দী চন্দ্রকান্তমণিহারের ন্যায় প্রগাঢ়ভয়জড়িত স্বেদবিন্দুসিক্ত তোমার বাহুটি আমার কণ্ঠে অর্পণ করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুল। অথবা তাহা ত দূরের কথা, এ জন কি তোমার আলাপেরও পাত্র নহে? মলয়ানিল ও চন্দ্রকিরণে দগ্ধ এ দেহ তোমার স্পর্শলাভে শীতল নাই হউক, কিন্তু আমত্তকোকিলরবে ব্যথিত আমার কর্ণ দুইটি কিন্নরকণ্ঠি, তোমার মধুর বচনামৃত পান করুক, ইহাই এক্ষণে অভিলাষ।"

তখন অবলোকিতা মালতীকে বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি অত্যন্ত বামশীলা। মুহূর্ত্তমাত্র মাধবকে না দেখিয়া তুমি বিমনা হইয়া উঠ, এবং আমাকে বলিতে থাক, 'আর্য্যপুত্র বিলম্ব করিতেছেন, কতক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইব? দেখা পাইলে ভয় পরিত্যাগ করিয়া আনমেষলোচনে দেখিতে দেখিতে বলিব, আমায় গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আদর কর।' সেই তোমার এই পরিণাম?"

শুনিয়া মালতী অসূয়াভরে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, মাধবও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি সর্ব্বতোমুখী নিপু-ণতা, এবং তাঁহার সুভাষিতরত্নকোষই বা কি অক্ষয়!"

তাহার পর তিনি মালতীকে কহিলেন,—"প্রিয়ে! অবলোকিতা সত্য কথাই বলিতেছেন।"

মালতী মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মাধব আবার বলিলেন,—"তোমাকে লবঙ্গিকা ও অবলোকিতার দিব্য, যদি কথা না বল।"

'আমি কিছুই জানি না' এইমাত্র বলিয়া মালতী লজ্জিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মাধব তাঁহার অর্দ্ধোক্ত ও অর্থশূন্য বাক্যের চারুতায় প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অশ্রুমোচন দেখিয়া অবলোকিতাকে বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! বাষ্পজলে মৃগাক্ষীর বিমল কপোল সহসা প্রক্ষালিত হইয়া উঠিল যে! তাহাতে আবার জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইয়া বোধ হইতেছে, যেন কান্তিসুধা পানের ইচ্ছায় চন্দ্রদেব কিরণরূপ মৃণালদণ্ড সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

অবলোকিতা বলিলেন,—"সখি, উচ্ছলিত অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া রোদন করিতেছ কেন?"

তখন মালতী বলিতে লাগিলেন,—"সখি, কত দিন আর প্রিয়সখী লবঙ্গিকার বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করিব? তাহার সংবাদটি পর্য্যন্তও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।"

মাধব মালতী কি বলিতেছেন অবলোকিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন,—"আপনার শপথে লবঙ্গিকাকে স্মরণ করিয়া তাহার সংবাদের জন্য সখী উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছেন।"

শুনিয়া মাধব কহিলেন,—"আমি এখনই কলহংসকে পাঠাইয়াছি, সে প্রচ্ছন্নভাবে নন্দনভবনে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবে।"

তাহার পর আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"অবলোকিতে, মদয়ন্তিকার প্রতি বুদ্ধরক্ষিতার প্রযত্ন কি সফল হইবে?"

অবলোকিতা উত্তর দিলেন,—"ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। আচ্ছা, আপনি যখন ব্যাঘ্রনখাঘাতে কাতর মকরন্দের চেতনালাভ শুনিয়া মালতীকে মনঃপ্রাণদানে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, এক্ষণে যদি কেহ মকরন্দের মদয়ন্তিকালাভের সংবাদ দেয়, তাহা হইলে তাহাকে কি পারিতোষিক দিবেন, বলুন দেখি?"

শুনিয়া মাধব কহিলেন,—"আমাকে যাহা জিজ্ঞাসার, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।"

তাহার পর নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কেন, অনুরাগভরে আমার রচিত ও প্রিয়সখীর আনীত যাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রিয়তমা সম্মানিত করিয়াছিলেন, এবং আমার সহিত পরিণয়ের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, লবঙ্গিকাভ্রমে আমাকে যাহা সর্ব্বস্বরূপে দান করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার প্রথমদর্শনে পরাভবসাক্ষিণী মদনোদ্যানের অলঙ্কার বকুলবৃক্ষের প্রসূনমালাই পারিতোষিক হইবে।"

সে কথায় অবলোকিতা মালতীকে বলিলেন,—"সখি মালতি, এই বকুল-মালা তোমারই প্রিয়তমা, দেখিও সহসা যেন পরহস্তগত না হয়।"

শুনিয়া মালতী কহিলেন,—"প্রিয়সখী ভাল উপদেশই দিয়াছে।"

সেই সময় কাহাদের পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল, অবলোকিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। মাধব মনোনিবেশ করিয়া কলহংসকে দেখিতে পাইলেন, ও তাহা জানাইলেন। মালতী তখন বলিয়া উঠিলেন,—"মদয়ন্তিকালাভে তুমি বিজয় লাভ করিলে।"

মাধব অমনি মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"ইহা অপেক্ষা আর কি প্রিয় আছে?"

এই বলিয়া নিজ কণ্ঠ হইতে বকুলমালা উন্মোচন করিয়া মালতীর গলায় পরাইয়া দিলেন।"

অবলোকিতা বলিতে লাগিলেন,—"বুদ্ধরক্ষিতা ভগবতীর প্রদত্ত কার্য্যভার নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়াছেন।"

আনন্দসহকারে মালতীও বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকে দেখিতেছি।"

মুহূর্ত্তমধ্যে কলহংস, মদয়ন্তিকা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা ত্রস্তভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। নন্দনের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিলে, মকরন্দ রক্ষিগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, কলহংস মহিলাদিগকে লইয়া আসে। তাই তাঁহারা ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন।

লবঙ্গিকা মাধবকে কহিল,—"মহাভাগ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, অর্দ্ধপথে মকরন্দকে নগররক্ষীরা আক্রমণ করিয়াছে। সেই সময়ে কলহংসের সহিত দেখা হওয়ায়, তিনি আমাদিগকে ইহার সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

কলহংস বলিতে লাগিল,—"আমরা এ দিকে আসিতে আসিতে যে মহান্ কলরব শুনিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, পরকীয় সৈন্য আসিয়া পড়িয়াছে।"

মালতী ও অবলোকিতা বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! এককালে হর্ষ ও বিষাদ দুইই ঘটিল।"

মাধব মদয়ন্তিকাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখি মদয়ন্তিকে, তোমার আগমনে আমাদের গৃহ অনুগৃহীত হইল। সখার পৌরুষ সুপ্রসিদ্ধ, তুমি কাতরা হইতেছ কেন? আর একাকীর প্রতি বহুলোকের আক্রমণ তাঁহার পক্ষে কিছুই নহে। দেখ, যুদ্ধে অতুলবিক্রমের প্রণয়াভিলাষী সিংহের শব্দায়মান নখরনিকরে ভীষণ, গণ্ডস্থল হইতে ক্ষরিত মদধারায় সিক্ত গজরাজের শিরোস্থিদলনে রত করই একমাত্র সহায় হইয়া থাকে; আমি সেই বিক্রমশোভিত প্রিয়সুহৃদের সাহায্যে চলিলাম।"

এই বলিয়া তিনি কলহংসের সহিত উৎকট পরাক্রমসহকারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অবলোকিতাপ্রভৃতি বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে ইঁহারা দুই জনে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিলে বাঁচি।"

মালতী অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতাকে সত্বর পরিব্রাজিকার নিকট এ ব্যাপার জানাইবার জন্য কহিলেন। আর লবঙ্গিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"সখি, তুমি গিয়া আর্য্যপুত্রকে বলিয়া আইস, যদি আমাদের প্রতি তাঁহাদের অনুকম্পা থাকে, তাহা হইলে যেন সাবধান হইয়া চলেন।"

লবঙ্গিকা, অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মালতী ও মদয়ন্তিকা দুইজনে মাত্র রহিলেন। কিরূপে সময় কাটাইবেন, মালতী তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তিনি কিছু অগ্রসর হইয়া লবঙ্গিকার পথের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। সেই সময় তাঁহার দক্ষিণচক্ষু স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

গুরুবধের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য কপালকুণ্ডলা ক্রমাগত সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তিনি মালতীমাধবের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন, আজিও তিনি কামন্দকীর আশ্রমে আসিয়াছেন। মদয়ন্তিকার নিকট হইতে মালতী

কিছু দূরে আসিয়া পড়ায়, কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে একাকিনী পাইয়া কহিলেন,—পাপিনি, থাক্, তোকে দেখিতেছি।"

মালতী 'হা আর্য্যপুত্র' বলিবামাত্র তাঁহার বাক্‌রোধ ঘটিল। তখন ক্রোধ ও হাস্যসহকারে কপালকুণ্ডলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ডাক্ ডাক্! তোর প্রিয়তম কোথায়? সেই তপস্বিহন্তা কন্যাকামুক তোর পতি আসিয়া রক্ষা করুক। শ্যেনপক্ষীর পতনে চকিতা বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় কিসের চেষ্টা করিতেছিস্? অনেকদিন পরে আজ আমার কবলে পড়িয়াছিস্। আয়, তোকে শ্রীপর্ব্বতে লইয়া গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দুঃখ দিতে দিতে মারিয়া ফেলি।"

এই বলিয়া মালতীকে লইয়া কপালকুণ্ডলা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, কেহই ইহা বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে মদয়ন্তিকাও মালতীর অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

সহসা লবঙ্গিকা আসিয়া কহিল,—"সখি, আমি লবঙ্গিকা, মালতী নহি।"

মদয়ন্তিকা বলিলেন—"মাধবের দেখা পাইয়াছ কি?"

তখন লবঙ্গিকা বলিতে আরম্ভ করিল,—"না না, সখি, তিনি উদ্যান হইতে বাহির হইয়াই কলরব শুনিবামাত্র সগর্ব্বপদক্ষেপে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, কাজেই এ হতভাগিনী ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে শুনিলাম, ঘরে ঘরে গুণানুরাগী পৌরজনেরা মহানুভব মাধব ও সাহসিক মকরন্দের জন্য বিলাপ করিতেছে। মহারাজও মন্ত্রিকন্যাদ্বয়ের বঞ্চনা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং অনেক প্রবীণ পদাতিক পাঠাইয়া দিয়াছেন, নিজেও সৌধশিখরে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত দেখিতেছেন।"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা—'মন্দভাগিনী আমি মরিলাম' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"মালতী কোথায়?"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"সে তোমার পথপানে চাহিয়া থাকিবার জন্য অগ্রেই বাহির হইয়াছে। আমি পশ্চাৎ আসিয়া তাহাকে আর দেখিতে পাইতেছি না, বোধ হয় গহনবনে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।"

লবঙ্গিকা কহিল,—"চল সখি, শীঘ্র গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করি। আমার

প্রিয়সখা অতি কাতরাই আছেন, যে অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহাতে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।”

তাহার পর তাঁহারা মালতীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন উত্তর পাইলেন না।

এ দিকে পদাতিসকল রাজপথে অবিরত তরবারি চালনা করিতেছিল, চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইয়া অস্ত্রসমূহকে উজ্জ্বল, রমণীয় ও ভীষণ করিয়া তুলিতেছিল, মকরন্দের সম্মুখে যাহারা পড়িতেছিল, তাঁহার নির্দ্দয় প্রহারে তাহারা ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে কলকল রবে আকাশতল প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। সে সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন বলদেব হলদ্বারা যমুনার সলিলরাশি আকর্ষণ করিতেছেন। মাধবের সমর-সাহসও অতুল। তাঁহার ভীষণ ভুজবজ্রের আঘাতে সৈনিকদিগের হস্ত হইতে অস্ত্রশস্ত্র নিপতিত হইতে লাগিল, এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজপথ পদাতিকশূন্য হইয়া গেল।

গুণানুরাগী পদ্মাবতীশ্বর এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সৌধ হইতে অবতরণ করিলেন, ও প্রতিহার দ্বারা বিনয়বচনে সকলকে শান্ত করিয়া তুলিলেন। রাজা মাধব ও মকরন্দকে আনাইয়া তাঁহাদের মুখচন্দ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কলহংসের নিকট হইতে তাঁহাদের বংশপরিচয় শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। তাহার পর ক্রোধে ও লজ্জায় মলিনমুখ ভূরিবসু ও নন্দনকে মধুরবচনে সেই ভুবনভূষণ, মহানুভব, প্রিয়দর্শন ও গুণাভিরাম জামাতৃদ্বয়ের লাভে সন্তুষ্ট হইতে বলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কলহংস পরিব্রাজিকাকে এই সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে ছুটিয়া আসিল, মাধব ও মকরন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন।

উদ্যানের নিকট আসিয়া মকরন্দ মাধবের লোকাতীত প্রবল তেজের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“কি আশ্চর্য্য! সখার ভুজদণ্ডে নিষ্পেষিত বীরগণের কঙ্কাল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদের হস্ত হইতে অস্ত্রসকল আকর্ষণ করিয়া তিনি বিক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর দুই পার্শ্বে স্তম্ভিত পদাতিসকল পলাইয়া সেই নরমুণ্ডসমাকীর্ণ সমর-সাগরের পথ করিয়া দিল।”

মাধবও বলিতে লাগিলেন,—"ইহা একটি অনুতাপের বিষয় বটে, দেখ, সখে, যাহারা নিশীথোৎসবে জ্যোৎস্নাখচিত, লীলাময়ী ও বিলাসবতী বনিতাসকলের পীতাবশিষ্ট মদ্যপান করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার ভুজদণ্ডের গুরুতর প্রহারে তাহারাই অবশেষে ভগ্নাস্থিশরীরে সংসারীদিগকে অসার ও বিফল বলিয়া জানাইয়া দিল। সে যাহা হউক, মহারাজের সৌজন্য কিন্তু চিরস্মরণীয়, আমরা অপরাধী হইলেও নিরপরাধের ন্যায়ই ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে চল, মালতীর নিকট মদয়ন্তিকাহরণের কথা বলিবে। তোমার কথনসময়ে সস্মিতা মালতীর বিলোল কটাক্ষে পরাহত, লজ্জায় স্তিমিতনয়ন মুখপদ্মখানি সখী মদয়ন্তিকা যখন অবনত করিবেন, তখন সে দৃশ্যটি কতই মধুর বলিয়া বোধ হইবে।"

উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি, দীর্ঘিকাপ্রদেশ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?"

মকরন্দ তাহার উত্তরে কহিলেন,—"আমাদের বিপদে ব্যাকুল হইয়া এদিক্ ওদিক্ বিচরণ করিয়া এক্ষণে তাহারা গহনবনে আত্মবিনোদন করিতেছে। চল, গিয়া দেখি।"

এই বলিয়া উভয়ে বনমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা মালতীকে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সৌভাগ্যক্রমে আপনা-দিগকে অক্ষতশরীরে দেখিতেছি।"

মাধব ও মকরন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মালতী কোথায়?"

দুই জনে উত্তর দিলেন,—"মালতী আর কোথায়? আপনাদের পদশব্দে আমরা মালতী বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মাধব বলিতে লাগিলেন,—"আমার হৃদয় যেরূপে সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে, তাহা বলিতে পারিতেছি না, এক্ষণে তোমরা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বল। পদ্মাক্ষীর অনিষ্টচিন্তায় আমার হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, অন্তরাত্মা পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আবার বামচক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে। তোমাদের কথাও কষ্টকর, হায়! আমি একেবারেই হত হইলাম।"

তখন মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আপনার এখান হইতে

গমনের পর অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতাকে ভগবতীর নিকট যাইতে বলিয়া, সাবধান করিবার জন্য মালতী লবঙ্গিকাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিল। পরে উৎকণ্ঠিতা হইয়া উহার পথপানে চাহিয়া থাকার ইচ্ছায় সে অগ্রেই চলিয়া আসিল। তাহার পর আমরা আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। বনে বনে অন্বেষণ করিতে করিতে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

মদয়ন্তিকার কথা শুনিয়া 'হা প্রিয়ে মালতী' বলিয়া মাধব বিলাপ করিয়া উঠিলেন, ও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার যেন তোমার অমঙ্গলাশঙ্কা হইতেছে। তাই বলি, চণ্ডি, পরিহাস পরিত্যাগ কর, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। তোমার প্রতি এ জন অনুরক্ত কি বিরক্ত, তাহা কি তুমি জান না? এক্ষণে উত্তর দাও। আমার বিহ্বল হৃদয় যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তুমি অত্যন্ত নির্দ্দয়া।"

লবঙ্গিকা এবং মদয়ন্তিকাও "হা প্রিয়সখি, তুমি কোথায়?" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তখন মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"বয়স্য, না জানিয়া শুনিয়া এরূপ বিহ্বল হইতেছ কেন?"

মাধব উত্তর দিলেন,—"সখে, মাধবস্নেহে কাতরা হইয়া তিনি যে সকলই করিতে পারেন, তাহা কি তুমি জান না?"

মকরন্দ আবার বলিলেন,—"তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি ভগবতীর নিকট গিয়াছেন। চল, গিয়া দেখি।"

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহাই সম্ভব বটে।"

মাধব ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তবে তাহাই হউক।"

তাহার পর সকলে পরিব্রাজিকার নিকট অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে মকরন্দ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের সখী ভগবতীর আশ্রমে গিয়াছেন কি না, কিংবা তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন কি না, ইহাই আশঙ্কা হইতেছে। বান্ধব, সুহৃৎ ও প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গমাদির সুখ প্রায়ই সৌদামিনীস্ফুরণের ন্যায় চঞ্চল হইয়া থাকে।"

বনস্মৃতি ।*

মনে পড়ে সখি, রহি কাছাকাছি
বাহুতে বাহুতে বদ্ধ,
না খুঁজি অর্থ, চিত্তে দোঁহার
উদয় যা হতো সদ্য,
না ভাঙ্গিয়া ক্রম অবিরত শুধু
করিয়া যেতাম গল্প,
গণ্ডের পরে গণ্ডে না রাখি
অন্তর অতি অল্প,
কোথায় প্রহর হইত অতীত
রসাবেশে মোহ-অন্ধ,
লীলায় রজনী করিতাম ভোর
গল্প হতো না বন্ধ।

কালিদাস রায়।

বিচিত্র শাস্তি। †

দলিছে হৃদয় ফেলে না ভাঙ্গিয়া
গাঢ় উদ্বেগযাতনা,
বিকল অঙ্গে আনিছে মূর্চ্ছা
হরিয়া লয় না চেতনা।
অন্তর্দ্দাহ জ্বালায় অঙ্গ
ভস্ম করে না তাহারে,
জীবনসূত্র ছিঁড়ে না বিধাতা
জর্জ্জরে শুধু প্রহারে।

শ্রীকালিদাস রায়।

* উত্তররামচরিত হইতে।
† উত্তররামচরিত হইতে।

আবরণ উন্মোচন।

রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য যখন পৌনে দুই শত টাকা হইতে একেবারে আড়াই শত টাকার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নামটির উপরও বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। কাটিয়া ছাঁটিয়া যেমন পোষাকের উন্নতি হইল, নামটিরও সেইরূপ ল্যাজা-মুড়া বাদ দিয়া আর, ভট্টাচার্য্যাতে পরিণত করিলেন।

এই সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল—নূতন পদোন্নতি হইয়াছে—বিশেষ সাহেবের প্রিয়পাত্র হইতে হইবে, এ সময়ে নগ্নপদে মুণ্ডিতমস্তকে আফিসে উপস্থিত হওয়া রমাপ্রসাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিশেষ সাহেব কিছু অতিরিক্ত খৃষ্টভক্ত।

রমাপ্রসাদের স্ত্রী, দুইটি কন্যা ও বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত কেহই ছিল না। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। এমন কি, বাস্তুভিটাটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। সংসারে দরিদ্রের কেহ তত্ত্ব করে না—সমাজেরও প্রয়োজন হয় না। রমাপ্রসাদ পিতৃহীন হইয়া স্রোতের কুটার মত — বিধবা মাতার সহিত লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি কষ্টে রমাপ্রসাদ এণ্ট্রান্স পাশ করিলেন। পরাশ্রয়পালিত রমাপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই লোকের প্রিয় হইবার প্রকরণাদি বিশেষভাবে অভ্যস্ত করিয়া লইলেন। ইহার ফলে তিনি সওদাগরী আফিসে সামান্য কেরাণী হইতে আজ বড়বাবুতে উন্নত হইয়াছেন।

বাল্য হইতেই রমাপ্রসাদের ধারণা হইয়াছিল, অর্থই জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু—অর্থহীনের শ্রেষ্ঠত্ব লোকে কোন সময়ই স্বীকার করে না; তাই রমাপ্রসাদ অর্থকেই জীবনের ইষ্ট করিয়া লইলেন। এ ধারণা অর্থ ও পদবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃই তাঁহার বাড়িতে লাগিল।

এখন তাঁহাকে সকলে সম্মান করে। যে গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল—যিনি তাঁহার পৈতৃক ভিটাটুকু ১৫৲ টাকায় বন্ধক রাখিয়া সুদে আসলে

৬৬৮/১৭॥ করিয়া উদরস্থ করিয়াছিলেন—তিনি যাচিয়া আসিয়া আলাপ করিয়া সেই বাস্তুভিটা একশত টাকায় ফিরাইয়া দিলেন। যিনি তাঁহার বিধবা মাতাকে পেটভাতায় রাঁধুনী রাখিয়া বিধবাকে মৎস্যচুরির অপবাদে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, এবং জাতিপাতের উদ্যোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ঘোষগিন্নী গঙ্গাস্নানযোগ উপলক্ষে রমাপ্রসাদের অনুসন্ধান করিয়া অনিমন্ত্রণে তাঁহার বাটীতে আশ্রয় লইয়া রমাপ্রসাদের মাতার প্রসাদের অভিলাষী হইলেন। ইত্যাদি নানা কারণে রমাপ্রসাদের সমাজের উপর বিশেষ তেমন আস্থা ছিল না।

রমাপ্রসাদ মাতৃশ্রাদ্ধে মস্তক মুণ্ডন করিলেন না, এবং পায়ের অসুখ বলিয়া চর্ম্মপাদুকা স্থলে রবারের জুতা ব্যবহারের ব্যবস্থা টোল হইতে করিয়া আনিলেন। আফিস যাইতে হইলে পোষাক না পরিয়া গেলে চলে না—তাই তিনি কাচার উপর চোগাচাপকান পরিয়া আফিস করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধে রমাপ্রসাদ যথেষ্ট ব্যয় করিয়া বড় বড় পিতলের ঘড়া প্রভৃতি পণ্ডিত-সমাজকে বিদায় দিলেন। সর্ব্বত্র ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। মিষ্টান্নপ্রত্যাশী-দিগের চক্ষে রমাপ্রসাদের বেশ ও জুতা অদৃশ্য হইয়া রহিল।

রমাপ্রসাদের ক্রমশঃই উন্নতি হইতে লাগিল। সাহেবের সে অত্যন্ত প্রিয়, সাহেব একবার দুর্গোৎসবের ছুটী ১২ দিনের স্থলে তিন দিন করিয়া বড়দিনের ছুটী বাড়াইবার মনস্থ করিলেন। আফিসের বাঙ্গালীবাবুরা এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। অনেকে রমাপ্রসাদের নিকট আসিয়া সাহেবকে অনুরোধ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল—রমাপ্রসাদ সে কথায় কান দিলেন না, তিনি সাহেবের মতই সমর্থন করিলেন।

যদিও ছুটী কমান গেল না—কিন্তু রমাপ্রসাদের প্রতি সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার পাঁচ শত টাকা বেতন হইল। রমাপ্রসাদের এই ব্যবহারে আফিসের সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। রাস্তায় ঘাটে পথে আফিসের ছোঁড়ার দল, তাঁহাকে দেখিলেই "ঐ বড় সাহেবের পুষ্যি যাচ্ছে" ইত্যাদি বলিয়া আকার ইঙ্গিতে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। রমাপ্রসাদ প্রথম ২।৪ দিন হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু এই বিদ্রূপের মাত্রা দিন দিন এতই প্রবল হইয়া পড়িতে লাগিল যে, রমাপ্রসাদ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রমা-

প্রসাদ যতই বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ততই ছোঁড়ারা বেশী করিয়া বলে; রমাপ্রসাদ চটিয়া সাহেবকে বলিয়া কাহারও জবাব দিলেন, কাহারও জরিমানা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও এই বিদ্রোহীর দল শান্ত হইল না। সকলে তাঁহাকে দেখিলে গা টেপাটিপি করে, হাসাহাসি করে, বন্ধুবান্ধবকে শিখাইয়া দেয়; রমাপ্রসাদকে সকলে পাগল করিয়া তুলিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সাহেব রাগ করিবেন বুঝিয়াও রমাপ্রসাদ পর বৎসর বাটীতে দুর্গোৎসব করিলেন। কিন্তু তাহাতেও দুর্ভোগ কমিল না। পুষ্যির পূজা বলিয়া অনেকে আবার ইঙ্গিতে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। রমাপ্রসাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া একেবারে ব্রাহ্ম হইয়া পড়িলেন। হিন্দু দেবদেবীর নিন্দা তাঁহার মুখে অনবরত লাগিয়া রহিল। সাহেব ভারি তুষ্ট হইলেন। নানাপ্রকারে রমাপ্রসাদ তাঁহার দ্বারা সাহায্য পাইতে লাগিলেন। বসতবাটী বিক্রয় করিয়া রমাপ্রসাদ সাহেব পল্লীতে নূতন বাটী ক্রয় করিলেন। কিন্তু পত্নী লক্ষ্মীদেবী স্বামীর এই দিন দিন পরিবর্ত্তনে বড়ই মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিলেন না।

রমাপ্রসাদের দুইটি কন্যা। একটির বয়স বার বৎসর—অন্যটির বয়স দশ বৎসর। কন্যা দুইটিকে বেথুনকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সাহেবীয়ানা ভাবে রমাপ্রসাদ সাহেব পল্লীতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

অনুকরণ করিতে বিলম্ব হয় না—শীঘ্রই বড় কন্যা ললিতা আপনাকে ছোট খাট মেমে পরিণত করিল। সে মিস্ বাবা না বলিলে রাগ করে, দুইটি বাঙ্গালার সঙ্গে দশটি ইংরেজী বুক্‌নি দেয়। প্রবেশিকা দিবার পূর্ব্বেই তাহার ক্ষীণদৃষ্টি দেখা দিল। অতএব ডাক্তারের পরামর্শমত চস্‌মা ব্যবহার করা সুরু করিয়া দিল।

ছোট মেয়ে মালতী বড় লাজুক—সে সাহেবিয়ানা চাল বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। এইজন্য তাহার দিদি তাহাকে বিদ্রূপ করিত। সে নীরবে মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রুজলে মাতার বক্ষ সিক্ত করিয়া দিত। কিন্তু এই কন্যাটিকেই রমাপ্রসাদ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কন্যা লাজুক, সমাজে ভাল মিশিতে পারে না—মধ্যে মধ্যে রমাপ্রসাদ তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেন।

দুইবার চেষ্টা করিয়াও ললিতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। বয়সও প্রায় ১৬।১৭ হইয়াছে। রমাপ্রসাদ কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মমতেই শীঘ্রই এক গ্রাজুয়েট যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। যুবকটি পরম সুশ্রী।

ললিতার পতি ক্ষীরোদচন্দ্র ললিতার সহিত যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া চলিতে লাগিলেন। ললিতাও এইরূপ রূপবান্ ও বিদ্বান্ পতি লাভ করিয়া পরম সুখী হইল। রমাপ্রসাদ জামাতার কন্যার প্রতি প্রীতি দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। জামাতার কোন কোন ব্যবহার তাঁহার নিতান্ত কপট বলিয়া মনে হইত। জামাতা যে কেবল তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্যই কন্যাকে মৌখিক আদর যত্ন করে, এ ধারণা লক্ষীদেবীর দিন দিন মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিন্তু এ কথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। তীক্ষ্ণভাবে জামাতার কার্য্যে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন।

ক্ষীরোদচন্দ্র কোন একটি আফিসে কর্ম্ম করিতেন—বেতন ৮০।৯০৲ টাকা ছিল। এইরূপে ছয় মাস কাটিয়া গেল। ক্ষীরোদচন্দ্র শ্বশুরের নিকট কথাচ্ছলে বিলাত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রমাপ্রসাদ 'বিবেচনা করিয়া দেখিব' ইত্যাদি বলিয়া কথাটি চাপিয়া অন্যকথা উত্থাপন করিলেন। সে দিন আর বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা হইল না।

ক্ষীরোদচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, শ্বশুরের নিকট তেমন বিশেষ কিছু আশা নাই। সে প্রায়ই কথাচ্ছলে পত্নীকে বিলাত গেলে লোকের সহজে উন্নতি হয়—এই সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনাইতে লাগিল। সাধারণতঃ রমণীর মন কোমল। বিশেষতঃ তাহার স্বামী যেরূপ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, সে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে—এখানে যে একটি কৃষ্ণ বিষ্ণু হইতে পারিবে, তাহাতে ললিতার কোন সন্দেহ ছিল না। তবে দুই বৎসর স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে—উভয়ের দেখাশুনা হইবে না ভাবিয়া একটা কষ্ট অনুভব করিত। অর্থ থাকিতে পিতা তাহার স্বামীকে সাহায্য করিতেছেন না, এজন্য পিতার উপর তাহার বড়ই রাগ হইল। ক্ষীরোদচন্দ্র তাহার পত্নীকে বুঝাইলেন, দুই বৎসর দুঃখ, কিন্তু ভবিষ্যতে অনন্তসুখ—মূর্খের মত তাহা নষ্ট করা উচিত নয়। ললিতারও মন অনেকটা নরম হইল।

একদিন সুযোগমত স্ত্রীর ৫০০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কার হস্তগত করিয়া, পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া, গোপনে ক্ষীরোদচন্দ্র বিলাতযাত্রা করিল। অল্প-দিনের মধ্যেই এ সংবাদ বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রমাপ্রসাদ কন্যা ও জামাতার প্রতি বিরক্ত হইলেন।

ললিতা এ অপমান নীরবে সহ্য করিল। তাহার আশা ছিল, তাহার স্বামী শীঘ্রই ব্যারিষ্টার কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিবে। ভবিষ্যতের এই কল্পিত সুখস্বপ্নে পিতার অতুষ্টি লইয়া সে নীরবে বসবাস করিতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছোট কন্যা মালতী রমাপ্রসাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল—হঠাৎ মালতী পীড়িত হইয়া পড়িল। মুখে স্ফোটকের মত হইয়া সুন্দর গণ্ডে ক্ষত হইল। বহুচিকিৎসায় সে ক্ষত গেল না। রমাপ্রসাদ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারের উপর ডাক্তার আসিতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না। প্রথমে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হইত; ক্রমশঃই জ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তারেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে একদিন লক্ষ্মীদেবী তাঁহার স্বামীকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি একটা দৈব ঔষধ ব্যবহার করাইয়া দেখি।' কন্যার জীবনের আশা নাই—যদি ভাল হয় বিবেচনায় পত্নীকে দৈব ঔষধ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। কোন বিখ্যাত সিংহবাহিনীদেবীর দাওয়ার মাটীর প্রলেপ দিলে দুষ্ট ক্ষত দূর হয়, এইরূপ প্রবাদ লক্ষ্মীদেবীর শোনা ছিল। ভক্তিমতী সাধ্বী—সিংহবাহিনীর মাটী আনাইয়া কন্যার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুই চারি দিনের মধ্যেই ক্ষতের আশ্চর্য্য-জনক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। বিজ্ঞ ডাক্তারেরা রোগীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রমাপ্রসাদের অজ্ঞাতে তাঁহার মনে দেবীর প্রতি একটা প্রগাঢ় ভক্তি সঞ্চারিত হইল।

অল্পদিনের মধ্যেই জ্বরত্যাগ হইল, মালতীর ক্ষতও অনেক সারিয়া উঠিল। পত্নী লক্ষ্মীদেবী সিংহবাহিনীদেবীকে মানসিক প্রেরণ করিলেন। কন্যা সুস্থ হইল। কিন্তু তাহার গণ্ডের ক্ষতের দাগ নষ্ট হইল না। বামগণ্ডের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া অতি বিশ্রী হইয়া গেল। কন্যার জীবনরক্ষা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া রমাপ্রসাদ এ ক্ষতিতে তত্তোধিক কাতর হইলেন না।

ক্ষীরোদচন্দ্র ৬।৭ মাস পরেই পত্নীকে এক চিঠি লিখিল, তাহার সমস্ত টাকাকড়ি হোটেল হইতে চুরি গিয়াছে, সে এখন রাস্তার ভিখারী—শীঘ্র টাকা না পাঠাইলে অনশনে মরিবে। কম্পিতপদে ললিতা চিঠিখানি পিতার হস্তে দিয়া পিতার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া 'বাবা, তাঁকে ক্ষমা কর' বলিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। রমাপ্রসাদ স্থিরভাবে পত্রখানি পড়িলেন—তার পর কন্যার হাতদুইটি ধরিয়া তুলিয়া স্থিরভাবে বলিলেন, "ভয় কি মা! অবশ্য উপায় করিব।"

আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া ক্ষীরোদচন্দ্রকে ৯০০৲ শত টাকা পাঠান হইল। ললিতাও কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীকে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিল।

বালিকা প্রত্যহ স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় চলিয়া গেল—ক্ষীরোচন্দ্র আসিল না; টাকার রসিদও ফিরিয়া আসিল। ক্ষীরোদচন্দ্র কিন্তু ভালমন্দ কোন সংবাদ দিল না। আবার ললিতা কাঁদিয়া কাটিয়া চিঠি লিখিল—তাহারও কোন জবাব আসিল না। চিন্তিত রমাপ্রসাদ কন্যার অনুরোধে বিলাতের হোটেলের ম্যানেজারের নামে টেলিগ্রাম করিয়া জামাতার সংবাদ লইলেন। সংবাদ আসিল, ক্ষীরোদচন্দ্র শারীরিক ভাল আছে। তবে ক্ষীরোদচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিবার কারণ কি—রমাপ্রসাদ ও ললিতা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

ছয়মাস পর ক্ষীরোদচন্দ্রের আবার একখানি পত্র আসিল। উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে ললিতা খুলিয়া দেখিল। স্বামী লিখিয়াছেন, তিনি আইনের পরীক্ষা দিবেন, এত খরচপত্র করিয়া মিছামিছি ফিরিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনায়, তিনি শ্বশুরপ্রেরিত টাকা পাইয়াও ফিরিয়া যান নাই। আর ১০০০৲ টাকা পাঠাইলেই তাঁহার পাঠ শেষ হয় এবং স্বদেশে ফিরিয়া তিনি দশের ভিতরে একজন হইতে পারেন। এই টাকাটি কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্য ললিতাকে বিস্তর অনুরোধ করা হইয়াছে। ললিতা পত্র পড়িয়া আশ্বস্ত হইল; কিন্তু অত টাকা কিরূপে সংগ্রহ হইবে ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

পিতার কথা অমান্য করিয়া স্বামী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, এরূপ অবস্থায় পিতা যে তাঁহাকে আর কিছু সাহায্য করিবেন, ললিতা তাহা সম্ভব-

পর বিবেচনা করিল না। ম্রিয়মাণা ললিতা মাতার হস্তে পত্র দিল। লক্ষ্মী-দেবী পত্র পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন—তাঁহার মনে একটা অশুভ আশঙ্কা জাগিয়াছিল—কিন্তু কন্যাকে তাহা প্রকাশ করিলেন না। ললিতা বলিল, "মা, এখন উপায় কি?" মাতা কন্যাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া, 'যাহা হউক একটা উপায় হইবে' বলিয়া শান্ত করিলেন। কিন্তু সপ্তাহ গেল, টাকা পাঠাইবার কোন উদ্যোগ হইল না। অপরাধী স্বামীর জন্য বার বার পিতাকে অনুরোধ করিতে ললিতার আর সাহস হইল না। তাহার দারুণ অস্বচ্ছন্দতায় দিন কাটিতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও ললিতা কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার নিজ নামের সেভিংসব্যাঙ্কের খাতায় ৯০০৲ শত টাকা আছে। এ টাকার কথা ললিতার স্বামীর বিলাতযাত্রার সময় মনে পড়ে নাই। ভবিষ্যৎসুখের আশায় স্বামীর উন্নতির জন্য তাই সে নিজের অলঙ্কারগুলি পিতার অজ্ঞাতে স্বামীকে দিয়াছিল। এই টাকার কথা মনে পড়ায় ললিতা অনেকটা আশ্বস্ত হইল। পরদিনই সে পিতামাতাকে লুকাইয়া সেভিংসব্যাঙ্ক হইতে সেই টাকা স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিল।

ইহার দুই চারি দিন পরেই সুযোগমত লক্ষ্মীদেবী স্বামীকে জামাতার বিষয় বলিলেন, নানা তর্কবিতর্কের পর 'এই হাজার টাকা পাঠাইতেছি, আর পাঠাইতে অনুরোধ করিও না' বলিয়া রমাপ্রসাদ জামাতাকে হাজার টাকা প্রেরণ করিলেন, এবং জামাতাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

টাকা পাঠান হইল, প্রাপ্তিসংবাদ আসিল; কিন্তু ক্ষীরোদচন্দ্র ললিতাকে কোন পত্র লিখিল না। ললিতা পত্র লেখে, উত্তর আসে না। ৩।৪ মাস গেল। আবার অনেক কাঁদাকাটি করিয়া পিতার দ্বারায় হোটেলের ম্যানেজারকে টেলি-গ্রাম করিয়া স্বামীর সংবাদ লইল। ক্ষীরোদচন্দ্র ভাল আছে, তবে পত্র লেখে না কেন? ললিতা স্থির করিল, হয়ত পড়াশুনায় ব্যস্ত, এ সময়ে অন্য চিন্তা ভাল নয় বিবেচনা করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র পত্রাদি লেখেন না। কিন্তু একছত্র তাঁহার মঙ্গল লিখিলে আমরা সুখী—তিনি কি এতটুকু সময় পান না? ললিতা মনে একটা আঘাত অনুভব করিল।

ছয় মাস হইয়া গিয়াছে—ক্ষীরোদচন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

এক দিন রমাপ্রসাদ একখানি সংবাদপত্র হস্তে করিয়া, ললিতাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা! ক্ষীরোদ বিলাত হইতে রওনা হইয়াছে। আগামী সপ্তাহে বোম্বে আসিয়া পৌঁছিবে। সে ব্যারিষ্টার হইয়াছে।"

ললিতা আনন্দে—আশায় সেই শুভদিনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কই, ক্ষীরোদচন্দ্র আসিল না। প্রথমে সকলে মনে করিল, হয়ত বোম্বাই প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু তিন মাস গেল, ক্ষীরোদের কোন সংবাদ নাই।

চিন্তায় চিন্তায় ললিতা শ্রীহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার মুখে হাসি নাই, কেশের পারিপাট্য নাই, বেশের শৃঙ্খলা নাই, চরিত্রেরও আর উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলে না—বালিকা নিয়ত অন্তর্দাহে অতি যাতনায় দিনপাত করিতে লাগিল। কন্যার অবস্থা দেখিয়া মাতাপিতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিশেষভাবে তাঁহারা জামাতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রায় চারি বৎসর পরে সন্ধান হইল, এলাহাবাদ হাইকোর্টে ক্ষীরোদচন্দ্র প্রাক্‌টীশ করিতেছে।

রমাপ্রসাদ কন্যাকে লইয়া জামাতার নিকট যাইবার ইচ্ছা করিলেন। এক-দিন মর্ম্মাহতা কন্যাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইলেন।

ক্ষীরোদচন্দ্রের সন্ধান লইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। এলাহাবাদের এড্‌-মনিষ্টোন্ রোডের উপর একখানি সুপরিচ্ছন্ন বাংলায় ক্ষীরোদচন্দ্র বসবাস করিতেছে। পসারপ্রতিপত্তিও যথেষ্ট। বেলা ১০ টার পর ষ্টেসন হইতে গাড়ী করিয়া রমাপ্রসাদ কন্যার সহিত জামাতার সাক্ষাতে চলিলেন।

বাংলার সম্মুখেই কৃষ্ণপ্রস্তরে সোনার জলে K. Mukerjee Bar-at-law, লেখা রহিয়াছে। জামাতার ঐশ্বর্য্যে রমাপ্রসাদ সুখী হইলেন। রমাপ্রসাদ কন্যার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। ললিতার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আজ চারি বৎসর পরে সে স্বামিসন্দর্শনে যাইতেছে—আজ তাহার স্বামী একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। মনে মনে একটা আনন্দ হইল। কিন্তু এই সুখে স্বামী তাঁহার দুঃসময়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। উন্নতির প্রথমে সে নিজের অলঙ্কার বেচিয়া সাহায্য করিয়াছিল, আজ উন্নত অবস্থায় তাহাকে স্মরণ করেন নাই, অযাচিতভাবে স্বামিসন্দর্শনে আসিয়াছে, এজন্য তাহার অভি-

মান ও লজ্জাসঙ্কোচে ক্ষুদ্র হৃদয়টি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পা নড়ে না, কম্পিত-পদে ললিতা পিতার সহিত বাংলার উদ্যানের ফটকে প্রবেশ করিল। সম্মুখে বারান্দার সিঁড়ি নানাজাতীয় জামগাছে সজ্জিত, সম্মুখে একটা ক্যানারি পাখী টাঙ্গান—তাঁহারা প্রবেশ করিতেই একজন পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন উর্দ্দীপরা খানসামা আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিয়াছিল, হয়ত ইহারা সাহেবের মক্কেল। রমাপ্রসাদ একখানি কার্ড দিয়া সাহেবকে সেলাম দিতে বলিলেন; খানসামা সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। রমাপ্রসাদ চারিদিকের সজ্জিত উদ্যান দেখিতে লাগিলেন। ললিতার কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে যেন হাওয়ার উপর দাঁড়াইয়াছিল। বেহারা বারান্দা হইতে তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। রমাপ্রসাদ কন্যার সহিত ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিলেন। সুসজ্জিত গৃহ, মূল্যবান্ কোচচেয়ারে পরিপূর্ণ। রমাপ্রসাদ কন্যার সহিত আসন গ্রহণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই একজন শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া অভি-বাদন করিয়া তাঁহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রমাপ্রসাদ ক্ষীরোদ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন—বলিলেন। বিনীতভাবে মেমসাহেব বলিলেন, তাঁহার স্বামী মিষ্টার কে, মুখার্জ্জি আদালতে গিয়াছেন। ৪ টার সময় সাক্ষাৎ হইবে। স্তম্ভিত হইয়া রমাপ্রসাদ বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, কি বলিলেন, বুঝিলাম না।" ললিতার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। মেম-সাহেব আবার বলিলেন, "আমার স্বামী কোর্টে গিয়াছেন। ৪টার পর দেখা হইবে।"

রমাপ্রসাদ কন্যার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হৃদয়ে শত সহস্র বৃশ্চিক-দংশন অনুভব হইল। মেমসাহেবের নিকট বিদায় লইতে ভুলিয়া গেলেন। কন্যার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে রমাপ্রসাদ একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্মিতনেত্রে মেমসাহেব তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল, কারণ কিছু বুঝিতে পারিল না। বোধ হয়, সে ভাবিয়া থাকিবে, এ দেশবাসী কি অসভ্য! রমণীর সম্মান জানে না।

রমাপ্রসাদ গাড়ীতে বসিয়া গাড়োয়ানকে আদালত যাইতে আদেশ করিলেন। পিতা কন্যা উভয়েই নীরব—কিছুক্ষণ পরে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "উঃ! কি অকৃতজ্ঞতা!" ললিতার কণ্ঠতালু শুকাইয়া আসিয়াছিল—তথাপি হৃদয়ে আশা—হয়ত ইনি সে নন।

গাড়ী আদালতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। কাহারও স্নান আহার হয় নাই। রমাপ্রসাদ কে, মুখার্জ্জির বাবুর অনুসন্ধান করিলেন—সহজেই সন্ধান হইল। বাবুটি একজন বি, এ প্লাকড্ বাঙ্গালী যুবক। তাহার নিকট কে, মুখার্জ্জির পরিচয় লইলেন। মেমটা তাহার বিবাহিতা পত্নী, তাহাও পরিচয় পাইলেন। বাসস্থানের ঠিকানা জানিলেন—সমস্তই মিলিল। একবার কন্যার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কন্যার মুখ বিবর্ণ মৃতের মত। রমাপ্রসাদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব এখন কোথায়?" বাবুটি উত্তর করিলেন, 'লাইব্রেরীতে আছেন।' রমাপ্রসাদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছুক হইলেন—বাবুটি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

প্রকাণ্ড হলঘর—পৃথক্ পৃথক্ টেবিল চেয়ারে এক একজন বসিয়া আছে, সকলেই এক একটা কাজে ব্যস্ত, নিতান্ত যাঁর কাজ নাই, তিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। টিফিনে ব্যারিষ্টারগণ সেইখানে উপবেশন করিয়া আইনসংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করেন।

বাবু, রমাপ্রসাদ ও তাঁহার কন্যাকে লইয়া গিয়া সাহেবকে দেখাইয়া দিল। সাহেব তখন খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; ললিতা দেখিবামাত্রই তাহার স্বামীকে চিনিতে পারিল। রমাপ্রসাদেরও জামতাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। পদশব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র একবার গৃহদ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রমাপ্রসাদ অগ্রসর হইতেছিলেন, ললিতা দৃঢ় হস্তে পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

ভগ্নহৃদয়ে কন্যাকে লইয়া রমাপ্রসাদ কলিকাতায় ফিরিলেন। কাহারও মুখে হাসি নাই, সকলেই বিষণ্ণ—হায়! চতুর্দ্দিকে সম্পদ্‌রাশি ছড়ান—তথাপি কাহারও শান্তি নাই। আজ রমাপ্রসাদের মনে হইল, পয়সায় কিছুই হয় না, আর একটা কিছু আছে—রমাপ্রসাদের তাহা অজ্ঞাত।

রমাপ্রসাদ, পত্নী থাকিতে অন্যকে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া আদালতে নালিশ

ক'ত্তে প্রস্তুত হইলেন। ললিতা তাহা শুনিয়া পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না বাবা, তা হবে না—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে। তাঁহাকে আর দশের সম্মুখে অপদস্থ করিবেন না—আমার সে আঘাত ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর হইবে।" রমাপ্রসাদ কন্যার অনুরোধে নিরস্ত হইলেন।

মালতীর বিবাহের বয়ঃক্রম হইয়াছে। রমাপ্রসাদ পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কন্যার মুখে ক্ষত—ভাল পাত্র জুটিল না। অর্থলোভে কেহ কেহ বিবাহে স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু রমাপ্রসাদ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। তিনি সেরূপ পাত্রে কন্যাদান করিতে নিতান্ত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহ হয় না; রমাপ্রসাদ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিবেচনার দোষে একটি কন্যার জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট করিয়াছেন —বুঝি আবার একটির সর্ব্বনাশ হয়।

উদ্‌ভ্রান্ত মর্ম্মাহত অনুতপ্ত স্বামীর মনোভাব বুঝিতে সাধ্বীর অধিক বিলম্ব হইল না। লক্ষ্মীদেবী একদিন স্বামীকে বলিলেন, "মালতীকে হিন্দুমতে বিবাহ দাও।" রমাপ্রসাদ হতাশভাবে পত্নীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সে পথ কি আর আছে? আমি স্বহস্তে নিজের পথে নিজে কাঁটা দিয়েছি।" লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "তোমার অর্থ আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, প্রায়শ্চিত্ত কর— নিশ্চয়ই সমাজে স্থান হইবে। তুমি নাম লেখাইয়া ব্রাহ্ম হও নাই—ব্রাহ্মমতে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলে মাত্র—কন্যাও আর স্বামিগৃহে যাইতেছে না—এরূপ অবস্থায় নিশ্চয়ই সমাজে উঠিতে পারিবে—তুমি চেষ্টা কর।" রমাপ্রসাদ বলিলেন, "তাহাতেই বা লাভ কি? কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, তাহাতে তাহার গণ্ডে ক্ষত। হিন্দু-সমাজে আর সৎপাত্রের আশা কই?" লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "যথেষ্ট আশা আছে, কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে অনেক বয়স্থা কন্যা অনূঢ়া অবস্থায় থাকে। আর মনে করিয়া দেখ, কত চিকিৎসা করিয়া কিছুই হইল না, মাতা সিংহ-বাহিনীর দাওয়ার মাটীতে মালতী আরোগ্যলাভ করিয়াছিল। ভক্তিভাবে নারায়ণ স্মরণ করিয়া তুমি কার্য্যে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই শুভ হইবে।"

ললিতাও মাতার পক্ষসমর্থন করিল। আঘাতে আঘাতে রমাপ্রসাদের মনও অনেকটা নরম হইয়া আসিয়াছিল। তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলেন, এবং যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দু হইলেন। যে রমাপ্রসাদ মাতৃশ্রাদ্ধে

মস্তক মুণ্ডন করেন নাই, তিনি স্বেচ্ছায় মুণ্ডিতমস্তকে, নগ্নপদে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ- দিগের স্বহস্তে পদপ্রক্ষালনের জল দিতে লাগিলেন। তাঁহার বিনয়ে সকলেই পরিতুষ্ট হইল। রমাপ্রসাদ জাতিতে উঠিলেন।

চতুর্দ্দিকে ঘটক লাগাইয়া দেওয়া হইল। অনেক স্থান হইতে মালতীর সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। সম্বন্ধনির্ব্বাচনের ভার রমাপ্রসাদ পত্নীর উপর দিলেন। লক্ষ্মীদেবী একটি বিপত্নীক যুবককে স্থির করিলেন। পাত্রটি ডেপুটী—বয়স ৩০।৩২ বৎসর। বিবাহের ২১ দিন পরেই তাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল; পাত্রটির নিকট আত্মীয়স্বজন কেহই নাই। একটি বয়স্থা পাত্রী খুঁজিতেছিল, এইখানেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। পাত্রটি কন্যা দেখিতে আসিলেন না, তিন দিনের ছুটী লইয়া বিবাহ করিতে আসিবেন স্থির হইল।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। যাত্রার সময় লক্ষ্মীদেবী কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা! পতিগৃহে যাইতেছ, পতি ভিন্ন সাধ্বীর গতি নাই, পতিই নারীর প্রত্যক্ষ দেবতা—নারায়ণ জ্ঞানে সর্ব্বদা কায়মনে পতিসেবা করিও। আর একটি কথা আমার স্মরণ রাখিও, পুত্রবতী না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ তোমার স্বামীর সম্মুখে বা তোমার স্বামীর কোন আত্মীয়ের সম্মুখে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিও না। তোমার এই গণ্ডের ক্ষত যেন কোন ছলে কেহ দেখিতে না পান।" বিবাহের পরই পিতামাতা-ভগ্নীর অশ্রুজলের মধ্যে মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত তাহার সুদূর কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল।

অমরনাথ অতি সচ্চরিত্র সরলপ্রকৃতির লোক—পত্নী মালতী সর্ব্বদা ঘোমটা দিয়া থাকে—তিনি প্রথম প্রথম মনে করিলেন, মালতীর বোধ হয় একটু লজ্জা বেশী। বিশেষ কোন পীড়াপীড়ি করিতেন না। রাত্রে মালতী আলো নিভাইয়া দিয়া তবে সে ঘরে শুইতে আসিত। দিনের বেলা যথাসম্ভব সরিয়া থাকিত; কিন্তু স্বামীর সেবা অনলসভাবে কায়মনে করিত—পত্নীর ব্যবহারে অমরনাথ বড়ই সুখী হইলেন। এইরূপে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

এখনও মালতী ঘোমটা খোলে না—অমরনাথ দু'একবার বলিয়াছিল, মালতী, 'আমার বড় লজ্জা করে' বলিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘোমটার ব্যবধান থাকিলেও উভয়ের আভ্যন্তরিক প্রীতির কোন অভাব ছিল না। নয়টার সময় আহার করিয়া অমরনাথ আফিসে যাইতেন, আসিতে

সেই সন্ধ্যা ৭টা হইত। বাড়ীতে একটা রাঁধুনী ও ঝি ছিল, তাহারাও সেই দেশবাসী। মালতী রাঁধুনীকে রান্না করিতে দিত না—সে নিজেই রান্না করিত। স্বামী বাড়ী আসিলেই হাত মুখ ধুইবার জল, এমন কি, নিজের হাতে তামাক সাজিয়া দিত। সর্ব্বদা স্বামীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিত। অমরনাথও পত্নীর ব্যবহারে নিতান্ত তাহার অনুগত হইয়া পড়িল।

এইরূপে বিদেশেও তাহাদের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতেছিল। কিন্তু মালতী নিয়তই মনে একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিত। সর্ব্বদাই তাহার মনে হইত, সে তাহার সরল স্বামীকে প্রবঞ্চনা করিতেছে। কখন কখন মনে হইত, স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলে, 'ওগো, আমার গণ্ডে ক্ষত, আমি ঘোমটা দিয়া তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আসিতেছি, এ অপরাধের যে দণ্ড হয়, তুমি দাও, আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।' পরক্ষণেই মাতার আদেশ মনে পড়িত; একটি সন্তান সে কায়মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। 'প্রভু! একটি সন্তান দাও—স্ত্রীপুরুষের এ ব্যবধান ঘুচিয়া যাক্। এ প্রবঞ্চনা, এ ছলনা লইয়া আর আবরণের মধ্যে থাকিতে পারি না।'

এ দিকে ললিতা দিন দিনই শীর্ণা হইয়া পড়িতে লাগিল। আহারে রুচি নাই—অল্প অল্প জর হয়। রাত্রে ঘর্ম্মে বিছানা ভিজিয়া যায়। এ কথা কিন্তু সে পিতামাতা কাহাকেও বলে না। কিন্তু মায়ের চক্ষে ধুলা দেওয়া শক্ত। লক্ষ্মীদেবী কন্যার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া ভাল চিকিৎসক আনাইয়া দেখাইতে বলিলেন।

চিকিৎসক আসিলেন। অনেক পরীক্ষার পর স্থির হইল, ললিতা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। জীবনের আশা অতি অল্প। ললিতা তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইল না—এখন মুক্তিই তাহার প্রার্থনীয়। নিরাশকাতর প্রাণপাখী তাহার দেহপিঞ্জর হইতে পলাইবার জন্য সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

কন্যাকে লইয়া রমা প্রসাদ সস্ত্রীক বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে গেলেন। কিন্তু মনোভঙ্গই স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ—ললিতার স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তন হইল না। শীতের প্রারম্ভে অভাগিনী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল। ভগ্নহৃদয়ে পিতামাতা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সংবাদ মালতী পাইয়া পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত

হইয়া পড়িল। সে স্বামীর অনুমতি লইয়া পিত্রালয়ে গেল। মালতীর মুখ চাহিয়া পিতামাতা দারুণ শোক সংবরণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই মালতী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল। শিশুর অপরূপ রূপ। রমাপ্রসাদ জামাতাকে শুভসংবাদ প্রেরণ করিলেন। অমরনাথ অনেক চেষ্টা করিয়াও ছুটী পাইলেন না; বাধ্য হইয়া দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগ সংবরণ করিয়া রহিলেন।

শিশু সাতমাসের হইয়াছে—অমরনাথ অনেক কষ্টে ছুটী লইয়া সন্তান দেখিতে আসিয়াছেন। মালতীর আজ কত আনন্দ। সে খোকাকে কোলে করিয়া স্বামীকে আসিয়া প্রণাম করিল। শিশু মাতার ঘোমটা ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, মালতী আজ বাধা দিল না—খোকা একটা মজার খেলা পাইল—সে টানিতে টানিতে মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া, সম্মুখের নব উত্থিত শুভ্র দন্ত বাহির করিয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। মালতীও খোকার দুষ্টুমিতে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—হাসিয়া ফেলিল। অমরনাথ সাদরে পত্নীর হাত ধরিয়া তুলিলেন। অমরনাথ স্ত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বিস্মিতনেত্রে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি মালতীর ঘোমটা-খোলা মুখ কখন দেখেন নাই। উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে বলিলেন, "এ ক্ষত তোমার কবে হইল? আমাকে তো এ সংবাদ দাও নাই।" মালতী স্থিরভাবে বলিল, "ক্ষত আমার বাল্যকালের—আমি তোমাকে এতদিন প্রবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি—এই ছলনা করিয়া আমি নিয়ত অন্তর্দ্দাহে জ্বলিতেছি। তুমি আমাকে শাস্তি দাও—আমার শান্তি আসুক। আর আবরণে আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে পারি না।" মালতীর দুই চক্ষু দিয়া মন্দাকিনীধারার মত অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অমরনাথ সস্নেহে মালতীর অশ্রুবারি মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ প্রায়শ্চিত্ত তুমি বহুদিন করিয়াছ—বাহ্যিকবস্তু আবরণে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, কিন্তু অন্তরের পবিত্র প্রেম—অবহেলে আমায় দান করিয়াছ—যাহা অবিনশ্বর, তুমি আমাকে তাহাই দিয়াছ—অসার নশ্বর বস্তুতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ মাত্র। যাহা ঘোমটায় তুমি ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে—তাহা সে সময় আমার না দেখাই ভাল ছিল। যেখানে ঘৃণা ও অপ্রীতি স্থান পায়, সেখানে প্রেম আসে না। এই

ঘোমটায় তোমার আমার উত্তরের উপকার হইয়াছে।” অমরনাথ সস্নেহে পরম প্রীতিভরে মালতীর কুঞ্চিত গণ্ডে চুম্বন করিলেন। মালতী পরম আগ্রহে সন্তানকে চুম্বন করিয়া স্বামীর ক্রোড়ে দিল। উৎফুল্ল শিশু আবার হাসিয়া উঠিল। আজ শিশুর দুইখানি সুকোমল পবিত্র কর পতি ও পত্নীর ভিতরের বাহিরের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

কে তুমি আমার?

কে তুমি আমার হও নিতি নিতি তাই,
সুধাই অন্তরযামী অন্তরে তোমায়।
কেন এ মমতা প্রীতি নীরবে বিলাই,
টানিছ আপন পানে দিতে আপনায়।
মধুর সম্বন্ধ হেন কবে সে কোথায়,
হয়েছিল তব সনে স্মরণে না পাই।
কোন্ দূরাতীতকালে তোমায় আমায়,
হৃদয়ে হৃদয় প্রাণে পরাণ মিশাই,
আজিকে নিদ্রার ঘোরে কেন হেন দূরে,
দেখি তোমা—সেই জন চির পরিচিত,
যেন তুমি লুকাইয়া কোন গুপ্তপুরে,
অব্যক্ত ধ্বনিতে শুধু কর জাগরিত।
ভাঙ্গ ঘুম, উঠ জাগি অন্তরে আবার,
আত্মসাৎ করি লও আমিত্ব আমার।

শ্রী * *

দিল্লী।

মুসলমান রাজত্ব।

(পাঠান শাসনকাল—সৈয়দবংশ)

খিজির খাঁ সৈয়দবংশোদ্ভব ছিলেন, মহম্মদ হইতেই সৈয়দগণের উৎপত্তি। খিজির খাঁর পিতা মুলতানের শাসনকর্ত্তা থাকায় তিনিও পরে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। খিজির খাঁ তৈমুরের বশ্যতা স্বীকার করায়, তিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। এক্ষণে খিজির খাঁ তৈমুরের নামে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার নামে মুদ্রাদি মুদ্রিত করার আদেশ দেন। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী শারুখ্ মির্জার নামেও কিছুদিন মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দিল্লীর নিকটস্থ সামান্য কতকগুলি গ্রাম ব্যতীত সে সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্যের আর কোন অস্তিত্ব ছিল না, এক্ষণে সাম্রাজ্যবিস্তৃতির জন্য খিজির খাঁ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মল্লিক তোফা তাঁহার উজীর নিযুক্ত হন। তোফা খত্তরের নরসিংহ রায়কে পরাজিত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইতে বাধ্য করেন। বদৌনের শাসনকর্ত্তা দিল্লীর অধীন হইতে স্বীকৃত হন, চন্দাবরের রাজপুতদিগকেও দমন করা হয়, তুর্কীরা সরহিন্দ প্রদেশে উপদ্রব আরম্ভ করে, তাহাদের দমনের জন্য সেনাপতিগণ ধাবিত হন।

গুজরাটের স্বাধীন অধিপতি দিল্লী রাজ্য আক্রমণ করায়, খিজির খাঁ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দেন। খত্তরের রাজা ও বদৌনের শাসনকর্ত্তা আবার স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করিলে, খিজির খাঁ স্বয়ং তাঁহাদের দমনে গমন করেন। সেই সময়ে দিল্লীতে তাঁহার প্রাণনাশের জন্য ষড়্যন্ত্রের আয়োজন হয়। খিজির খাঁ দিল্লীতে আসিয়া ষড়্যন্ত্রকারীদিগকে নিহত করার ব্যবস্থা করেন।

জনৈক বিদ্রোহী আপনাকে মৃত সারঙ্গ খাঁ বলিয়া পরিচয় দিয়া দিল্লী রাজ্য-মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত করে। অনেক কষ্টে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর খিজির খাঁ মেবাত অধিকার করেন।

দিল্লী রাজ্যের অধীন রাজা ও শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া খিজির খাঁ রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ক্রমাগত রাজ্যরক্ষার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া খিজির খাঁ অবশেষে পীড়িত হইয়া পড়েন ও তাহাতেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। তাঁহার পুত্র সৈয়দ মবারক মসনদে উপবিষ্ট হন।

মবারককেও পিতার ন্যায় বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যশরৎ গোক্কুর পাঞ্জাবে মহাবিদ্রোহ উপস্থিত করে, তাহার সহিত অন্যান্য বিদ্রোহীরাও মিলিত হয়। উজীর ও অন্যান্য সর্দ্দারের সহিত মবারক তাহাদের দমনের জন্য দিল্লী হইতে যাত্রা করেন, ও পঞ্জাব প্রদেশে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। জামুর রাজা রায় ভীম দিল্লীশ্বরের সাহায্য করায় যশরৎ পলায়ন করে। মবারক দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলে যশরৎ আবার লাহোর আক্রমণ করে, রায় ভীমের সহিতও তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। উজীর ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা যশরৎকে দমন করিতে ধাবিত হন, রায় ভীম তাঁহাদিগকে সাহায্য করায় অনেক গোক্কুর ধৃত হইয়া নিহত হয়।

উজীর মল্লিক সেকেন্দার তোফা লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। বিদ্রোহী হিন্দুরাজগণের দমনেরও ব্যবস্থা হয়, উজীর খত্তরের রাজাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। বদৌনের শাসনকর্ত্তা মহাবৎ খাঁ রাঠোর রাজপূতদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। মবারক স্বয়ং এটোয়ার রাজাকে পরাজিত করেন।

যশরৎ আবার উপদ্রব আরম্ভ করে। এবার সে রায় ভীমকে নিহত করিয়া ফেলে, এবং আমীর শেখ আলি নামে কাবুলের মোগল সর্দ্দারের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহাকে সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করে, নিজে লাহোর আক্রমণে ধাবিত হয়, উজীর তাহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। মুলতানেও গোলযোগ উপস্থিত হয়, মবারক তথায় সৈন্য পাঠাইয়া দেন। মালবের অধি-পতি গোয়ালিয়র অবরোধ করায়, মবারক নিজে তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন, তাহার পর বিদ্রোহী সামন্তরাজাদিগকে দমন করার জন্য মবারককে চেষ্টা করিতে হয়। মেবাতীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠায় তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি ধাবিত হন, বায়নার শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তিনি মেবাতে পলাইয়া যান, অবশেষে জৌনপুরের

ইব্রাহিম শা শুরকির সহিত মিলিত হন। মবারক উজীর ও অন্যান্য সর্দ্দারের সহিত তাঁহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন, আবার যশরৎ গোক্কুর উপদ্রব আরম্ভ করে, উজীর প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে ধাবিত হন। মবারক মেবাতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত প্রদেশ বশীভূত করেন।

এই সময়ে পুলাদ নামে এক তুর্কী ক্রীতদাস বিদ্রোহ উপস্থিত করে, দিল্লী-রাজ্যের কোন কোন সর্দ্দার তাহার সহিত যোগ দেয়। কাবুলের মোগল সর্দ্দার আমীর সেখ আলি পুলাদের সাহায্যের জন্য আগমন করেন, গোক্কুরেরা তাহার সহিত মিলিত হয়, পাঞ্জাব প্রদেশে ইহারা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে, মোগলদিগের হস্তে প্রায় চল্লিশ সহস্র হিন্দু নিহত হয়, বহুসংখ্যক বন্দীও হইয়াছিল, আমীর সেখ আলি অবশেষে দিল্লীসৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে বাধ্য হন।

যশরৎ, আমীর সেখ আলি ও পুলাদ আবার উপদ্রব আরম্ভ করে, মবারক তাহাদের দমনের জন্য ক্রমাগত ধাবিত হন। এই সময়ে তিনি উজীরকে লাহোরের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করায়, উজীর কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান বিদ্রোহীকে হস্তগত করিয়া মবারকের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করেন। মবারক যমুনাতীরে মবারকাবাদ নামে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নবনির্ম্মিত মসজীদে উপাসনার সময় ঐ সমস্ত বিদ্রোহীরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করে।

সর্ব্বর উলমুল্ক উজীর মবারকের পুত্র মহম্মদকে সিংহাসনে বসান, মবারকের হত্যাকারীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সরহিন্দ প্রভৃতি প্রদেশে বিদ্রোহীরা ঘোরতর উপদ্রব আরম্ভ করে। সহকারী উজীর কালী খাঁ তাহাদের দমনে গমন করিয়া তাহাদেরই সহিত যোগ দেন। পরে সকলে দিল্লীতে আসিয়া উজীরকে হত্যা করেন। কালী খাঁই উজীর হন। মবারকের হত্যাকারিগণের দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। যশরৎ গোক্কুরও উপদ্রব আরম্ভ করে, মুলতানে মোগলদিগের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সরহিন্দের বিলোল খাঁ লোদী স্বাধীনতা অবলম্বন করেন ও লাহোর অধিকার করিয়া বসেন। জোনপুরের অধিপতি দিল্লী রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। মালবের অধিপতি দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হইলে বিলোল খাঁ লোদীকে বাদশাহ সাহায্যের

জন্য আহ্বান করেন, মালবপতি স্বস্থানাভিমুখে যাইতে বাধ্য হন। বিলোল খাঁর সহিত বাদশাহের মনোমালিন্য ঘটায়, তিনি দিল্লী অবরোধ করেন। তাহার পর মহম্মদ পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহম্মদের পর তাঁহার পুত্র সৈয়দ আলাউদ্দীন সিংহাসনে অরোহণ করেন। সেই সময়ে দিল্লী রাজ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালব, জৌনপুর, বাঙ্গালা, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানও তাহার অধীনতা অস্বীকার করে। উজীর হিসাম খাঁর সহিত আলাউদ্দীনের মনোমালিন্য ঘটায়,উজীর বিলোল খাঁ লোদীকে দিল্লীর সিংহাসন লইবার জন্য আহ্বান করেন। বিলোল অবশেষে দিল্লী অধিকার করিয়া লন। আলাউদ্দীন বদোনে অবস্থিতি করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাইয়া দেন।

সাধুভাষা ও বাঙ্গলা ভাষা।

বাঙ্গলা ভাষা সংস্কারের একটি প্রস্তাব চলিতেছে। সংস্কারকের মধ্যে একজন বলিতেছেন যে, "প্রচলিত পদ্ধতির দলীয় লোক গণনায় অসংখ্য, এবং তাদের তুলনায় নূতন মতের পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা নগণ্য বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।" উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত মিষ্টার পি, চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ অবলম্বন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় "ভাষার কথা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আষাঢ় মাসের 'নারায়ণ' পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ চৌধুরী তাঁহার আষাঢ় মাসের "সবুজ পত্রে" উহার একটি সমালোচনা ছাপাইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের মতে যতীন্দ্রবাবু "সাধু ভাষার পক্ষে এবং বাঙ্গলা ভাষার বিপক্ষে।" ইহাতে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে, চৌধুরী মহাশয়ের মতে "সাধুভাষা" ও "বাঙ্গলা ভাষা" দুইটা পৃথক্ ভাষা? তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "গত দু'তিনশ' বৎসরের মধ্যে মুখের ভাষায় গঠনের যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমি লেখায় তা গ্রাহ্য করতে বলি।"

সিংহ মহাশয় বলেন যে, যতদিন প্রত্যেক জেলায় "মুখের ভাষা" পৃথক্ আছে,

ততদিন চলিত ভাষাটা রাখিয়া দাও। নতুবা তোমার লেখা সকলে বুঝিবে না। চট্টগ্রামে তোমার চাকরকে যদি "চিংড়ী মাছ","পার্শে মাছ" কিংবা "টেঙ্গ্‌রা মাছ" কিনিয়া আনিতে বল, তাহা হইলে সে ঐ মাছগুলি কিনিয়া আনিতে পারিবে না। তাহাকে বলিতে হইবে—"ইচা মাছ" "বাটা মাছ" ও "গুল্‌দে মাছ"। কোন চট্টগ্রামবাসী যদি কথিত ভাষায় মাছের নাম ঐরূপ করিয়া লেখে কিংবা "বাতাবী নেবুর" পরিবর্ত্তে "কম্‌ল" লেখে, তাহা হইলে তোমরা কি উহার অর্থ বুঝিতে পারিবে? এ কথাগুলি এ স্থানে ঠিক উপযুক্ত না হইলেও একটা সাংসারিক অসুবিধার (Practical difficulty) উদাহরণ।

ভাষা এমন হওয়া উচিত যে, বাঙ্গলার দক্ষিণরাঢ়, উত্তররাঢ়, মধ্যবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের কাহারও পক্ষে তাহা বুঝিতে কষ্ট না হয়। কথার ভাষা ও চলিত ভাষার নমুনা চৌধুরী মহাশয়ের এই প্রবন্ধ হইতেই দিব। তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম ৭ লাইন নিখুঁত চলিত বা সাধু ভাষা। অষ্টম লাইনের প্রথমে কথিত ভাষার নমুনা দিলেন,—"প্রচার করতে চান, তাঁদের কথা" ইত্যাদি। এখানে "করিতে" ও "তাঁহাদের" লিখিলেন না বটে, কিন্তু আর সমুদয় সাধু ভাষায় লিখিয়াছেন। তার পর "সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে মতভেদ যে আছে, সমাজের নিকট তাই প্রতিপন্ন করাই কঠিন।" এই লাইনে "তাই" কথা ব্যতীত আর সমুদয় সাধুভাষা। প্রথম পৃষ্ঠার শেষ লাইনে আর দুইটি কথা আছে, "আমাদের প্রমাণ দর্শাতে বলেন।" এখানেও "আমাদিগকে দর্শাইতে" লেখেন নাই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "করিবার" না লিখিয়া "করবার", "করিব" না লিখিয়া "করব", "বলি নাই" না লিখিয়া "বলিনি" লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, কথিত ভাষা ঠিক উচ্চারণের মত লিখিতে হইলে "করবার" না লিখিয়া "কোর্‌বার" ও "কর্‌বের" পরিবর্ত্তে "কোর্‌বে" লেখা উচিত ছিল। চৌধুরী মহাশয় "সকলকে লেখায় মৌখিক ভাষার অনুসরণ করতে" বলেন। এই "করতে" স্থানে তাঁহার "কর্ত্তে" লিখিলে "কোল্‌কাতার" মৌখিক ভাষা হইত। আর উদাহরণ দিব না। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। তিনি আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবন্ধ চলিত ভাষায়—সাধু ভাষা বলিতে ইচ্ছা হয় বল—লিখিয়াছেন। কেবল মাঝে "করবার," "করবে," "করলে" "পড়বে" এইরূপ দু'চারটি কথা বসাইয়াছেন। কিন্তু "ভাষা রচনা কর্‌তে"

হবে, "অঙ্গীকার কর্‌তে হবে, রক্তহীন হয়ে পড়্‌বে" ইত্যাদি স্থানে তাঁহারও অভ্যাস বশতঃ "র্" ও "ড়্" ইত্যাদিতে হসন্ত দিতে হইয়াছে।

সোমপ্রকাশের ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কোন কোন ভাষাকে "মড়াদাহ" "শব পোড়ার" ভাষা বলিতেন। চলিত বা সাধু ভাষার মধ্যে একটি একটি শব্দ মিশাইয়া সেইরূপ ভাষার প্রসার না করিয়া যদি "কথার ভাষায়" ২।৪ টি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া কেহ কেহ নমুনা দিতেন, তাহা হইলে না হয় আমাদের ন্যায় হীনশক্তিসম্পন্ন লেখকেরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতে পারিত। চৌধুরী মহাশয় একটু পরিশ্রম করিয়া নমুনা কিছু দিবেন কি ?

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

পৃথ্বীরাজ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়ভিক্ষা।

নগরের নিকট বনমধ্যে একটি সুন্দরী যুবতী বীণা বাজাইতেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে স্বরালাপ করিতেছিল। নিকটে একটি যুবক বসিয়াছিলেন। যুবকের আকার ও পরিচ্ছদে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া বোধ হইতেছিল। যুবতীর পেশোয়াজ নর্ত্তকীর ন্যায়, কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে হিন্দু বলিয়াই মনে হয়। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পাখিগণের কলরবের সহিত যুবতীর স্বরালাপ মিশিয়া এক মধুর ঐকতান অরণ্যবক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সহসা বীণাটি ফেলিয়া দিয়া যুবতী কহিল—"এ সব আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

যুবক—"এ অবস্থাতেও তুমি কত মধুর!"

যুবতী—"ও কথা ছাড়, এখন উপায় কি বল?"

যুবক—"উপায় আর কি, আশ্রয়ভিক্ষা।

যুবতী—"তাহাত জানি, কিন্তু ঘটিতেছে কৈ ?"

যুবক—"ঘটিবে বৈ কি, খোদা কি একেবারেই নারাজ হইবেন ?"

যুবতী—"তুমি মুসল্‌মান, পৃথ্বীরাজ কি তোমাকে আশ্রয় ভিক্ষা দিবেন ?"

যুবক—"শুনিয়াছি, হিন্দুরা আশ্রিতের জাতিধর্ম্ম বিচার করে না, আর রাজা ত সকলেরই আশ্রয়দাতা।"

যুবতী—"হিন্দুর ইহাই ধর্ম্ম বটে, তবে আমি ও সব ভুলিয়া গিয়াছি, এখন কেবল মনে করিতেছি, মুসল্‌মান ব'লিয়া রাজা যদি তোমাকে আশ্রয় না দেন।"

যুবক—"পৃথ্বীরাজের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই।"

যুবতী—কিন্তু তাঁহার সহিত দেখা হইতেছে কৈ ? প্রথমে সম্ভরে আসিলাম, সেখানে দেখা হইল না, ছুটিয়া আবার এখানে আসিলাম, এখানেই বা কি হইবে, কেমন করিয়া বলিব ?"

যুবক—"না, এখানেই দেখা হইবে, আমরা সম্ভরে যাইবার আগে তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন।"

যুবতী—"তবে বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করার ব্যবস্থা কর।"

যুবক—"কাল প্রাতেই তাহা করিব।"

যুবতী—"সকালে উঠিয়াই কি যাইবে ?"

যুবক—"আগে লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিব, পরে নিজে যাইব।"

যুবতী—"লোক পাঠাইবে কেন ? তাঁহার ভাব বুঝিতে ?"

যুবক—"তাহাও বটে, আর আগে খবর দেওয়াই দস্তুর।"

যুবতী—"তোমাদের কায়দা তোমরাই ভাল জান। আমার মনে হয়, যত শীঘ্র পারি—তাঁহার কাছে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা লই।"

যুবক—"তাহাই হইবে, সে জন্য কিছুই ভাবিও না।"

যুবতী—"শাহাবুদ্দীনের কথাটা কি পৃথ্বীরাজ একবারও ভাবিয়া দেখিবেন না ?"

যুবক,—"আমরা আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলে তিনি সে দিকে লক্ষ্যই করিবেন না।"

যুবতী—"তবে তাহাই হউক, এক্ষণে চল, ডেরায় গিয়া কোনরূপে রাত্রিটা কাটাইয়া দিই।"

যুবক—"নিজেদের কোনরূপে কাটিবে। ছেলেমেয়েদের জন্যই ভাবনা। চল, গিয়া দেখি, তাহারা কি করিতেছে।"

এই বলিয়া যুবক যুবতী সেখান হইতে উঠিয়া শিবিরের দিকে চলিলেন। আমরা এই অবকাশে ইহাঁদের একটু পরিচয় দিয়া লই। যুবক যুবতীর মধ্যে যুবকটির নাম মীর হসেন। হসেন গজনীপতি শাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর পিতৃব্যপুত্র। যুবতীটির নাম চিত্ররেখা। চিত্ররেখার জন্মভূমি সিন্ধুদেশে। তথাকার রাজা শাহাবুদ্দীনের কৃপাপাত্র হওয়ার ইচ্ছায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ ও চিত্ররেখাকে উপহার প্রদান করেন। চিত্ররেখা তাঁহার দরবারের নর্ত্তকী ছিল। রাজা পরে আরব খাঁ নামে অভিহিত হইয়া উঠেন। আরব খাঁর দরবার হইতে গজনী দরবারে আসিয়া চিত্ররেখা শাহাবুদ্দীনকে মোহিত করিয়া ফেলে। কিন্তু মীর হসেনের সহিত তাহার প্রণয় ঘটে। শাহাবুদ্দীন তাহা জানিতে পারিয়া মীর হসেনকে গজনী পরিত্যাগ করিতে বলায়, তিনি সপরিবারে তথা হইতে চলিয়া আসেন। চিত্ররেখাও তাঁহাদের সঙ্গ লয়। হসেন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, ও পৃথ্বীরাজের আশ্রয়ভিক্ষার ইচ্ছা করেন, চিত্ররেখার সহিত তিনি তাহারই আলাপ করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়দান।

পৃথ্বীরাজ শীকারের জন্য এখানে আসিয়াছেন, প্রাতঃকালে তিনি শীকারে বাহির হইলে, মীর হসেনের দূত সুন্দরদাস তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে শাহাবুদ্দীন, মীর হসেন ও চিত্র-রেখার সমস্ত ঘটনা বলিয়া হসেনের আশ্রয়ভিক্ষার কথা জানাইল। তখন পৃথ্বীরাজ সামন্তদিগকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। মন্ত্রী কৈমাস, চাঁদ পুণ্ডীর, পর্জ্জনরায়, গোবিন্দরায় প্রভৃতি তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন।

কৈমাস—"মহারাজত ম্লেচ্ছের সম্বন্ধ রাখেন না। তাহা হইলে কি হইবে?"

পৃথ্বীরাজ—"কিন্তু হসেন আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে।"

চাঁদপুণ্ডীর—"শরণাগত সম্বন্ধে বিবেচনার বিষয় বটে।"

পর্জ্জনরায়—"হসেনকে আশ্রয় দিলে শাহাবুদ্দীনের সহিতত বিবাদ বাধিবে।"

পৃথ্বীরাজ—"পৃথ্বীরাজ সে ভয় রাখে না।"

গোবিন্দরায়—"এক দিকে ম্লেচ্ছ, আর এক দিকে আশ্রিত, চিন্তার কথা সন্দেহ নাই।"

কবিচন্দ্র এই সমস্ত তর্কবিতর্ক শুনিতেছিলেন, তিনি থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আশ্রিতকে আশ্রয়দানই সনাতন ধর্ম্ম, মৎস্যরূপী ভগবান্ আশ্রয়াকাঙ্ক্ষিণী বসুমতীকে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।"

পৃথ্বীরাজ—"হসেন ম্লেচ্ছ না হইলে কোন কথাই ছিল না।"

কবিচন্দ্র—"যাহা হজম করা না যায়, তাহাকে অন্ততঃ গলায়ও রাখিতে হয়। ভগবান্ শিব গলায় বিষধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া আছেন।"

পৃথ্বীরাজ—"আমারও অভিপ্রায়, আশ্রিত যেই হউক না কেন, তাহাকে আশ্রয়দান করিতেই হইবে।"

কবিচন্দ্র—"ইহাই রাজধর্ম্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম।"

তখন আবার সুন্দরদাসকে মীর হসেনের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। সুন্দরদাস সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল। হসেনের অবস্থা ও পৃথ্বীরাজের নিকট তাহার আশ্রয়ভিক্ষার কথা শুনিয়া কবিচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন,—"পুরাণ, ইতিহাসে শরণাগতের আশ্রয়দানের যে কত দৃষ্টান্ত আছে, তাহা অবশ্য যুবরাজের অবিদিত নাই। কৌরবসভায়—দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ও লোকশিক্ষা দেখাইয়াছিলেন। রাজধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্যই আশ্রিতকে আশ্রয়দান। এই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিলে আপনার পিতামাতা ধন্য হইয়া উঠিবেন।"

কবিচন্দ্রের কথা শুনিয়া কাহারও আর কোনরূপ আপত্তি হইল না, পৃথ্বীরাজ পূর্ব্ব হইতেই মীর হসেনকে আশ্রয়দানের ইচ্ছা করিতেছিলেন, এক্ষণে

প্রসন্নচিত্তে তাহাই জানাইলেন। আশ্বস্ত হইয়া সুন্দরদাস মীর হসেনের নিকট গেল, ও তাঁহাকে লইয়া আসিল। পৃথ্বীরাজ তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন। হসেনও পৃথ্বীরাজকে অশ্ব, হস্তী, হীরাজহরতাদি উপঢৌকন দিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল।

নাগরে উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজ নিজ মুন্সী ধর্ম্মায়ণ কায়স্থকে দরবারের দক্ষিণ দিকে হসেনের আসন নির্দ্দেশ করার আদেশ দেন। পরে হংসী, হিসার প্রভৃতি জায়গীর দিবার ব্যবস্থা হয়। পৃথ্বীরাজের অন্যান্য সামন্তের ন্যায় মীর হসেনও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শীকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ কোতয়ালের আশ্রয়ে রহিল। মীর হসেন পৃথ্বীরাজের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন, পৃথ্বীরাজও তাঁহার বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে এই সংবাদ শাহাবুদ্দীনের নিকট পৌঁছিল, তখন চারিদিকে চর সকল ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

চণ্ডিদাস।

১

বন্দি পদে চণ্ডিদাস! সুকবি প্রেমিক,
কোন্ শতাব্দীতে জন্মি নান্নুর পল্লীতে,
ক'রে গেছ গরীয়সী বঙ্গ স্বর্গাধিক।
মুখরিত বঙ্গ চির তোমার সঙ্গীতে!

২

প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে বসি ভাবাবেশে,
কি সুরে বাঁধিয়া বীণা,—গেয়েছিলে কবে—
কৃষ্ণপ্রেমগীতিলীলা গলি প্রেমরসে,
আজও তাহা উচ্ছ্বসিত সুকণ্ঠে সুরবে!

৩

নিশীথে নিকুঞ্জবনে বিরহবিধুরা ;—
শুনায়েছ শ্রীমতীর বিরহসঙ্গীত !
"আমি সুখের লাগিয়া" বালা অচতুরা—
অকপটে কেঁদে বলে সখীর সহিত !

৪

কি যে সে মরমস্পর্শী সঙ্গীতঝঙ্কার,
বিরহবেদনাময় দীর্ঘশ্বাসে ভরা !
ললিত রাগিণী ছন্দঃ—নির্ঝর সুধার,
প্রেমাশে হতাশ বালা তবুও বিভোরা !

৫

তুমি হে প্রেমের কবি প্রেম উপাসক !
সেধেছ একান্তে, হয়ে অনন্যকামনা,
তোমার সঙ্গীত শুধু প্রণয়মূলক,
প্রেমভরা জীবনের অতুল সাধনা।

৬

তন্ময়তা লভি প্রেমে তুমি জাতিভেদ
করেছিলে উপাসনা রজকবালার
নায়িকার সনে হয়ে একাত্মা অভেদ
সুমধুর কৃষ্ণলীলা করেছ প্রচার !

৭

মূর্খ এ সমাজ করে কুখ্যাতি তোমার,
না বুঝিয়া তব উচ্চ প্রেমের মহিমা !
রজকী আসক্ত বলি ব্রাহ্মণকুমার,
ম্লান করে প্রেমময়ী কবিত্বগরিমা !

৮

যে দোষে দোষুক তোমা,—আমার হৃদয়ে
প্রবাহিত রবে চির তব গীতোচ্ছ্বাস
করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে নিভৃত নিলয়ে
কহিব প্রেমের কবি দ্বিজ চণ্ডিদাস।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বাজারের মধ্যে আসিয়া দেখি, সঙ্গিদ্বয় আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদিগের সহিত পোষ্ট আফিসে গিয়া কয়েকখানা পোষ্টকার্ড কিনিয়া আনিলাম এবং একজন দোকানদারের কালিকলম চাহিয়া লইয়া কার্ড কয়খানি লিখিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলাম। কোথায় হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যখানে, যেখানে আসিতে গেলে প্রাণান্তের উপক্রম হয়, সেই অতি দূর, দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশেও ইংরেজরাজের এত সুবন্দোবস্ত! ডাক, টেলিগ্রাফ, ডাক্তারখানা, পুলিশ কিছুরই অভাব নাই। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, শীতও বেশী বোধ হইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পাণ্ডাজী আগুন করিয়া দিলেন, কয়েকখানা কম্বলও পাওয়া গেল। পাণ্ডাজী তৎপূর্ব্বেই নারায়ণের প্রসাদ আনিয়া রাখিয়াছিলেন। যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ ধারণ করিয়া কম্বল মুড়ী দিয়া একেবারে পতন। গঙ্গোত্তরী ও কেদারনাথ অপেক্ষা এখানে শীত কম। তবুও ঘরে আগুন রাখিতে হইয়াছিল। পাণ্ডাপ্রদত্ত দুইখানা ও নিজের একখানা এই তিনখানা কম্বল মুড়ী দিয়া সেই দোতলা আগুনের ঘরে কোনরূপে বদরিকাশ্রমের রাত্রিপ্রভাত হইল। একবার রাত্রিতে আমাকে উঠিতে হইয়াছিল। বাহিরে কি ভয়ঙ্কর শীত। কুয়াসাতে সমগ্র পুরী একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মন্দির, পাণ্ডাদের বাড়ী, দোকান প্রভৃতি এক একটি সাদা স্তূপ

বলিয়া বোধ হইতেছে। আর ঠাণ্ডা, সমতল দেশের লোক তাহার কল্পনাও করিতে পারে না। যাহা হউক, কোনরূপে রাত্রিটা যাপন হইল। প্রাতে ৮টায় শয্যাত্যাগ করিলাম। কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন, ও বোধ হইতেছে, এই সবে যেন সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। আজই আমাদিগকে বদরিকাশ্রম হইতে বিদায় লইতে হইবে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া শ্রীনারায়ণ দর্শন করিতে মন্দিরে চলিলাম। সে দিন আর স্নান করা হইল না। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখি, ভিড় তেমন নাই; মাত্র কয়েকজন সাধু দর্শ-নার্থী। তাঁহাদের সঙ্গে আমার দর্শন করিবার বড়ই সুবিধা হইল। দেখিলাম, সেই সময়টা সাধুদিগের প্রতি পাণ্ডা ও দ্বাররক্ষকদের কথঞ্চিৎ সম্মান-প্রদর্শন। তাঁহাদের সহিত বিনা ক্লেশেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে পাই-লাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া ইচ্ছামত দর্শনপ্রণামাদি করতঃ অন্য দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলাম। সঙ্গিদ্বয় কিছুক্ষণ পরে দর্শন করিতে পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, সকলের দর্শনাদি হইয়া গেলে ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নামিয়া আসিলাম এবং বাজারের মধ্য দিয়া পাণ্ডার আবাসে আসিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এইবার আমাদের বিদায়ের পালা। যে বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন করিতে কত দিন থেকে আশা করিয়াছিলাম, বৃষ্টি, শীত প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখকষ্ট কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া এই সুকঠিন পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম পূর্ব্বক যাঁহার দর্শনলাভমানসে এই মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম অতি সুন্দর স্থানে সমাগত হইয়াছিলাম, সেই পুণ্যবানের আনন্দদায়ক এবং পাপীতাপীর একমাত্র গতিস্থল ত্রিলোকবাঞ্ছিত বদরিকাশ্রমপুরী আজ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমাগত আজ প্রায় একমাস ধরিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতেছি, সেই নীরস একঘেয়ে ভাবে চটীতে অর্দ্ধ-সিদ্ধ আহার, বিশ ইঞ্চি স্থান অধিকারের নিমিত্ত যাত্রীদিগের সহিত অযথা কোন্দল, সেই কঠিন চড়াই উৎরাই, রৌদ্র শীত প্রভৃতি নানা প্রকার দৈহিক অসুবিধার মধ্যে যখনই স্বর্গধাম বদরিকাশ্রমের কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছি, প্রাণ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। অপরূপ সৌন্দর্য্যের আধার নগশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের বিরাট্ কলেবরে কত নয়নরঞ্জন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ, স্বর্গের সুরভি-

মাথা পার্ব্বত্য কুসুমনিচয়ের সুবাসবাহী মৃদু মন্দ সমীরণসঞ্চারে বনবিটপি-রাজির অশ্রান্ত মর্ম্মরধ্বনি, নির্ঝরিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস, পতিতপাবনী ভাগীরথীর সুমধুর কলতান, সর্ব্বোপরি বদরীনারায়ণের অতুলনীয় মহিমাতে আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। দুর্ভাগ্য আমার, এমন শান্তিময় স্থানে আসিয়া অধিকদিন বাস করিতে পাইলাম না। মাত্র অহোরাত্র বাস করিয়াই আমাদিগকে বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

পাণ্ডার সহিত সঙ্গিদ্বয়ের দেনাপাওনা সম্বন্ধে গোলমাল মিটিয়া গেলে কিছু জলযোগ করিয়া বেলা প্রায় ১১ টার সময় শেষবার নারায়ণজীকে প্রণাম করতঃ পুরী হইতে ধীরে ধীরে বহির্গত হইলাম।

বদরিকাশ্রমপুরীতে মোটামুটি সব জিনিসই পাওয়া যায়। কিন্তু অতিশয় মহার্ঘ্য। কেরোসিন তৈল ১৲ টাকা সের। কাঠও তেমনি দুর্ম্মূল্য। সরিষার তৈলেরও এ অঞ্চলে বড় চলিত নাই। যাহা হউক, যাত্রীদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব হয় না। তার পর সরকারী ডাক্তারখানা, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ, শান্তিরক্ষক পুলিশ সমস্তই আছে। দোকানদারগণ সকলেই ভাললোক। অধিবাসীদিগের মধ্যে খারাপ লোক আমি কমই দেখিয়াছি। নানাদেশের লোক-জনের যাতায়াতে তাহাদের প্রকৃতি খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। শুনিলাম, পূর্ব্বে তাহারা নাকি চাবীতালার ব্যবহার জানিত না। দেবপ্রয়াগে রামসীতার মন্দিরে জনৈক সাধুবেশধারী বাঙ্গালী চোর বিগ্রহের গাত্রাভরণ চুরী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, অদৃষ্টক্রমে ধরা পড়িয়া টিহরীর রাজদরবারে তাহার জেল হইয়া যায়। সেই থেকে দেবপ্রয়াগবাসীদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, "তামাম্ পূরবিয়া আদমী চোট্টা হ্যায়।" কি দুঃখের বিষয়!! একজনের দুষ্কর্ম্মের ফলে "পূরবিয়া আদমী" মাত্রেই চোট্টা হইয়া গেল। যাহাদের দ্বারা এইরূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, বিশেষতঃ সাধুবেশধারী সেই নরাধমদিগের যে কি গতি হইবে, তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্ তাহাদিগকে রক্ষা করুন।

অনেক যাত্রীর সঙ্গে আমরা তিনজন বদরীনারায়ণ পুরী হইতে রওনা হইলাম। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, ধীরে ধীরে বদরীনারায়ণের মন্দির চক্ষের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। ক্রমে আমরা পরিচিত পথে চড়াই উৎরাই

করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে হনুমান্ চটীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করতঃ পুনরায় চলিতে লাগিলাম। লামবগড় চটী ও শেষ-ধারা পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা ঠিক সন্ধ্যাকালে পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলাম। যাইবার দিনে এথানে যেমন স্থানের অপ্রতুল ছিল, আজ তেমন নহে। একটা দোকানের দ্বিতলে তল্পীতল্পা রাখিয়া আমি নীচে একটা নির্জ্জনস্থানে আসিয়া বসিলাম। সম্মুখে একটি স্থূলধার নির্ঝর সশব্দে বহিয়া যাইতেছে। পরপারে সুবিশাল পর্ব্বতশ্রেণী ভগবানের করুণা মাথিয়া স্থিরশান্তভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পরমকল্যাণময়ের শ্রীচরণে আমিত আকুল প্রার্থনা জানাইলাম ;—

তব শান্তিশীতল করুণাসলিল
ঢাল এ তপ্ত পরাণে।
যত কলুষকালিমা ধুয়ে যাক্ প্রভু
কৃপাবারি বরিষণে॥
ক্ষুদ্র হৃদয় অক্ষম অতি সহিতে বিষম যাতনা,
তাহে দুর্জ্জয় রিপু ভীম গরজে করিছে সতত তাড়না,
আছি জীর্ণ বক্ষ পাতিয়া,
চিরসান্ত্বনা পাব বলিয়া,
তুমি মার্জ্জনা কর শত অপরাধ,
রাখ হে অভয় চরণে॥
মুগ্ধ করিয়া অশেষ মায়াতে ভীষণ মরুমাঝারে,
কেবা, অন্ধ করিয়া নয়নযুগল ফে'লে গেল মহা আঁধারে,
তুমি মঙ্গলদীপ লইয়া,
মোরে ল'য়ে চল হাত ধরিয়া,
প্রভু! উজ্জ্বল কর মলিন হৃদয়
বিমল পুণ্য কিরণে॥

পরমকরুণাময়ের অপার করুণাধারা সর্ব্বাঙ্গে মাথিয়া সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি দেবী এথানে চিরবিরাজিতা। জগতে সেই করুণারাশি বিতরণ করিতে অতুল রূপ ও প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী স্নেহময়ী প্রকৃতিরাণী পরম করুণাময়ী

জগদ্ধাত্রী আনন্দময়ী মা রূপে অবস্থান করিতেছেন। আহা! মায়ের আমার কত দয়া! দয়াময়ী অভয়া দশভুজে কত করুণা ঢালিয়া দিতেছেন। ভগবদ্‌গতপ্রাণ, আত্মধ্যানপরায়ণ পরমতপা মহর্ষিগণ ও আত্মজ্ঞানবিহীন কলুষিতহৃদয় মহাপাপিগণ—সকল সন্তানই তাঁহার সমান স্নেহের পাত্র। সর্ব্ব-ভূতে তাঁহার সম দয়া। আর ঐ যে পুণ্যসলিলা গঙ্গাযমুনাবিধৌত, স্বভাব-জাত বিবিধ নয়নরঞ্জন পত্রপুষ্পশোভিত ও ফলভারাবনত বৃক্ষলতাপরিপূর্ণ, নানাজাতীয় প্রিয়দর্শন বিহঙ্গকুলের হর্ষকাকলীভরা, জগন্মাতা আনন্দময়ীর লীলানিকেতন, গিরিরাজ হিমালয় কি এক অজ্ঞাত রহস্য বুকে করিয়া স্থির-শান্তভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, উঁহার বিরাট কলেবরে জীবন্মুক্ত মুনি-ঋষিগণের কত সুরম্য তপোবন, আরোগ্যদায়িনী সোমবল্লী প্রভৃতিতে পূর্ণ বনস্পতি, বনকুসুমসৌরভবাহী স্নিগ্ধ সমীরণহিল্লোলিত, নন্দনকানন সদৃশ নানাজাতীয় বৃক্ষাদিসমাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ উপত্যকা, আজন্মবর্দ্ধিত সরল অধি-বাসিগণের বাসভূমি অসংখ্য পার্ব্বত্যপল্লী, এই সমুদয় দর্শন করিলে প্রাণে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা বর্ণনাতীত। আবার হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্য, পাষাণভেদী, ভীষণ গর্জ্জনময়ী গিরিনির্ঝরিণীর উন্মত্ত নৃত্য, প্রচণ্ড-বলশালিনী, ঘোর আবর্ত্তময়ী, বিপুলসলিলা গিরিনদীর ভীমনাদে তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়া নিম্নে অবতরণ, দুরভিগম্য অগণিত গিরিসঙ্কট প্রভৃতি দেখিলে যুগপৎ ভয়ে, বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইতে হয়। প্রতি কান্তারে কান্তারে :তাঁহারই করুণাধারা নিয়ত বর্ষিত হইতেছে, পরমভাবময় গিরি-রাজের এই অতুলনীয় মহিমা আমি কি বুঝিব, অন্ধ আমি, মূর্খ আমি—কতটুকু তাহার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি?

আজ এই পাণ্ডুকেশ্বরে গিরিসানু প্রদেশে সায়ংকালে বসিয়া আমার কত কথা মনে হইতে লাগিল। এমন সুন্দর স্থান, এরূপ বিচিত্র ভাবের একত্র সমাবেশ, আর ত কোথাও দেখি নাই। যে যেখানে আছে, সকলকে ডাকিয়া এই মধুর ছবি দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে। চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—এস, কে কোথায় আছ জগতের নরনারী, এস সাধক, দেখ, মূর্ত্তি-মান্ হরপার্ব্বতী এই বিরাট্ কলেবর ধারণ করিয়া কত করুণা, কত শান্তি বিতরণ করিতেছেন। যদি শোকে তাপে তুমি দগ্ধপ্রাণ হও, ইহাই তোমার

মহৌষধি। আপনার প্রতি চাহিয়া দেখি, ভক্তি ভালবাসার নিতান্ত অভাব। জীবনের অনেক ঘটনাই মনে পড়িতে লাগিল। পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি-ভয়ে সে সমস্ত প্রকাশ করিতে বিরত থাকিলাম। আর কাহারই বা দুদণ্ড স্থির হইয়া আমার এই প্রলাপোক্তি শুনিবার অবসর আছে?

সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। ক্রমে অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ ছাইয়া ফেলিল। রাত্রি সমাগত দেখিয়া পক্ষিকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগমন করিতেছে। দিনের কোলাহল থামিয়া গেল, নিস্তব্ধ গম্ভীরভাবে সমস্ত মগ্ন হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া থাকিবার পর অন্ধকার হইয়াছে দেখিয়া ধীরে ধীরে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। সঙ্গিদ্বয় আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তার পর কোনরূপে খিচুড়ী নামাইয়া ভক্ষণ করিলাম এবং আহারান্তে কিছুক্ষণ নানা প্রসঙ্গ আলোচনার পর সুখে নিদ্রা দেওয়া গেল। আর যাহাই হউক, পাহাড়ে নিদ্রার অভাবটি ছিল না। যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে দেহটাকে লম্বা করিবামাত্রই নিদ্রাদেবী অকাতরে কৃপা করিয়াছেন। ঘরটি তেমন প্রশস্ত ছিল না, জড়সড়ভাবে কোন রকমে রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে উঠিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমপ্রত্যাগত বহুতর যাত্রীর সহিত আমরা পূর্ব্ব-পরিচিত পথে চলিতে লাগিলাম। বামে অলকানন্দা তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছেন, আমরা দক্ষিণের পর্ব্বতগাত্রস্থিত নিতান্ত অল্পপরিসর রাস্তা বহিয়া চলিতেছি। কিছু দূর গিয়া একটি পুল পাইলাম, পুল পার হইয়া ও পারে আবার অলকানন্দাকে দক্ষিণে রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিষ্ণুপ্রয়াগে—সেই ভীষণ গর্জ্জনময়ী গিরিনদীযুগলের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলাম। নদীর ভয়ঙ্কর বিক্রম দেখিলে প্রাণে যথার্থই আতঙ্কের সঞ্চার হয়। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া কাষ্ঠের জীর্ণ পুল অতিক্রম পূর্ব্বক চড়াই উঠিতে লাগিলাম এবং যোশীমঠের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র চটীতে আশ্রয়লাভার্থ উপস্থিত হইলাম। এখানে আহারাদি করিয়া পুনরায় অপরাহ্ণে চলিতে হইবে।

এই যোশীমঠ। ইহাকে জ্যোতির্ম্মঠও বলিয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ের ক্রোড়ে এই যোশীমঠ বড়ই রমণীয় স্থান। অদ্বৈত-

বাদের স্থায়িত্বরক্ষাহেতু জ্ঞানগুরু শঙ্কর ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করতঃ উপযুক্ত শিষ্যদিগকে ঐ সকল মঠের পরিচালনভার অর্পণ করেন। উত্তরে হিমালয়মধ্যে বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ, দক্ষিণে সেতুবন্ধরামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্ব্বে জগন্নাথধামে গোবর্দ্ধন মঠ ও পশ্চিমে দ্বারকাপুরীতে সারদামঠ। এই মঠগুলি তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। শঙ্করাচার্য্য অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণাপথের দ্রবিড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া মাত্র দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবনের এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি সমগ্র ভারতব্যাপী বৌদ্ধমত খণ্ডন ও অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া প্রগাঢ় জ্ঞান ও গভীর চিন্তাসাধ্য বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শুনিলাম, এই যোশীমঠে সেই সমস্ত আদি গ্রন্থের অনেকগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই নাই। বেদবেদাঙ্গপারগ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, স্বাধ্যায়নিরত বিদ্যার্থী কিছুই এখানে দেখিলাম না। সমস্তই কালসাগরে বিলীন হইয়াছে। আধুনিক কালের ন্যায় তখন এরূপ মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব থাকিলে সেই সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাজির বোধ হয় এমন দুর্দ্দশা হইত না। আজ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ যোশীমঠে উপস্থিত হইয়া সেই মহাপুরুষের সম্বন্ধে কত কথাই মনে হইতে লাগিল। এই মহাত্মা দ্বিতীয় শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কল্যাণকামনায় কত মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, কত মহামূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া, অদ্বৈতবাদের প্রচারকল্পে জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়া কত স্থানে কত কীর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালসহকারে অধুনা তাহা বিলুপ্তপ্রায়। কেবল ভারতের চারিপ্রান্তস্থিত চারিটি মঠ তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথঞ্চিৎ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত বাসুদেবের জীর্ণ মন্দির এবং তৎসংলগ্ন কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দেখিলাম। বোধ হয়, প্রকোষ্ঠগুলিতে প্রাচীনকালে সেই মহাত্মগণ বাস করিতেন। একটি প্রস্তরনির্ম্মিত কুণ্ডে গোমুখ দিয়া প্রস্রবণের ধারা পড়িতেছে, উহার নাম দণ্ডধারা। নৃসিংহদেবের মন্দিরে নৃসিংহদেব ছাড়াও সীতারাম, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি অনেকগুলি অভ্যাগত দেবতা আছেন। জ্যোতীশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি একটু দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ ইহার নামানু-

সারেই স্থানের নাম জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে স্থানটি বড়ই মনোরম।

মঠাধিপতি রাওল সাহেব বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়ের অন্যতম ত্রোটকাচার্য্য গিরির হস্তে এই মঠের পরিচালনভার অর্পণ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী অধিস্বামিগণ মঠের বিপুল অর্থের প্রলোভনে ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া স্বীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হন। তাহার পর হইতে যোশীমঠ এবং বদরিকাশ্রম মন্দিরের কর্ত্তৃত্বভার দক্ষিণাপথের রাওল উপাধিধারী ব্রাহ্মণদিগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ইঁহারা প্রায়শই নিরক্ষর এবং অত্যন্ত ভোগবিলাসপরায়ণ। পূর্ব্বে যে সকল ত্যাগী মহাপুরুষ মঠাধিপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অসাধারণ ত্যাগ এবং সন্ন্যাসের সামান্য নিদর্শনস্বরূপ কেবলমাত্র গৈরিক পাগ্ড়ী বর্ত্তমান মঠ-স্বামীর শিরোদেশে শোভা পাইতেছে। ঐহিক সুখসম্পদের আশায় স্থূল বিষয়ের মায়ায় মোহিত হইয়া ইনি সাক্ষাৎ গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন; বিপুল সম্পত্তির অধিস্বামী হইয়া বিবিধ মণিমাণিক্য-সুবর্ণনির্ম্মিত দ্রব্যাদির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। এই অর্থরাশির অতি সামান্য অংশও যদি জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে অনেক কাজ হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক মোহান্তজী ছাড়া তাহা আর কাহারও বড় উপকারে আসিল না।

উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল যে, সাধননিরত কত শত সাধু মহাত্মা তথায় দেখিতে পাইব। মঠের মোহান্তগণকে প্রকৃতই ত্যাগী এবং জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত দেখিতে পাইব। কিন্তু তাহার কিছুই দেখিতে পাই নাই। তৎপরিবর্ত্তে দেখিলাম, পরম শোভার আস্পদ হিমালয় আর প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব সৌন্দর্য্যের অভ্যুদয়। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে পাই নাই; কিন্তু যাহা ভাবি নাই, তাহাই দেখিয়াছি। কে জানিত হিমালয়ের এত শোভা! বহুযোজনবিস্তীর্ণ সুবিশাল হিমালয় কি অতুল সৌন্দর্য্যবিভবে আপনার বিরাট্ কলেবর পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কত সুন্দর, কি করিয়া বলিব। যদি কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই অভীপ্সিত স্থানে আসিতে সমর্থ হন, গিরিরাজের অতুলনীয় মাহাত্ম্য তিনিই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবেন।

যে চটীতে আমরা এই মধ্যাহ্নকালে অবস্থান করিতেছি, তাহার নাম শোধ-ধারা। যাত্রিপরিপূর্ণ একটি দোকানের এক কোণে কোনরূপে আমরা ৩টি প্রাণী যথাসম্ভব আহারাদি করিয়া জড়সড়ভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নের রৌদ্র বড়ই ভয়ানক। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা সেই চটী হইতে চরণ তুলিলাম। অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্রের মধ্যেই আমাদিগকে রওনা হইতে হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নানাস্থানের তীর্থযাত্রী নরনারীর সহিত একত্রে পথ চলিতেছি। অনুমান ১ মাইল চড়াই করিবার পরে অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা পাইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুমার চটীতে পৌঁছিয়া একটা ভাল দোকানে আশ্রয় লওয়া হইল। চটীতে অনেকগুলি দোকান, দ্রব্যাদিরও কোন অভাব নাই। তার পর আমাদের আশ্রয়দাতা দোকানদারটিও বেশ সজ্জন। সুতরাং কুমার চটীতে আমাদের তেমন কোন অসুবিধা হয় নাই। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া দোকানের বাহিরে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় একটা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। আমাদের সম্মুখের পাহাড়ের শিখরদেশে অতি উচ্চে একটি উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইল। ক্রমে সেটা বৃহদাকার হইয়া ৮।১০টি বিভিন্ন আলোকে পরিণত হইল। আর আলোগুলি ক্রমাগত উঠানাবা করিতে লাগিল। চটীর সমুদয় লোক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা দেখিতে লাগিল। দোকানদার বলিল, সে ১৬ বৎসর এই চটীতে আছে। কিন্তু "এয়সা কভি নেই দেখা।" সকলেই স্তম্ভিতভাবে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আলো কয়টি অদৃশ্য হইয়া গেল। বিধাতার রাজ্যে সবই আশ্চর্য্যময়; বিশেষতঃ এই পর্ব্বতময়দেশে সকলই অদ্ভুত। কি এক অচিন্তনীয় মধুরভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া শয়ন করিলাম। সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন ২৪শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াসমাধানান্তে যথাপূর্ব্ব চলিতে লাগিলাম এবং ৮ মাইল চড়াই উৎরাই করিয়া মধ্যাহ্নকালে গরুড়গঙ্গা চটীতে উপস্থিত হইলাম। বদরিকাশ্রম যাইবার দিনে এখানে একরাত্রি ধর্ম্মশালায় বাস করিয়াছিলাম। আজ আর ধর্ম্মশালায় স্থান মিলিল না। একটি ক্ষুদ্র দোকানের এক কোণে অতিকষ্টে নামমাত্র স্থান সংগ্রহ করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করা হইল। ঘরটা

বড় অপরিসর ও অত্যন্ত মাছির উৎপাত। কোনরূপে ঘণ্টা দুই কাটাইয়া অপরাহ্ণে পুনরায় বহির্গত হইলাম। সূর্য্যদেব এই অপরাহ্ণকালেও প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। দুই পা হাঁটিতেই ঘাম বাহির হইয়া পড়িল, আর ঘন ঘন জলপিপাসা। যেখানে ঝরণা পাই, প্রাণ ভরিয়া জলপান করি। এইরূপ ভাবে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পিপুলকুঠী নামক একটি সুন্দর চটীতে উপস্থিত হইলাম। তখনও অনেকখানি বেলা আছে। একটি ভাল স্থানে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করতঃ চটী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। পিপুলকুঠীর বাজারটি বেশ, চামর এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। একটি পোষ্টাফিস্ আছে। জলেরও বেশ সুবিধা।

আমরা বাজার হইতে বহির্গত হইয়া সেই সুপরিসর গুহার পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা বহিয়া চলিতে চলিতে অল্পক্ষণেই অলকানন্দার পুলের নিকটে আসিলাম, এবং পুল পার হইয়া একটু ভাল রাস্তায় চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিয়াচটীতে রাত্রিযাপনার্থ উপস্থিত হইলাম। এ চটী অতি সামান্য। যাইবার দিনেও এখানে মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া গিয়াছিলাম। সে দোকান আজ যাত্রি-পরিপূর্ণ। একটি ভাঙ্গা ছাপ্পর ঘরে যৎকিঞ্চিৎ স্থান পাইলাম। কোনরূপে রাত্রিটা অতিবাহিত হইল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ছাপ্পর ঘরে জল পড়িয়া সমস্ত কম্বল ভিজিয়া গিয়াছে। কম্বলের ধারগুলি সব কাদামাখান, আমি কাদার মধ্যেই শুইয়া আছি। কি করা যাইবে, সেই ভিজা কম্বল ঘাড়ে করিয়াই চলিতে লাগিলাম। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিছু দূর চলিতেই দেখি, একপাল ছাগল আসিতেছে। একে পথ নিতান্ত অল্প পরিসর, আবার পাহাড়ের গা বাহিয়া অনবরত জল পড়িতেছে। কোথায় দাঁড়াই, মহা বিপদ্ আর কি, এই ছাগলের পাল চলিয়া না গেলে আর রাস্তা পাইবার উপায় নাই। তাহাও অতি সাবধানে সম্মুখে লাঠী রাখিয়া একটু জোর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যে ছাগল, যদি একবার দয়া করিয়া মাথাটি নাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে সদ্যই গঙ্গালাভ ঘটিবে, আর কষ্ট করিতে হইবে না।

সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আমরা তিন জনে চলিতে লাগিলাম এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই মঠ চটীতে উপস্থিত হইলাম। আরও ২ মাইল চলিয়া আমাদিগকে

লালসাঙ্গা গিয়া আহারাদি করিতে হইবে। সুতরাং এই চটীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অলকানন্দার ধারে ধারে আমরা লালসাঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মঠ চটীতে আসিবামাত্রই বৃষ্টি থামিয়া গেল। লালসাঙ্গা পর্য্যন্ত আসিতে পথে আর বৃষ্টি পাই নাই। প্রচণ্ড বেগশালিনী অলকানন্দার উন্নত তীরভূমি দিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে আমরা লালসাঙ্গার পুলের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। পুল পার হইয়া উপরে লালসাঙ্গার বাজারে প্রবেশ করিয়া একটা দোকানে আশ্রয় লওয়া গেল। দোকানটি বেশ বড় ও পরিষ্কার। দোকানদার আমাদিগকে দোকানের এক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিল। অনেকখানি জায়গা পাইয়া বেশ হাতপা ছড়াইয়া আরাম করা গেল। অলকানন্দা সামান্য নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। অলকানন্দার ঠিক উপরেই আমাদের ঘরটি, মাথা তুলিয়া চাহিতেই অলকানন্দা দৃষ্টিপথে পতিত হন; অমনই মন যেন কোন স্বর্গরাজ্যে চলিয়া যায়। কি সুন্দর,—হৃদয়োন্মাদক স্বরলহরীতে দিগন্ত মুখরিত করিয়া কঠোরপরায়ণা গিরিনদী আলুথালুবেশে স্বীয় গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছেন, কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনভাবে একমনে তাঁহারই উদ্দেশে চলিয়া যাইতেছেন। প্রাণের তীব্র ব্যাকুলতায় উন্মত্ত হইয়া পরমপ্রিয় সাগরোদ্দেশে অবিরামগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। প্রাণপণ শক্তিতে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। দেখিয়া মনে হইল, আমারও প্রাণ কেন ঐরূপে প্রেমময়ের অভয় চরণোদ্দেশে ছুটিয়া যায় না? শত বিঘ্ন অবহেলে তুচ্ছ করিয়া আকুল আবেগে চিরনির্ভর বিশ্বদেবতার শ্রীচরণপ্রান্তে ধাবিত হয় না? দুর্ব্বল অসংযত মন কত দিকে ছুটাছুটী করিতেছে, কত প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া নিয়ত ভয় ও ক্লেশরাশিতে আত্মজ্ঞানবিহীন হইয়া পড়িতেছে। দূর কর প্রভু, হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা—সকল অসারতা অপসারিত করিয়া দাও। এই উন্মত্তা তরঙ্গিণীর ন্যায় সুমধুর নাদে তোমার অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দধারা প্রবাহিত করিয়া অবিশ্রান্তভাবে একমনে তোমারই উদ্দেশে ছুটিয়া যাই। দয়াময় নাথ, তুমিই ভরসা!

অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই আহারাদির যোগাড় করিতে উঠিয়া পড়িলাম। দোকান হইতে আহার্য্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের শ্যা···বাবু রান্নার উদ্যোগ

করিতে লাগিলেন। আমরা অলকানন্দায় স্নান করিতে চলিলাম। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ডবিখণ্ড প্রস্তর বহিয়া অনেকটা নামিয়া অলকানন্দার তুষারশীতল জলে অবতরণ করিলাম। তেমন বেশী ঠাণ্ডা বোধ হইল না। আর এখন শীতও অনেকটা সহ্য হইয়া গিয়াছে। আজ এক মাস হইল এই ঠাণ্ডার দেশে বাস করিতেছি। প্রথমে যেমন জল দেখিলেই ভয় হইত, আজকাল আর তেমন নাই। যাহা হউক, বেশ আরাম পূর্ব্বক স্নান করিয়া বাসায় আসিলাম। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ একটু ভাল রকম আহারাদি করিয়া সুখে নিদ্রা দেওয়া গেল। অপরাহ্নে লালসাঙ্গা হইতে বহির্গত হইলাম।

লালসাঙ্গা স্থানটি মন্দ নয়। বেশ সহরের মত। ডাক, টেলিগ্রাফ, পুলিশ, ডাক্তারখানা সবই আছে। সাহেবদের একটি বাঙ্গলো দেখিলাম। চারিদিকেই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। জলেরও খুব সুবিধা। বদরিকাশ্রম যাতায়াতের পথে বিস্তর যাত্রী এখানে আশ্রয় লইয়া থাকে।

অলকানন্দার ধারে ধারে নূতন পথ দিয়া আমরা একত্রে অনেকগুলি যাত্রী চলিতে লাগিলাম। এই রাস্তায় আমাদের দেশের অনেক রকম গাছ দেখা গেল। আম্র, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বহুবিধ গাছ দেখিতে পাইলাম। দুই মাইল পরে একটি ক্ষুদ্র চটী পাইলাম। চটীর নাম আমার স্মরণ নাই। এখান হইতে রাস্তা প্রায় সোজা। বেশী উঁচু নীচু নাই। এইরূপ রাস্তায় ৩ মাইল চলিবার পর মঠিয়ানা নামক একটি চটীতে উপস্থিত হইলাম। চটীতে ৩।৪খানি দোকান আর ঝরণাও খুব নিকটে। এই স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রামানন্তর পুনরায় চলিতে লাগিলাম। আজ আমাদের গতি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেহ বলিতে-ছেন—উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, রাস্তায় আর বৃথা বিলম্ব করিয়া ফল কি? শীঘ্র শীঘ্র এ পার্ব্বত্য দেশ হইতে বিদায় লওয়াই শ্রেয়ঃ। যাত্রীদিগের সহিত একমত হইয়া আমরাও যথাসম্ভব দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিলাম এবং ৩ মাইল অতিক্রম করিয়া নন্দপ্রয়াগ নামক একটি সুন্দর ও জনবহুল স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি একটা দোকানের দ্বিতলে বাসা ঠিক করিয়া তল্পীতল্পা নামাইলাম। দোকানে লুচীর অর্ডার দিয়া একবার সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম। আমাদের বাসার নিকটেই পণ্ডিত মহেশানন্দ শর্ম্মা নামক তদ্দেশীয় জনৈক ভদ্রলোকের দোকান। তিনি আমাদিগকে বসিতে অনুরোধ

করিলেন। আমরা তাঁহার সেই ঔষধ ও ছবির দোকানে বসিয়া অনেকক্ষণ নানাবিষয়ক গল্প করিয়া বাসায় আসিলাম। দোকানদারের নিকট হইতে লুচী ইত্যাদি লইয়া ভক্ষণ করতঃ নিদ্রার উদ্যোগ করা হইল। পরদিন ২৬শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রথমতঃ নন্দপ্রয়াগ স্থানটি ঘুরিয়া দেখিতে বাহির হইলাম।

নন্দপ্রয়াগ উত্তম স্থান। এখানে নন্দা ও অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে। চণ্ডিকা দেবী, বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেব এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে। নদী-যুগলের সঙ্গমস্থলে অলকানন্দার জল পাণ্ডুবর্ণ ও নন্দার জল কাল। নন্দার গতি ধীর, কিন্তু অলকানন্দা প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছেন। সঙ্গমস্থলের পবিত্র বারি মস্তকে ধারণ করতঃ আমরা সেই পরম রমণীয় স্থানে বসিয়া প্রকৃতির অসামান্য রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বাজারের নিকটে জনৈক সাধুর একটি উত্তম বাগান আছে। বাগানে আম, কলা, দাড়িম্ব প্রভৃতি বৃক্ষগুলি বেশ যত্নের সহিত তৈয়ারী করা হইয়াছে। বাজারটিও বেশ, অনেকগুলি দোকান ও যাত্রিনিবাস আছে। ডাকঘর, পুস্তকাগার সব রকমই আছে। মোটের উপর পাহাড়ের মধ্যে স্থানটি বড়ই মনোরম। পণ্ডিত মহেশানন্দজীর নিকটে শুনিলাম, স্থানটি পূর্ব্বে আরও উত্তম ছিল, অলকানন্দার উদরসাৎ হওয়ায় ইহার পূর্ব্বগৌরব সমুদয় নষ্ট হইয়াছে।

আমরা চতুর্দ্দিকে দেখিয়া শুনিয়া কম্বল ঘাড়ে আর লাঠি হাতে করিয়া নন্দ-প্রয়াগ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। অলকানন্দার ধারে ধারে ৩ মাইল আসিয়া সোনালা নামক একটি ক্ষুদ্র চটী পাইলাম। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে পুনরায় যাত্রা করিলাম। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শোভাময় সমুন্নত পাহাড়-শ্রেণী আর অলকানন্দার নিম্নতটে সুন্দর সমতল বিবিধ শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মাঝে রাস্তায় খানিকক্ষণ বৃষ্টি হইয়া গেল। ভিজিয়াই চলিতে হইল। কিছু দূরে একটি সামান্য চটীতে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। আজ আমাদের সংকল্প—মধ্যাহ্নে যেরূপে হউক কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছিতে হইবে। সুতরাং একটু দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। পথে ২।১টি চটী পাওয়া গিয়াছিল, আমরা ঐ সকল চটীতে অপেক্ষা করি নাই। সোনালা চটী হইতে অনুমান ৮ মাইল চলিয়া আমরা কর্ণপ্রয়াগের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রিগণ সিধা সড়ক রাস্তায় না গিয়া সঙ্গমস্থলে স্নান করিবার নিমিত্ত

ঘাটের দিকে নামিয়া যাইতেছে। আমরা নিতান্ত পরিশ্রান্তবোধে আর সঙ্গম-স্থলে স্নান করিতে পারিলাম না। একটি ভগ্নপ্রায় পুল অতিক্রম করিয়া কর্ণ-প্রয়াগ বাজারের ভিতর প্রবেশ করা গেল। টেলিগ্রাফ আফিসের পার্শ্বে একটি দ্বিতল গৃহ আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামানন্তর আহারাদির যোগাড় করিতে লাগিলাম।

জিনিসপত্র এখানে কিছু সস্তা পাওয়া গেল। সঙ্গীয় শ্যা...বাবু রান্নার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি ইত্যবসরে একবার সহরটা দেখিতে বাহির হইলাম।

কর্ণপ্রয়াগ সঙ্গমস্থলের নিকটে মহাত্মা দাতাকর্ণপ্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর শিবমন্দির রহিয়াছে। তাহারই সন্নিকটে কর্ণকুণ্ড। মহাত্মা কর্ণের সম্পাদিত বিপুল যজ্ঞ ও প্রভূত দানাদির কথা স্থানীয় পাণ্ডাদের নিকট আজও শুনিতে পাওয়া যায়। শিবমন্দিরের একটু উপরে উমাদেবীর মন্দির। এ দিকে বাজার-টিও বেশ জমকালো। নানাবিধ দোকান ২০।২৫ খানি এবং কালী কম্‌লী বাবার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। ডাক, তার, পুলিশ কিছুরই অভাব নাই। তাহা ছাড়া একটি ছাপাখানাও এখানে আছে। বদরিকাশ্রমের পথে আমি এই দুইটি ছাপাখানা দেখিলাম। একটি উখীমঠে আর একটি এই কর্ণ-প্রয়াগে। কত দেশের কত সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্ন্যাসীর এখানে সমাগম হইয়াছে। কালী কম্‌লী বাবার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালাতে অনেক সাধু একত্র হইয়াছেন। সাধুদর্শনমানসে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, ভিতরের একটি ঘরে ২।৩ জন সদাব্রতের খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরণ করিতেছেন ও ন্যূনাধিক দুই শত সাধু মহাত্মা প্রশস্ত বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছেন। কেহ সদাব্রত লইতেছেন, কেহ কেহ সদাব্রতের প্রাপ্ত আলু কয়েকটি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়া কোন রকমে হাতে ঠুকিয়া রুটী প্রস্তুত করিতেছেন, আবার কোন কোন সাধু উদরদেবকে তৃপ্ত করিয়া স্বীয় অধিকৃত দেড় হাত স্থানে বিস্তৃত কম্বলের আসনোপরি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাম্রকূটসেবনে রত। প্রাচীনদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সাধুদিগের যাহা কর্ত্তব্য, আহারান্তে বিশ্রামের সময় শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনে অতিবাহিত করা, তাহা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া বাহির হইয়া আসিতে এক মুণ্ডিতমস্তক তেজঃপুঞ্জ-

কলেবর সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ করিলাম। রেশমনির্ম্মিত গৈরিক আলখেল্লা ও পাগ্‌ড়ী শোভিত, দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু এবং বামহস্তে কয়েখানি লুচী লইয়া ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই সন্ন্যাসিপ্রবর সেই খাদ্য-দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বিনীতভাবে তাহা লইতে অস্বীকার করিলাম। আরও দুই একটি কথা বলিয়া তিনি উপরে ধর্ম্মশালায় উঠিয়া গেলেন, আমিও আস্তে আস্তে বাজারের :মধ্য দিয়া বাসায় আসিলাম। আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া, আমরা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে কোন চটীতে রাত্রিযাপন করিব সঙ্কল্প করিয়া, কর্ণপ্রয়াগ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ক্রমশঃ

ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

—:০:—

শ্রীগুরবে নমঃ।

৩য় খণ্ড। শ্রাবণ ১৩২২ ৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী (কাব্যতীর্থ), শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত গুরুদাস সান্যাল, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, ২৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট হইতে মহাকবি ভাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যজগতে এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থাপিত করিয়াছে, আমরা ভাসের নাটকাবলী কথাকারে অনূদিত করিবার জন্য ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে অনুমতিপত্রের নকল প্রদত্ত হইল। কবিকথার মালতী-মাধব শেষ হইলেই ভাসের নাটকাবলী কবিকথাকারে প্রকাশিত হইবে।

No. 220.

Office of the Curator for the publication of Sanskrit
Mss. Trivandrum
6th. April 1915.

Dear Sir,

In reply to your kind letter dated 5. 3. 15, I have great pleasure to inform you that the Government have permitted you to translate into Bengali the works of Bhasa in the form of a tale. You may also consult with advantage the Pratimanataka one of the best works of Bhasa and also an improved second edition of Svapnavâsavadatta both will be published in a month.

I am Dear Sir,
Yours truly
Sd. T. Ganapati Sastri
Curator.

To Nikhil Nath Ray esq.

সীতাহরণ।

আলোচনা।

ভাষার কথা।

আজকাল পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ভাষার কথা লইয়া খুব লড়াই চলিতেছে। মূল কথা এই যে, আমাদের লিখিত ভাষা বা বঙ্গসাহিত্য কোন্ পথে দাঁড়াইবে? বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ক্রমেই আপনার খোলস বদলাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের স্রোতের মুখে তুমি আমি বাঁধ দিয়া কি তাহাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারিব? রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামমোহন রায়ের ভাষা কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মধুসূদনের ভাষাও প্রায় তাহাই। এক্ষণে বঙ্কিমের রাজত্ব চলিতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত কাল এ রাজত্বকে না মুছিয়া লইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সাহিত্যের নব কলেবর হইবে না। তবে এত কথা কাটাকাটির প্রয়োজন কি? যতদিন বঙ্কিমী যুগ থাকিবে, ততদিন তোমার আমার কোনই কথা চলিবে না। কাল-সাহায্য না করিলে সে যুগের অবসানও ঘটিবে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যুগ কত দিন ধরিয়া থাকে? তাহার উত্তরে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, যে রাজত্ব যেরূপ সুদৃঢ় হয়, তাহার স্থিতিকালও সেই অনুসারে হইবে। বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী সম্রাট্ বঙ্গসাহিত্যরাজ্যে আর কেহ রাজত্ব করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না, তাই তাঁহার যুগ আরও কিছুকাল আমাদের সাহিত্যরাজ্যে থাকিবে। আবার অক্ষয়চন্দ্র ও হরপ্রসাদের ন্যায় তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ তাঁহার রাজত্বরক্ষার চেষ্টা করিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেও পারে। জগতে কোন জিনিষ চিরস্থায়ী নহে, কাজেই আমরা তাহা চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না। তবে আমরা একটা কথা এই বলি যে, সাধারণ সাহিত্য-কলেবর বদলাইলেও প্রাচীন

রীতিগুলি যে একেবারে অন্তর্হিত হয়, তাহাও নহে। বঙ্কিমী যুগেও বিদ্যাসাগরী রীতি একেবারে নষ্ট হয় নাই, কালীপ্রসন্ন ও রজনীকান্তের লেখা তাহার দৃষ্টান্ত। এখনও যে বিদ্যাসাগরী রীতি একেবারে নাই, তাহাও বলা যায় না, কিন্তু রামরাম বসু বা রামমোহন রায়ের রীতি আর দেখা যায় না। আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের নিকষ পাষাণে এক্ষণে তাহারা ধরা পড়িবে না। আবার সাহিত্যের সকল বিভাগেই যে এক প্রকার রীতি চলে, তাহাও আমরা মনে করি না, বঙ্কিমী রীতি সাধারণ সাহিত্যের পক্ষে বেশ উপযুক্ত, কিন্তু দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পক্ষে তাহা যে সম্পূর্ণ উপযোগী তাহাও বলা যায় না। বিদ্যাসাগরী রীতিকে কিছু সহজ করিয়া লইলে ঐ সমস্ত প্রবন্ধের পক্ষে উপযোগী হয় বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য কালীপ্রসন্ন, অক্ষয়কুমার বা রজনীকান্তের রীতি আমাদের সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে থাকিয়া যাইবে। সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদে বিদ্যাসাগরী রীতি বর্জ্জন করিলে চলিবে না। বাণভট্ট বা ভবভূতির গ্রন্থের অনুবাদ চল্‌তি কথায় কদাচ হইবে না, তাহার গল্পাংশ লেখা যাইতে পারে বটে কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ করার উপায় নাই। কাজেই সাধারণ সাহিত্যের পরিবর্ত্তন হইলেও এক একটা বিভাগের জন্য এক একটা রীতি থাকিয়াই যাইবে। সমস্ত উলট পালট হওয়া বহুকাল সাপেক্ষ। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের মালগাড়ীর সহিত সাহিত্যের ডাকগাড়ী যে একপথে চলিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না, রেলওয়েরও ডাকগাড়ী ও মালগাড়ীর পথ পৃথক্। সাহিত্যের নরম পথে দর্শন বিজ্ঞানের মালগাড়ী চলিলে তাহা পুতিয়া বসিবে, আবার তাহাদের শক্ত পথে সাহিত্যের হাওয়াগাড়ী চলিলে ফাটিয়া যাইবে। পথ পৃথক্ থাকাই চাই, জগতের সকল সাহিত্যেই তাহাই আছে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সাহিত্যে কখনও এক রীতি থাকে না, এবং সাধারণ সাহিত্যের পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ; তাহা কোনপথে দাঁড়াইবে, তাহাও বলা যায় না। বাঙ্গলার প্রকৃত কলেবর কি ছিল তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্‌টা বাঙ্গলা ভাষা কি করিয়া বলা যায়? বর্ত্তমান মৌখিক ভাষাকে বাঙ্গলাভাষা ধরিয়া লওয়া যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আকার। দক্ষিণ বঙ্গের সকল স্থানের মৌখিক ভাষা এক নহে, কলিকাতার ভাষার সহিত তাহার নিকটস্থ মফঃস্বলের ভাষার পার্থক্য আছে। মৌখিক ভাষা যে সাহিত্যের

স্থান অধিকার করিয়া বসে, ইহাও বলা যায় না। সকল দেশে ও সকল সাহিত্যে মৌখিক ও লিখিত ভাষার নিদর্শন দেখা যায়, আমাদের সাহিত্যেও তাহা থাকিবে। আমাদেরও লিখিত ভাষার স্থল মৌখিক ভাষা যে একেবারে দখল করিয়া লইবে, ইহা কদাচ মনে হয় না। তবে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এখনও তাহাই বলিতেছি যে, কালে কালে লিখিত ভাষার পরিবর্ত্তন হইবে ইহা নিশ্চিত।

পল্লী উদ্ধার।

আজকাল পল্লী উদ্ধারের জন্য সহরবাসীদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। যদি সত্য সত্যই তাহাই হয়, তাহা হইলে নিন্দার বিষয় নহে, তবে যে আশঙ্কার বিষয়, সে কথা আমরা বলিব। কলিকাতায় "হিতসাধন মণ্ডলী" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, পল্লীর উন্নতিই তাহার উদ্দেশ্য। কি করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরার্থপরতা দেখাইয়া সেই কার্য্য সাধন করিবে, অর্থাৎ পল্লীবাসীদের উন্নতিকামনায় তাহারা ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি হইয়া পল্লীতে পল্লীতে গিয়া বসিবে, কিন্তু তাহাদের খরচা যোগাইবেন পল্লীবাসীরা। প্রথমতঃ, এরূপ কল্যাণক্রয়ের জন্য পল্লীবাসিগণ রাজি হইবে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, পয়সা দিয়া তাহারা কিরূপ কল্যাণ কিনিবে? কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা হইবে? কেবল কি লোকসেবা? সেবাই হউক শুশ্রূষা হউক, কোন একটা ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। অবশ্য, কলিকাতার নৈশ বিদ্যালয়ে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কথা শিক্ষা দেওয়া হইবে না। সম্ভবতঃ বিশ্বজনীন ধর্ম্মের কথাই আলোচিত হইবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ব্যতীত কোন প্রকারের ধর্ম্মের উপদেশ যে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না, ইহা আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল সেবানীতিতে শিক্ষিত হইলে তাহার ফল খুব ভাল হইবে বলিয়া মনে করি না। কেবল হালক্যাসানি গীতাশিক্ষা দিলে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয় না এবং গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহাও যে সকলে বুঝিতে পারে,

ইহাও মনে করি না। অর্জ্জুনকে নিজ বর্ণোচিত আশ্রমোচিত ধর্ম্মে দীক্ষিত করার জন্ম গীতার প্রবর্ত্তন। বৈশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কি সেইরূপ বর্ণোচিত আশ্রমোচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে? তাহা হইলে প্রথমে তাহাদের নিজ পরিবার-বর্গের সেবা করিতে হইবে, পরে পল্লীবাসীদের দ্বারস্থ হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে শিক্ষিত না হইলে এই সকল ছাত্র গ্রামের শিক্ষক সাজিয়া, যদি আপনাদের শিক্ষা মত প্রচার করিতে থাকে, তাহা হইলে পল্লীমধ্যে একটা অশান্তি, একটা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। তখন অনেকে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে সেবার জন্ম ছুটিবে। জাতি ধর্ম্ম ছাড়িবে, পল্লীর উন্নতি মাথায় উঠিবে। আমরা এরূপভাবে পল্লীর উন্নতি চাহি না। পল্লীবাসীদিগকে তাহাদের জাতিধর্ম্মে রাখিয়া যদি কেহ হাত ধরিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারেন, আমরা তাঁহাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিব। নতুবা হালফ্যাসানি গীতা শিক্ষা দিয়া তাহাদের জাতি, ধর্ম্ম, স্বজনপ্রতিপালনের মূলে কুঠারাঘাতের চেষ্টাকে পল্লীসংস্কারের চেষ্টা না বলিয়া পল্লীধ্বংসেরই চেষ্টা বলিব। যে শিক্ষার মূলে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা নাই, সে শিক্ষাকে আমরা শিক্ষাই বলি না। আর বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্মই নাই। থাকিলেও সকলে তাহার অধিকারী নহে।

পরলোক-রহস্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন,—

আর যাঁহারা উৎকট পাপপুণ্য সঙ্গে লইয়া দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই পুণ্য ও পাপের ফলে সংকল্পসৃষ্ট মনোময় স্বর্গনরক ভোগ করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, বাসনা, কর্ম্ম ও অবিদ্যা বিদ্যমান থাকায় সুখদুঃখভোগ তুল্যরূপই হইয়া থাকে। স্বর্গভোগের কথাই অগ্রে বলা যাউক।

স্থূলশরীরে বাহ্যবিষয় সাপেক্ষ বলিয়া সুখ অল্প ও ক্ষণস্থায়ী। তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না, অবসাদ সহজেই আসিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহে বাহ্যবিষয় নিরপেক্ষ

বলিয়া সুখ মানস ও সংকল্পসৃষ্ট, কাজেই বহুকালস্থায়ী। তবে ঐ বহু স্থায়িত্বের একটি পরিমাণ আছে। নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ পর্য্যন্ত স্বর্গসুখভোগ। ঐ মিয়াদ শেষ হইলে পুণ্যভার লঘু হইয়া আইসে। ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তি অবশেষে স্বকৃত-কর্ম্মানুরূপ নূতন দেহ লাভ করে। পুণ্যভার ক্ষয় পাইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেই ক্ষীণকর্ম্মা ব্যক্তিকে জোরপূর্ব্বক মর্ত্ত্যে আনিবার জন্য বাধ্য করে।

"যাবৎসম্পাতমুষিত্বা অর্থৈতমেব পুনর্নিবর্ত্তন্তে"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

গীতাও বলেন—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের বেগ যতক্ষণ, ততক্ষণই তাহার শূন্যে অবস্থিতি। বেগক্ষয়ান্তে ভূমিতে পড়িতেই হইবে; স্বর্গভ্রষ্ট পুরুষকেও ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, নামিয়া আসিতে হইবেই হইবে।

প্রৌঢ়। পণ্ডিত মহাশয়, একটি জিজ্ঞাস্য আছে। স্বর্গে পুণ্যফল নিঃশেষে ভুক্ত হয় কি না? নিঃশেষে যদি ভুক্ত না হয়, তাহার কারণ কি? আর নিঃশেষে ভুক্ত হইলে পুণ্যাবশেষ না থাকায় পুনরায় জন্মগ্রহণের কোন কারণ থাকে না। পাপ নাই, পুণ্যও নিঃশেষ হইল, তবে মোক্ষের বাধা কি? মোক্ষ না হইলেও, পুণ্য বা পাপ না থাকায় তার মর্ত্ত্যে জন্মলাভ হইবে কেন?

পণ্ডিত। স্বর্গফলদ পুণ্যের নাম পারলৌকিকার্থ পুণ্য—ইহাই স্বর্গে নিঃশেষে ভুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পারলৌকিকার্থ পুণ্য ব্যতীত আর এক প্রকার কর্ম্ম আছে—যাহাকে ঐহিকার্থ পুণ্য বলে। পারলৌকিকার্থ পুণ্যই স্বর্গভোগের জন্য, ঐহিকার্থ মর্ত্ত্যের জন্য। এই ঐহিকার্থ পুণ্যের ত আর স্বর্গে ফলভোগ হইবে না, কাজেই উহার ফল যাইবে কোথা? উহারই ফলে মর্ত্ত্যে শরীরগ্রহণ অনিবার্য্য। ঐহিক কর্ম্ম না থাকায় বাসনার ক্ষয় না পাওয়ায়, মুক্তির সম্ভাবনা নাই, অথচ ঐ ঐহিক কর্ম্ম থাকিতে, বাসনা থাকিতে, মর্ত্ত্যে জন্মলাভের কোন বাধাই থাকিতে পারে না। তৈলভাণ্ডে তৈলাবশেষ লাগিয়া থাকে বলিয়া পুণ্যা-বশেষ যে থাকে, তাহা মানা যায় না। পুণ্য ত আর তরল দ্রবপদার্থ নহে যে, অবশেষ থাকিবে। আর অবশেষও ত পারলৌকিকার্থ পুণ্য; স্বর্গে তাহার ফল-ভোগই বা হইবে না কেন? অতএব পুণ্যাবশেষফলে মর্ত্ত্যে জন্মলাভ হইয়া

থাকে, ইহা স্বীকার করা অপেক্ষা ঐহিকার্থ ও পারলৌকিকার্থ বিভাগ স্বীকার করায় বিষয়টি সুন্দর মীমাংসিত হইয়া যায়। দাঁড়াইল ঐহিকফল কতকগুলি কর্ম্মের, কতকগুলির বা পারলৌকিক ফল।

প্রৌঢ়। স্বর্গে চিরযৌবনা অপ্সরা, অবসাদহীন ভোগ, দুঃখশূন্য ও সংকল্প-লভ্যসুখ, চির-জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, অটুট যৌবন, ইচ্ছামাত্র কামনাপরিপূরণ—ইহার তাৎপর্য্য কি ?

পণ্ডিত। স্থূলশরীরে সুখ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের অধীন। এ সুখ বিষয় সম্পর্কাধীন বলিয়া বৈষয়িক। (যদিও সুখ প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়াধীন নহে, চিত্তাধীন, তথাপি আবহমান সংস্কারবশে বিষয়াধীন বলিয়া মনে হয়,) স্বর্গে যে সুখ তাহা বৈষয়িক নহে। স্বর্গীয় সুখ মানস ও সংকল্পলভ্য। বাহ্যবিষয় নিরপেক্ষ ও সংকল্পোপনীত বলিয়া পারলৌকিক সুখ অপূর্ব্ব। নিজসৃষ্ট সংস্কারক মূলক বলিয়া নিরতিশয়। মানব মর্ত্ত্যে জন্মিয়া যে সমস্ত সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছে, যদি তদুপযোগী পুণ্যকর্ম্ম সেই মানবের থাকে, তাহা হইলে পরলোকে ঐ আকাঙ্ক্ষিত সুখভোগ হইবে। আর পুণ্যকর্ম্মফলে এমন একটি শক্তিও জন্মে, যে শক্তিবশে জগৎ সৃষ্টি ব্যতীত অন্য ঐশ্বর্য্যভোগ লাভ হইয়া থাকে ; ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, তপোলোক প্রভৃতি স্থানে গমনোপযোগী অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্থূলদেহের সুখ আর লিঙ্গদেহের সুখের মধ্যে তারতম্য অল্পই। স্থূলদেহের সুখে যে তৃপ্তি, লিঙ্গশরীরে সুখে সেই সমানই তৃপ্তি। বাস্তব রাজা হওয়ায় যে সুখ, স্বপ্নে রাজা হওয়াও তুল্যসুখ। স্বপ্ন যদি এক রাত্রেই ভাঙ্গিয়া না যাইত, আমরণ স্থায়ী হইত, তবে জাগ্রতসুখ ও স্বপ্নসুখ উভয়ই সমান আকাঙ্ক্ষিত হইত। কোনও বস্তু পাওয়ার সুখে, আর সেই বস্তু পাইয়াছি, এরূপ দৃঢ়বদ্ধ ধারণা জন্য কল্পিত সুখে তৃপ্তির কমবেশী হয় না। সুখদুঃখ চিত্তগত, বস্তুগত বলিয়া ধারণা জন্মিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুগত নহে। কর্ত্তার মানসিক সংস্কারের উপরই সুখদুঃখের প্রতিষ্ঠা। রূপ-যেমন দ্রষ্টার চক্ষুতে, দ্রষ্টার ইন্দ্রিয়বিকারই এক প্রকার রূপের জনক, সুখদুঃখ তদ্রূপ কর্ত্তার বা ভোক্তার অন্তরে, কর্ত্তা বা ভোক্তার মনেরই বিকার। লিঙ্গদেহে মনেরই খেলা, ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মভাবে মনেরই সর্ব্বতোভাবে অনুবর্ত্তন করে। মন একাই নিজের কার্য্য করে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐন্দ্রয়িক সুখভোগও করে। স্থূল-

দেহে অনুভূত বিষয়জ্ঞান লিঙ্গদেহে একাই মনকে করিতে হয়। জাগ্রৎসুখ যেমন সকলেরই সত্য বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নকালে স্বপ্নসুখকে কাহারও কি মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়? জীবদ্দশায় যাহা হইলে সুখভোগের চরম হয়, যাহা পাইলে সুখের পরিপূর্ণতা হয়, স্বর্গে সেইরূপই সুখের বর্ণনা। রাত্রিদিন জ্যোৎস্না ফুটিলে, ছয় ঋতুই বসন্ত হইলে, সুখ অবসাদহীন হইলে, যৌবন অটুট থাকিলে, চিরযুবতী সুন্দরী ললনা পাইলে, মণিময় হর্ম্মে বাস করিতে পারিলে সুখভোগের পরাকাষ্ঠা হইল বলিয়া আমরা মনে করি। ভ্রমণ নন্দনের মত উপবনে, ভোজন অমৃতের মত পেয় দ্রব্য, শয়ন পারিজাতবনের মত কোমল শয্যায়। মানস-সুখ মনেরই সৃষ্ট, সংকল্পমাত্রেই উপনীত, তবে তাহাতে চিরযৌবনা অপ্সরা প্রভৃতি থাকা অসম্ভব হইবে কেন?

নরকভোগও ঐ একপ্রকার। নরকভোগও মানস, অতি ভয়াবহ, বহুকাল-স্থায়ী। স্বর্গসুখের ঠিক বিপরীত দুঃখ নরকে বিদ্যমান। এই দুঃখও সংস্কারমূলক, তবে ভোক্তা ত নরকভোগের ইচ্ছা করে না, বাধ্য হইয়াই ভোগ করে, কাজেই সংকল্পমাত্রেই উপনীত বলা ঠিক শোভন হয় না। পাপী যে সকল ভয়াবহ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, মৃত্যুসময়ে ঐ পাপানুশোচনার ফলে কাহারও কাহারও নানা বিভীষিকাদর্শন ঘটে। "ঐ কে আসিতেছে, আমাকে মারিবার জন্য আসিতেছে, ঐ মারিল, বাবাগো, আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া কেহ কেহ চীৎকারও করিয়া থাকে। ঐ বিভীষিকা পাপীর মানস-দুঃখ। মৃত্যুর পর পাপী পাপময় সংস্কার, পাপাত্মিকা বাসনা, পাপপূর্ণ অন্তঃকরণ লইয়া মানসসৃষ্ট নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। স্থূলদেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয় না থাকায় দুঃখের লাঘব হওয়া দূরের কথা, বরং অধিকতর দুঃখভোগই করিতে হয়। স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয় থাকে না বলিয়া নরকভোগ বহুকালস্থায়ী ও অপরিসীম। ধর, কাহাকে জীবদ্দশায় অগ্নিতে ফেলিয়া পুড়িয়া মারা হইল। স্থূলদেহ দগ্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বায়ুও বাহির হইয়া গেল। স্থূল শরীরের যন্ত্রণা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। (তৎপরে যে যে যন্ত্রণা, তাহা লিঙ্গশরীরের) কাজেই অধিকক্ষণ ঐ দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। মৃত্যুই স্থূলযন্ত্রণার শেষ করিয়া দেয়। নরকভোগ মানস ও সংস্কারমূলক। প্রকৃত অগ্নিতে শরীর দগ্ধ না হইলেও স্থির সংস্কার জন্মে যে, "আমি পুড়িতেছি" দগ্ধ হওয়ার

স্থির সংস্কারে যন্ত্রণা সমানই। অথচ স্থূলদেহ পুড়ে না, প্রাণবায়ু বাহির হয় না—এই কারণে যন্ত্রণার নিরবচ্ছিন্ন ভোগ হইয়া থাকে। নরক-ভোগে পাপী নিজ পাপসৃষ্ট চিত্র সম্মুখে দেখিয়া কখন ভয়ে আত্মহারা হইবে, কখন নিজদত্ত দণ্ড আপনাকেই ভোগ করিতে হইবে। নারকী দেখিবে, ঐ কে আমাকে অগ্নিতে ফেলিল, কে মাথায় দণ্ড প্রহার করিল, বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ার পর কাহারও কাহারও স্বপ্নের মত ঐ যন্ত্রণা ছুটিয়া যাইবে। আবার পরক্ষণেই নূতন করিয়া যন্ত্রণার আরম্ভ হইবে। বাহিরের আগুণ অধিকক্ষণ পুড়ায় না, কিন্তু মনের আগুণ সারা জীবনেও প্রজ্বলিত থাকিতে পারে। নরকভোগে অসীম যন্ত্রণায় ক্ষণে ক্ষণে মোহ, আবার মোহান্তে ক্ষণেক পরে মোহনাশ, আবার মোহ।

আত্মঘাতী আপাততঃ যন্ত্রণার লাঘবার্থ আত্মহত্যা করিয়া ফেলিল। একবার আত্মহত্যার কষ্ট পাইয়া মৃত্যুকে লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যু অন্তে যে লক্ষ-লক্ষ বার ঐ আত্মহত্যার যন্ত্রণা তাহাকে পাইতে হইবে, যে কষ্টের লাঘবার্থ আত্মঘাতী হইয়াছিল, সেই কষ্টই যে নিরন্তরই লাভ করিতে হইবে, ইহা জানা থাকিলে অনেকের আত্মহত্যা করিতে ভয় আসিতে পারে। অথবা ঐ দারুণ উত্তেজনা, ঐ শোচনীয় ঘৃণ্য দুর্ব্বলতা মানুষকে উন্মত্ত বিচারশক্তিহীন ও মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে বলিয়াই কি কেহ আর ভাবিবার সময়ই পায় না। আত্মঘাতীর কল্পপর্য্যন্ত গতি নাই। আত্মঘাতী এত বড় মহাপাপী যে, তাহার শাস্ত্রীয় দাহ নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই, শ্রাদ্ধাদি নাই। সেই মহাপতিত আত্মঘাতীর জন্য যে অশ্রু ফেলিবে, যে কাঁদিবে, তাহারও প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে বিহিত।

স্বর্গীয় মানসসুখ যেমন অবসাদহীন বলিয়া বড় প্রিয়। নরকভোগও তদ্রূপ নিরবশেষ বলিয়া বড় যন্ত্রণাদায়ক। বাহ্যজগতের অনুরূপই অন্তর্জ্জগত, অন্তর্জ্জগৎ বাহ্যজগতেরই প্রতিবিম্ব। স্থূল শরীরে বাহ্যজগতের খেলা; পরলোকে অন্তর্জ্জগতের খেলা। অন্তর্জ্জগতের সুখদুঃখ আর বাহ্যজগতের সুখদুঃখ—উভয়ের প্রকারগত পার্থক্য থাকিলেও অনুভব ও ভোগে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। স্বর্গভোগও যতকাল স্থায়ী, নরকভোগও ততকালস্থায়ী। স্বর্গ নরক আপেক্ষিক অনন্ত। যতদিন স্বর্গভোগোপ-যোগী পুণ্য থাকে, ততদিন স্বর্গ সত্য। যতদিন নরকভোগোচিত পাপ থাকে,

ততদিন নরক সত্য। স্বর্গনরকভোগের কারণীভূত পুণ্যপাপ যতকাল বিদ্যমান, ততকালের জন্য অনন্ত। স্বর্গভোগান্তে যেমন ঐহিক পুণ্যবশে মর্ত্ত্যে জন্ম, নরক-ভোগান্তেও তদ্রূপ ঐহিক পাপের ফলে জন্ম। পাপও পারলৌকিক দুঃখার্থ ও ঐহিক দুঃখার্থ। পারলৌকিকার্থ পাপের ফলই নরকে ভোগ হইয়া থাকে, পরলোকে অভুক্ত ঐহিকার্থে পাপের জন্য পুনরায় স্বানুরূপ দেহধারণ ঘটে।

প্রৌঢ়। স্বর্গ-নরকভোগান্তে সকলেই কি মানবজন্ম লাভ করে? মহাশয়, আপনার গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শুনিয়া আমাদের প্রশ্নলালসা মিটিয়া গিয়াছে। আপনিই বলিয়া যান।

পণ্ডিত। তাহার নিশ্চয়তা নাই। স্বর্গনরকভোগান্তে সকলকেই মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। তবে কেহ মানব, কেহ পশুপক্ষী, কেহ কীটপতঙ্গ, কেহ বা বৃক্ষলতা, কেহ লোষ্ট্রপাষাণরূপে জন্মগ্রহণ করে।

"দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্‌ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥"

সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেবত্ব, রাজসিক ব্যক্তি মনুষ্যত্ব, তামসিক ব্যক্তি পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা-লোষ্ট্র-পাষাণাদিরূপে জন্মিয়া থাকে। মনু বলেন—

"বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ।
সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্॥"

মহাপাতকীরা বহুবর্ষ নরকভোগ করিয়া তৎপাপক্ষয় হইয়া গেলে পর তথন সংসারে স্বানুরূপ দেহ ধারণ করে। মহাপাপীর যে স্থাবর জন্ম, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক ও ইহা তমো গুণ-পরিচায়ক। মহাপাতকী স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া স্থাবরের ছেদন, কুণ্ডন, পেষণ, ঘর্ষণাদিজন্য যন্ত্রণাভোগ স্থাবরশরীরবিশিষ্ট পাপাত্মাকে পাইতে হয়। কৃতকর্ম্মের ভোগান্তে স্থাবর-দেহ চ্যুত হইয়া থাকে।

স্থাবরদেহলাভ অর্থাৎ স্থাবরযোনিপ্রাপ্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একপ্রকার সংশ্লেষ আছে। কি পুণ্যবান্, কি পাপী, সকলকেই স্থাবরসংশ্লেষ পাইতে হয়। কারণ, স্থাবর সংশ্লেষ ব্যতীত জন্মলাভের কোন উপায় থাকে না। শস্যাদি খাইয়া মানবগণ জীবনধারণ করে বলিয়া মানবজন্ম পাইতে হইলে, সাধারণতঃ শস্য-সংশ্লেষ (স্থাবরসংশ্লেষ) ব্যতীত উপায় নাই। ব্যাঘ্রাদি গবাদি পশু হনন

করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে বটে, কিন্তু গবাদি ত শস্যাদি ভোজনেই বাঁচিয়া থাকে। স্বর্গভ্রষ্ট পুরুষও স্থাবরসংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্থাবর আশ্রয় করিয়া শস্যের ভিতর দিয়া, রক্তের মধ্য দিয়া ক্রমে শুক্রকীটরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যোগিকুলে, রাজকুলে, চণ্ডালবংশেই জন্মলাভ হউক, আর পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীবরূপেই উৎপন্ন হউক, স্থাবরসংশ্লেষ পাইতেই হইবে।

প্রথম শস্যের ভিতর দিয়া জীবশরীরে প্রবেশ, তৎপরে রক্তরূপে পরিণতি, পশ্চাৎ শুক্রকীটরূপে প্রথম বিকাশ, তৎপরে শুক্র-লোহিত-সংসর্গিত হইয়া মানবাদি জন্মলাভ। স্বর্গভ্রষ্টমাত্রেই মানব হইয়া জন্মে। কারণ, যাঁহারা পারলৌকিক পুণ্যফলে স্বর্গভোগ করিলেন, তাঁহাদের ঐহিক পুণ্যও অবশ্যই থাকিবে। কারণ, পুণ্যবান্ পুণ্যই করেন, তন্মধ্যে কতকগুলি পারলৌকিকার্থ, কতকগুলি ঐহিকার্থ থাকিবেই। স্বর্গভ্রষ্ট পুরুষ উৎকৃষ্ট যোনিই পাইয়া থাকেন; অপকৃষ্টযোনি সাধারণতঃ প্রাপ্ত হন না। স্থাবরসংশ্লেষ জীবরূপে জন্মিবার দ্বার। স্থাবরসংশ্লেষ ভোগের জন্য নহে। স্বর্গভ্রষ্ট পুরুষের স্থাবরসংশ্লেষলাভ কেবল মানবজন্মগ্রহণের জন্যই হইয়া থাকে। স্থাবরসংশ্লেষ জন্মের দ্বার, স্থাবর জন্ম বা স্থাবরযোনিলাভ ভোগের জন্য। স্থাবরদেহপ্রাপ্তির নাম স্থাবর জন্ম। স্থাবরদেহে সংলগ্নবৎ অবস্থিতির নাম স্থাবরজন্ম।

বলিয়াছি, যাহারা মহাপাপের ফলে নরকে লিঙ্গদেহে মানসদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদেরই ঐহিক পাপের ফলে মর্ত্ত্যে স্থাবরযোনিলাভ। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম পাপফল প্রস্তরাদি জন্ম; নিকৃষ্টতর পাপফল বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ; নিকৃষ্টপাপ চাণ্ডালাদি মনুষ্য, পশু পক্ষী। নিরন্তর জন্মমৃত্যুশীল ক্ষুদ্রজন্তু কীটপতঙ্গাদিও নিকৃষ্টতর পাপের ফল।

কায়িক মহাপাপে প্রস্তরাদি, বাচিক মহাপাপে পশুবৃক্ষাদি। মানবকৃত পাপের ফলেই প্রস্তরাদি ও বৃক্ষাদি জন্ম। স্থাবরাদি জন্মে মানবকৃত কর্ম্মের ভোগক্ষয় করিয়া যাইতে হয়। পাপের ফল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দারুণ যন্ত্রণালাভে পাপের ক্ষয়।

আর স্থাবর সংশ্লেষে যদি স্থাবর জন্মের মত জীবকে কষ্ট পাইতে হয়, তাহা হইলে স্বর্গসুখ কে চাহিবে? মুমুক্ষুর নিকট মুক্তির তুলনায় স্বর্গসুখ নিকৃষ্ট ও

হেয় বলিয়া সংসার তুলনায় বা স্থাবরাদি জন্ম তুলনায় যে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পশুবৃক্ষাদি জন্মে কৃতকর্ম্মেরই ভোগ হয়, নূতন করিয়া তত্তজ্জন্মে আর পাপপুণ্য সঞ্চিত হয় না। যে মানবজন্মে কেবলই পাপসঞ্চয়ই করিয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা পশুপক্ষিজন্ম ভালই বলিতে হইবে। কারণ, পাপী পাপফল ত ভোগ করিতেছেই, উপরন্ত আরও পাপ লইয়া যাইতেছে। পশুপক্ষ্যাদিরা কৃত পাপের ক্ষয়ই করিয়া যাইতেছে, নূতন পাপ আর লইয়া যাইতেছে না। তবে পুণ্যবান্ হউক পাপাত্মাই হউক, যদি মানবজন্ম পাইয়া কৃতকর্ম্মের ক্ষয় ও পুণ্যকার্য্য সঞ্চয় করিতে পারে, তবেই মানবজন্ম সফল। মানবজন্মে পুণ্যসঞ্চয়ক্ষমতা আছে বলিয়াই মানবজন্ম শ্রেষ্ঠজন্ম। দাঁড়াইল পারলৌকিক উৎকট পাপের ফলে নরকভোগ। ঐহিক উৎকট পাপের ফলে বৃক্ষপ্রস্তরাদি স্থাবর জন্মলাভ।

"শারীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ"

ঐহিক শারীরজ পাপের ফলেই স্থাবরযোনিপ্রাপ্তি।

মানব মনে করিলে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারে, আবার নরকের পথও সাফ করিতে পারে, পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-প্রস্তরাদি জন্মলাভের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে পারে। এইরূপ ক্রিয়মাণ কর্ম্মে মানবের স্বাধীনতা আছে, তাই মানব ভগবানের প্রিয়তম সন্তান। পশু-পক্ষ্যাদি, বৃক্ষপ্রস্তরাদি জন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম্মেও কোন স্বাধীনতা নাই। গবাদি পশু ধান্য নষ্ট করিলে তাহার দণ্ড গোস্বামীকেই পাইতে হয়।

প্রৌঢ়। অবশ্যই বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি কষ্টকর যোনি হইতে উদ্ধারের নিয়মিত পরিমাণকাল আছে। নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মানব মনে করিলে একটু সত্বর অব্যাহতি দিতে পারে?

পণ্ডিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে অব্যাহতি ত সাধারণের পক্ষে ব্যবস্থিতই আছে। তবে এমন কোন প্রক্রিয়া নাই, এমন কোন শক্তি নাই যে, একটু সত্বর সেই অব্যাহতি লাভ না হইতে পারে, এমন নহে। যজ্ঞে যে পশুবলি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা ঐ নির্দ্দিষ্টকালের সমাপ্তির পূর্ব্বেই অব্যাহতি দিবার জন্য। যজ্ঞে হত পশু একজন্মেই তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের সমস্ত সাজা শেষ করিয়া আবার স্বানুরূপ মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির প্রতিষ্ঠার দ্বারা, প্রস্তরাদির

প্রতিষ্ঠার দ্বারা ও দেবমূর্ত্তিগঠনাদি দ্বারা পাপের ফল যে শেষ হয়, তাহা শাস্ত্র-মাহাত্ম্যে আমরা জানিতে পারি।

প্রৌঢ়। ইহা কিন্তু বিশ্বাসের কথা।

পণ্ডিত। দেখ, অতীন্দ্রিয় পরোক্ষতত্ত্ব প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। মানবের পরিচ্ছিন্ন লৌকিকবুদ্ধির আয়ত্তে ইহা আইসে না। অপৌরুষেয় শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণবৎ মানিয়া, শ্রুত্যনুকূল সংহিতা-পুরাণ-তন্ত্রাদিকে অনুমান-প্রমাণবৎ স্বীকার করিয়া, ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষের বাক্য সত্য ও অভ্রান্ত জানিয়া এইগুলি প্রথমতঃ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে উচিত। তবে এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যতটা যুক্তি ও অনুভবের অনুকূল হইতে পারে, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। আমরা যদি অনুকূল যুক্তি খুঁজিয়া না পাই, আমরা যদি সুগভীর অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব অনুভব-বিষয়ীভূত করিতে না পারি, তাহা হইলেই যুক্তি নাই, অনুভূতি নাই বলা চলে না। আর ইহা আমাদেরই অজ্ঞতা, আমাদেরই অনবধানতা, আমাদেরই দুরদৃষ্টদোষ বলিতে হইবে, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতীত কাহারও শাস্ত্র অধ্যয়নে আগ্রহ জন্মে না; শ্রুতিসহকৃত যুক্তির অনুকূলে আসিতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আন্তরিক সচেষ্ট হইতেও দেখা যায় না। মাত্র অনুভূতিকে প্রমাণ বুঝিয়া, স্বকপোল-কল্পিত যুক্তির অনুসরণ করিয়া অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

সভাভঙ্গ হইল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকগণ অধ্যাপকপ্রবরকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া সকলে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের অনেকদিনের সন্দেহ আজি নিরাকৃত হইল, জ্ঞানের একটি দিকের আবরণের কিঞ্চিদংশও আজ অপসারিত হইল। তৃপ্ত, আহ্লাদিত প্রৌঢ়ের দল বিজয়গর্ব্বে উল্লসিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। অধ্যাপকের প্রশংসা সারা গ্রাম তোলপাড় করিয়া দিল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী (কাব্যতীর্থ)

সিন্ধুকূলে।

উত্তাল-তরঙ্গময় সিন্ধুকূলে একা
নীলিমার পরপারে চেয়ে অনিমেষে
কে যেন আসিতে বলে, পাব কার দেখা
তুলিয়া ধরিবে হাতে যদি যাই ভেসে।
সুদীর্ঘ দিবস গত সন্ধ্যার আঁধার—
কে জানে ঘেরিবে আসি মুহূর্ত্তে কখন্,
মনে ভাবি সিন্ধুপানে চাহি বার বার
কখন্ তাহার আমি পাব দরশন।
অবসন্ন দেহভারে শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রাণে
দিবসের কার্য্য-লিপি করিয়া লিখন,
অনন্ত বিশ্রাম আশ—চির-অন্তর্ধানে
পশ্চাতে টানিছে কিন্তু মায়ার বন্ধন,
কি কাজ সে পাছু ফিরে চাহিব না আর
সে আসিয়া লয়ে যাবে মহাসিন্ধুপার।

শ্রী + +

কবিকথা।

(ভবভূতি)

মালতী-মাধব।

(৯)

সৌদামিনী কামন্দকীর পূর্ব্ব-শিষ্যা, তিনি শ্রীপর্ব্বতে যোগানুষ্ঠান করিতেন, কপালকুণ্ডলা মালতীকে তথায় লইয়া গেলে, সৌদামিনী তাঁহার হস্ত হইতে সেই সরলপ্রাণার উদ্ধারসাধন করেন। এক্ষণে মাধবকে আনিয়া মালতীর সহিত মিলনের জন্য তিনি আকাশমার্গে পদ্মাবতী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাধবের রচিত বকুলমালাগাছিও ছিল।

গিরি, নগর, গ্রাম, নদী ও অরণ্য সকলের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে সৌদামিনী পদ্মাবতীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, ও দেখিতে লাগিলেন যে, পদ্মাবতী নীলস্বচ্ছতোয়া ও বিশালকায়া। সিন্ধু ও পারার বেষ্টনচ্ছলে যেন উত্তুঙ্গ সৌধ, দেব-মন্দির, পুরদ্বার এবং অট্টালিকাদির সংঘর্ষণে বিদীর্ণ ও অধঃপতিত অন্তরীক্ষ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার ললিত তরঙ্গভঙ্গে লবণাম্বুও শোভা পাইতেছে, মেঘোদয়ে গর্ভবতী গাভীকুলের প্রিয় শ্যাম তৃণে আচ্ছন্ন তাহার সুখদ সমীপবন-পংক্তি লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। রসাতল-বিদারক সিন্ধুর তটপ্রপাতও তাঁহার লক্ষ্য হইতে লাগিল। তাহার তুমুলধ্বনি জলগর্ভ গম্ভীর নবঘন-গর্জ্জনের ন্যায় প্রচণ্ড, সীমান্তে স্থিত ভূধর-নিকুঞ্জে প্রতিহত হইয়া সেই শব্দ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, যেন তাহাকে হেরম্ব-কণ্ঠ-ধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছে।

চন্দন, অশ্বকর্ণ, বকুল, পাটলাদি তরুরাজিতে গহন, পক্ক বিল্বফলের গন্ধে সুরভিত, অরণ্য-গিরিভূমি সকল তরুণ কদম্ব জম্বুপ্রভৃতি বৃক্ষে গাঢ়ান্ধকারময় নিকুঞ্জ-বেষ্টিত গহ্বর-নিচয়ে প্রতিহত গোদাবরী-গুঞ্জনে মুখরিত দক্ষিণ-অরণ্য-ভূধরগুলি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

সিন্ধু ও মধুমতীর সঙ্গম-স্থল পবিত্র করিয়া যে ভগবান্ ভবানীপতি স্বয়ম্ভূ

সুবর্ণ-বিন্দু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারও মন্দিরচূড়া সৌদামিনীর নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তখন ভক্তি সহকারে সেই দেবাদিদেব, ভুবনভাবন, ভগবান্, নিখিল-নিগম-নিধি, চারু-চন্দ্রশেখর, মদনান্তক, আদিগুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার জয় গান করিলেন।

কিছুদূর গমন করিলে বিশাল শিলামণ্ডিত গিরিবর তাঁহার নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহার উত্তুঙ্গ সানুদেশ অভিনব মেঘজালে শ্যামল দেখাইতেছিল। তথায় হৃষ্ট ময়ূর-ময়ূরীগণ অবিচ্ছিন্ন রবে চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। বিচিত্র পক্ষিগণের বাসে কুলায়স্বরূপ বৃক্ষশ্রেণীতে তাহা স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। আবার গহ্বরস্থিত তরুণ ভল্লুকগণের প্রতিশব্দগম্ভীর, নিষ্ঠীবনযুক্ত আরাব সকল একটি মিলিতধ্বনি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছিল। গজ-বিদলিত শল্লকী-বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি সকলের রসোত্থিত শীতল কটু ও কষায় গন্ধের মিলনও অনুভব হইতেছিল।

সে সময়ে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হওয়ায় পত্রহীন গামারী বৃক্ষ হইতে টিটির পাখী-গুলি সোনালী তরুর নবোদ্গত পত্রচ্ছায়ে ছুটিয়া চলিতেছিল, তীরস্থিত তেঁতুল বৃক্ষের শিরশ্চুম্বন করিয়া পানকৌড়ি সকল জলাশয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছিল; ডাক পক্ষিগণ গাব গাছের কোটরে লীন হইয়া রহিতেছিল; লতাকুলায়ে বসিয়া কপোতনিচয় কূজন করিতেছিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষতলে বন্য কুক্কুটের দল কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

সৌদামিনী তখন মাধবের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধব সে সময়ে মালতীবিরহে পরিচিত স্থানসকল দেখিতে অশক্ত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত বৃহদুপত্যকাশোভিত পর্ব্বতের বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মাধবের অবস্থা দেখিয়া মকরন্দ সকরুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছিলেন,—"মন, তাঁহাকে পাইবার আশা আশ্রয় বা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু সে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া এক্ষণে মোহরূপ গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছে। বিধি বাম, কাজেই প্রতীকারে অশক্ত পশুর ন্যায় বার বার কেবলই বিপদে পড়িতেছি।"

মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়ে মালতি, তুমি কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে, কিরূপে এত শীঘ্র তোমার অবসান ঘটিল? কিছুই জানিতে পারিলাম না। নির্দ্দয়ে, প্রসন্না হও, আশ্বাস দাও, মাধব তোমার প্রিয়, কিন্তু তাহার প্রতি স্নেহ দেখাইতেছ না কেন? সেই আমি—যাহাকে তোমার কমনীয় মঙ্গলসূত্র-ভূষিত মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের ন্যায় করটি নিজেই আনন্দিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

তাহার পর মকরন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, আমি যাহা লাভ করিয়াছিলাম, জগতে সেরূপ স্নেহ দুর্লভ। নবকুসুমসুকুমার অঙ্গে অবিরতপ্রমাথী প্রতিক্ষণ দারুণ মদনজ্বর সহ্য করিয়া তিনি তৃণের ন্যায় প্রাণপরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন, আবার করার্পণসাহসও দেখাইলেন। ইহার পর আর কি বলিব? বিবাহের পূর্ব্বে আমার প্রতি নিরাশ হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিকলকর ও মর্ম্মচ্ছেদব্যথায় কাতর তাঁহার রোদনধ্বনি স্নেহাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আমাকে যেরূপ পীড়া-তরঙ্গিতচিত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা অবশ্য তোমার স্মরণ হয়। আহা! গাঢ়োদ্বেগে হৃদয় বিদলিত হইতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে না; বিকল দেহভার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য হারাইতেছে না। অন্তর্দাহে অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত করিতে পারিতেছে না। মর্ম্মচ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু জীবনসূত্র ত ছিন্ন হইতেছে না।"

মাধবের ভাব দেখিয়া মকরন্দ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন মাধবকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বয়স্য, তপনদেব দারুণ দৈবের ন্যায় অবাধে তোমাকে দগ্ধ করিতেছেন। তোমার শরীরের অবস্থাও এইরূপ, তাই বলিতেছি, এস, এই পদ্মসরসীর নিকট কিছুকাল উপবেশন করি।"

সে সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মকরন্দ মাধবকে সরসীটি দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"উন্মালবালকমলচয়ের মকরন্দক্ষরণে মিশ্রিত ও পুষ্ট গন্ধ বহন করিয়া, আন্দোলিত তরঙ্গ-কণাতুষারে মন্দগতি সমীরণ তোমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে।"

তাহার পর উভয়ে অগ্রসর হইয়া উপবেশন করিলে মকরন্দ মাধবের চিত্ত অন্যদিকে লইয়া যাওয়ার ইচ্ছায় বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, মদমত্ত মল্লিকাক্ষ রাজহংসের পক্ষপবনে প্রকম্পিত চঞ্চলনাল শ্বেতপদ্মে ও নীলোৎপলে

পরিশোভিত এই সরোবরের শোভাময় অংশগুলি অশ্রুধারার পরিপতন ও পুনরুদ্গমনের অন্তরালে একবার দেখিয়া লও।”

মাধব কিন্তু উৎকণ্ঠিতভাবে উঠিয়া পড়িলেন, তাহা দেখিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—“এ কি, আমার কথা লক্ষ্য না করিয়া বয়স্য যে অন্যদিকে যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।”

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মকরন্দও উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“সখে, প্রসন্ন হও, দেখ, দেখ, নিকুঞ্জ-ভূষিত নির্ঝরিণীর বেতসকুসুমবাসিত সলিলরাশি কেমন বহিয়া যাইতেছে। তটে যূথিকাপুষ্পের মুকুল সকল কেমন বিকসিত হইয়াছে। আর প্রস্ফুটিতকুটজ-কুসুমহাসে শোভিত গিরিশৃঙ্গে সানুদেশ আশ্রয় করিয়া মেঘজাল ময়ুরের নৃত্যের জন্য যেন চন্দ্রাতপ হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাসমূহ বিকসিত হইয়া পরস্পর পৃথক্ হওয়ায়, কদম্বতরুসকল শোভাশালী দেখাইতেছে। তাহারা গিরির প্রান্ত-দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, দিক্-সকল মেঘমালায় শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। প্রবাহিণীর তীরভূমি প্রস্ফুটিত অঙ্কুরে ভূষিত কমনীয় কেতকীবৃক্ষে শোভিত হইয়া আছে, বনস্থলীও শিলীন্ধ্র ও লোধ্র কুসুমের বিকাশচ্ছলে যেন হাস্য করিতেছে।”

মাধব উত্তর দিলেন,—“সখে, দেখিতেছি বটে, কিন্তু অরণ্য-গিরি-ভূমি সকল এক্ষণে কষ্ট করিয়া দেখিলেই রমণীয় বোধ হয়, তাহাতেই বা কি?”

তাহার পর অশ্রুমোচন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—“অথবা আর কি হইতে পারে? উৎফুল্ল অর্জ্জুন ও শালপুষ্পের গন্ধে বাসিত, প্রবল পূর্ব্ব-বায়ুর আন্দোলনে বিক্ষিপ্ত, ইন্দ্রনীলমণিপুঞ্জসম জলদজালে ভূষিত, ধারাসিক্তা ভূমি-গন্ধে সুরভিত এবং গ্রীষ্ম ও শৈত্যের বিগমাগমের মিশ্রণে সুশোভিত, দিবস-গুলিও মনোরাজ্য অধিকার করিতেছে দেখিতেছি। হা প্রিয়ে মালতি, তরুণ-তমালের ন্যায় সুনীল মেঘমালায় আচ্ছন্ন, শীতল সমীরণে কম্পিত, নব বারি-কণায় পূর্ণ, ইন্দ্রধনুঃশোভিত, মদকল-ময়ুর-রবে মুখরিত দিক্সকলের প্রতি এক্ষণে কেমন করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব?”

এই বলিয়া মাধব শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন, ও সংজ্ঞা হারাইলেন। তাহা দেখিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—“হায়, বয়স্যের এক্ষণে অতি দারুণ দশা-পরিণাম ঘটিল!”

পরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি বলিলেন,—"বজ্রময় আমি কিনা আবার বিনোদনব্যাপার আরম্ভ করিলাম।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের মাধবের প্রতি আশা শেষ হইল!"

সভয়ে মাধবের অবস্থা দেখিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! সখা যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন!"

তখন চারিদিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মালতি, মালতি, কি আর বলিব, তুমি অত্যন্ত নির্দ্দয়া হইয়া উঠিয়াছ, গুরুজনদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া তুমি ইঁহার আশায় সাহস অবলম্বন করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার সেই নিরপরাধ প্রিয়জনের প্রতি এরূপ নির্দ্দয় কোপ করিতেছ কেন? কি! এখনও চৈতন্য হইল না? হায়! বিধাতা আমার সমস্তই অপহরণ করিলেন। মা গো মা, আমার হৃদয় বিদলিত হইতেছে, দেহের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, জগৎ শূন্য দেখাইতেছে, অবিরত জ্বালায় অন্তরে জ্বলিয়া মরিতেছি, অন্তরাত্মা বিধুর ও অবসন্ন হইয়া অন্ধতমে যেন নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, প্রবল মোহে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে। মন্দভাগ্য আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বন্ধু-সমূহের হৃদয়ে যিনি কৌমুদী-মহোৎসব, মালতী-নয়নের যিনি মুগ্ধচন্দ্রমা, সেই মকরন্দের আনন্দবর্দ্ধক জীবলোকতিলক অদ্য লীন হইতে চলিলেন। হা বয়স্য মাধব, যে তুমি আমার অঙ্গে চন্দনরস, চক্ষে শারদেন্দু, হৃদয়ে আনন্দস্বরূপ ছিলে, সেই স্বভাবমুগ্ধ তোমাকে কাল আমার জীবনের ন্যায় উন্মূলিত করিতেছে, হায়, আমি হত হইলাম।"

অবশেষে মাধবকে স্পর্শ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অকরুণ, স্মিতজ্বালা দৃষ্টি বিতরণ কর; অতি দারুণ, আমার সঙ্গে কথা কও; মকরন্দ তোমার প্রিয়, কিন্তু সেই অনুরক্তচিত্ত সহচরকে উপেক্ষা করিতেছ কেন?"

ক্রমে মাধবের সংজ্ঞা আসিল, তখন উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে সুনীল নবজলধরের বারিকণাসেকে আমার প্রিয়বয়স্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন, ভাগ্যে তাঁহার নিরুদ্ধশ্বাস বিমুক্ত হইল।"

মাধব কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"এই বনমধ্যে এক্ষণে কাহাকে দূত করিয়া প্রিয়ার নিকট পাঠাই? এই যে পক্কফলে শ্যাম, জম্বু-

নিকুঞ্জ হইতে স্খলিত স্বল্পতরঙ্গা নদীর উত্তরদিকে ও তাহার উপরে বিবিধ আকারে লম্বিত, প্রবীণ তমালের ন্যায় সুনীল নবজলধর, গিরিশিখর আশ্রয় করিয়া আছে দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঊর্দ্ধমুখে মেঘকে লক্ষ্য করিয়া করযোড়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সৌম্য, তোমার প্রিয়সহচরী বিদ্যুৎ তোমাকে আলিঙ্গন করে কি না? প্রণয়ে প্রসন্নবদন চাতকেরা তোমার আরাধনা করে ত? পূর্ব্ব-সমীরণ সংবাহনাদি ক্রিয়ায় সুখোৎপান করিয়া থাকে কি না? ইন্দ্রধনু চারিদিকে শোভাবিস্তার করিয়া তোমার চিহ্ন প্রকাশ করে ত?"

সেই সময়ে মেঘমন্দ্রে ভূধরকন্দর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, ময়ূরগণ তাহাতে আনন্দিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া কেকারব করিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া মাধব মনে করিলেন, মেঘ তাঁহার কথার উত্তর দিতেছে। তখন তিনি তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্ জীমূত, যদি স্বেচ্ছায় জগতে বিচরণ করিতে করিতে দৈবাৎ আমার প্রিয়তমাকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে প্রথমে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিও, তাহার পর মাধবের অবস্থার কথা বলিও। এই সব বলিবার সময় যেন তাঁহার আশাতন্তু ছিন্ন হইয়া না যায়। কারণ, একমাত্র তাহাই সেই বিশালাক্ষীকে কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখিতেছে।"

মেঘ চলিতে আরম্ভ করিল, মাধব তখন সহর্ষে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! উন্মাদ-রাহু শেষে মাধবচন্দ্রকে অভিভূত করিল? হা তাত, হা মাতঃ, হা ভগবতি, রক্ষা কর, মাধবের অবস্থা একবার দেখ।"

মাধব বলিতেছিলেন,—"প্রসাদে ধিক্, অভিনব লোধ্রকুসুমে প্রিয়ার কান্তি, কুরঙ্গীগণে নয়নভঙ্গি, গজরাজে গতিবিলাস, এবং লতাসকলে নম্রতা রহিয়াছে দেখিতেছি। বোধ হয়, এই বনমধ্যে সকলে তাঁহাকে বিভাগ করিয়া লইয়াছে।"

সঙ্গে সঙ্গে 'হা প্রিয়ে মালতি' বলিয়া তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মকরন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হত হৃদয়, যে সুহৃদ্ অশেষ গুণের আধার, প্রিয়তম ও জীবনের অবলম্বনস্বরূপ, যাঁহার সহিত শৈশবের ধূলিখেলা হইতে প্রগাঢ় মিত্রতা জন্মিয়াছে, তাঁহাকে প্রিয়া-বিরহ-বেদনায় কাতর দেখিয়া তুমি বিদীর্ণ হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইতেছ না কেন?"

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"জগতে বিধাতার নির্ম্মিত বস্তুতে অনুকরণ দুর্লভ নহে, তাহাই হউক. এক্ষণে আমি ভূধরারণ্যবাসী প্রাণিগণকে প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, তোমরা মুহূর্ত্তকাল আমাকে অবধানদানে অনুগৃহীত কর। আমি বলিতেছি, তোমরা এখানে থাকিয়া, সর্ব্বাঙ্গে স্বভাবসুন্দরী কোন কুলবধূকে দেখিয়াছ কি? অথবা তাঁহার কি হইয়াছে জান? তাঁহার বয়সের কথা বলি, শুন। মদন তাঁহার মনোমধ্যে প্রগল্‌ভতা আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অঙ্গে সরল বালভাবই দেখাইতেছেন।"

কাহারও উত্তর না পাইয়া হতাশ-হৃদয়ে মাধব বলিতে লাগিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, তাণ্ডব-নৃত্য করিতে করিতে ঊর্দ্ধপুচ্ছ ময়ূর কেকারবে আমার কথাটি আচ্ছন্ন করিয়া দিল! অন্তরানন্দে বিহ্বল ও মদালস-লোচন চকোর কান্তার অনুসরণ আরম্ভ করিল! কৃষ্ণমুখ বানর কুসুমরেণুতে তাহার প্রিয়ার কপোলদেশ চিত্রিত করিয়া তুলিল! কাহার কাছেই বা যাজ্ঞা করি? কোন স্থলেই যাজ্ঞার অবসর ঘটে না।"

তাহার পর তিনি বনভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, একস্থানে একটি লোহিতমুখ বানর পক্ব ও বিদীর্ণ দাড়িম্বফলের ন্যায় অধররাগে রঞ্জিত দশনাবলি-ভূষিত এবং রোচনিকাকুসুম তুল্য পাণ্ডু গণ্ডে শোভিত প্রিয়ার বদনটি উন্নত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

অন্য স্থানে বটবৃক্ষের স্কন্ধে নিজ স্কন্ধ ও প্রিয়তমার স্কন্ধে শুণ্ডটি রাখিয়া কোন ধন্য বন্যগজ দন্তাগ্রে স্পর্শনিমীলিতাক্ষী সহচরীর অঙ্গ কণ্ডূয়ন, পর্য্যায়ক্রমে নিক্ষিপ্ত কর্ণযুগলের সুখদ পবনে বীজন, এবং অর্দ্ধভুক্ত নবশল্লকীকিসলয় তাহার মুখে প্রদান করিয়া পরিচয়প্রগল্‌ভতা অভ্যাস করিতেছিল। সেখানে অবসর আছে বলিয়া মাধবের মনে হইল না।

আর একদিকে একটি করী মেঘমন্দ্র শুনিয়াও গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল না, নিকটস্থ সরোবর হইতে শৈবাল আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতেছিল না। গণ্ডস্থলের মদস্রাবের অভাবে নীরব মক্ষিকাকুলে তাহার মুখটিতে দীনভাবই লক্ষিত হইতেছিল। সুতরাং প্রিয়তমা-বিরহে কাতর মনে করিয়া মাধব তাহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন না।

অন্য একটি মত্ত মাতঙ্গ-যূথপতি সেই সময়ে সরোবরে অবগাহন করিয়া বিহার

করিতেছিল। তাহার মধুর গম্ভীর গর্জ্জন শুনিয়া সহচরীটি আনন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। সে নব-বিকসিত অসংখ্য কদম্ব-পুষ্পের ন্যায় সুরভি ও শীতল গন্ধে পূর্ণ গণ্ডস্থল হইতে ক্ষরিত মদধারায় সরোবরটিকে পঙ্কিল ও কষায় করিয়া তুলিতেছিল; পদ্ম, পদ্মপত্র, মৃণাল, কন্দ প্রভৃতি তুলিয়া ফেলিতেছিল। তাহার অবিরত কর্ণ-সঞ্চালনে জলকণা নীহারের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে সারস, উৎক্রোশ প্রভৃতি জলচর পক্ষী উড়িয়া পলাইতেছিল।

মাধব ইহারই যৌবনের শ্লাঘা করিতে লাগিলেন, এবং ইহার কান্তা-সেবার চাতুর্য্যও লক্ষ্য করিলেন। হস্তীটি তখন লীলাচ্ছলে উৎপাটিত মৃণালস্তম্ব গ্রাস-স্বরূপে প্রদান করিয়া বিকসিত-পদ্ম-সুবাসিত জলগণ্ডূষ বধূর মুখমধ্যে ঢালিয়া দিতেছিল, আবার শুণ্ড দ্বারা জলকণা বর্ষণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু স্নেহভরে বধূর মস্তকে সরস-নালযুক্ত নলিনীপত্রের ছত্রটি ধারণ না করায় মাধবের মনে তাহাকে কিছু অরসিক বলিয়া বোধ হইল; এবং তাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি তাহাই বলিলেন।

হস্তী কোন উত্তর না দেওয়ায়, মাধব মনে করিলেন, সে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! আমি কি মূর্খ, এই বনচরটার সহিত বয়স্য মকরন্দের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি! হা প্রিয়-বয়স্য! তোমা বিনা একাকী আমার এই জীবনধারণ-দুঃখে ধিক্! যে সৌন্দর্য্যে তোমার উপভোগভাব বা তাহার অভিব্যক্তি নাই, তাহাকে ধিক্! তোমার সহিত যে দিবসটি উজ্জ্বল না হয়, তাহার ধ্বংস হউক, তোমা বিনা অন্যস্থানে যে প্রমোদমৃগতৃষ্ণিকা জন্মে, তাহাকেও ধিক্!"

সে কথা শুনিয়া মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"উন্মাদ-মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়াও দেখিতেছি, কোন একটি উদ্বোধকে বয়স্যের সহজস্নেহসংস্কার জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই আমাকে অসন্নিহিত মনে করিতেছেন।"

তাহার পর তিনি মাধবের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"এই যে মন্দভাগ্য মকরন্দ তোমার পার্শ্বেই রহিয়াছে।"

মাধব কহিলেন,—"প্রিয়-বয়স্য, আলিঙ্গনদানে আমাকে কৃতার্থ কর, মালতীর ত আর আশা নাই, আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতে মাধব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, মকরন্দ তাঁহার

জীবনের অবলম্বনস্বরূপকে কৃতার্থ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, আমার আলিঙ্গনের উৎকণ্ঠা জন্মিতে না জন্মিতে সখা সংজ্ঞা হারাইলেন। তাহা হইলে আর কিসের আশা? নিশ্চয়ই বয়স্য জীবিত নাই। সখে, স্নেহভরে সন্তপ্ত হৃদয়, তোমার কখন্ কি ঘটিবে ভাবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যে অকারণ ভয় অনুভব করিত, আমার সে সমস্ত একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল! যে সকল মুহূর্ত্তে তোমাকে অসহ্য দুঃখে কাতর দেখিয়াও চেতন দেখিতাম, তাহারা বরং ভাল ছিল। এক্ষণে কিন্তু তোমার প্রস্থানে আমার নিকট দেহ ভারস্বরূপ হইয়া পড়িতেছে, জীবন বজ্রকীলকের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে, দিক্‌সকল শূন্য দেখাইতেছে। ইন্দ্রিয়-সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে, কাল কষ্টকর বোধ হইতেছে, এবং সমস্ত জীবলোক অন্ধকারময় হইয়া দাঁড়াইতেছে। তবে কি আমি মাধবের অস্তগমনসাক্ষী হইয়া জীবিত থাকিব? না, তাহা নহে, ঐ গিরিশিখর হইতে পাটলাবতীর বক্ষে পড়িয়া বয়স্যের মরণের পূর্ব্বে আমিই অগ্রসর হই।"

এই বলিয়া কিছু দূর গমন করিয়া আবার কাতর হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া মাধবকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই কি সেই নীলোৎপলদ্যুতি শরীর, যাহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই? আর যাহাকে উল্লসিত বিস্ময়ে পূর্ণ নবপ্রণয়-বিকাসে আকুলিত মালতীর দৃষ্টি পূর্ব্বে পান করিয়াছিল? আশ্চর্য্য! এই শরীরে নবীন বয়সে সমস্ত গুণের কিরূপে সন্নিবেশ হইয়াছিল? সখে মাধব, বিমল চন্দ্রমা যেইমাত্র পূর্ণ হইয়া উঠে, অমনি রাহু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে; ধারাবর্ষী মেঘ জাতমাত্রেই বায়ুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; তরুবর ফলবান্ হইতে না হইতে দাবানলে ভস্মীভূত হয়; তুমিও জগতের চূড়ামণি হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে? বয়স্য গত হইলেও তাঁহাকে একবার আলিঙ্গন করি, তিনিও এই আলিঙ্গনই চাহিয়াছিলেন।"

মকরন্দ মাধবকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন ও বলিয়া উঠিলেন,—"হা বয়স্য, বিমল বিদ্যানিধি, গুণগুরু, মালতীর নিজ-গৃহীত জীবিতেশ্বর, কামন্দকী-মকরন্দের আনন্দবর্দ্ধক মাধব, শেষ দশা-প্রার্থিত মকরন্দ-বাহুর আলিঙ্গন এখন হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিল। মকরন্দ মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিবে মনে করিও না;

কমলবদন, জন্মাবধি একসঙ্গে আমার সহিত জননীর স্তন্যপান করিয়া এক্ষণে একাকী যে তুমি বন্ধুগণের তর্পণ-জলে তৃপ্ত হইবে, তাহা অযুক্ত।”

তাহার পর মকরন্দ অতিকষ্টে মাধবকে ত্যাগ করিয়া গিরিশিখরে উঠিলেন, ও নিম্নে স্রোতস্বিনী পাটলাবতীকে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—“ভগবতি সাগরগামিনি, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যেখানে আমার প্রিয় সুহৃদ্ জন্ম-গ্রহণ করিবেন, সেখানে আমারও যেন জন্ম হয়; আর পরলোকেও যেন তাঁহার অনুচর হই।”

এই বলিয়া যেমন তিনি নদীবক্ষে পতিত হইবার উপক্রম করিবেন, অমনি সৌদামিনী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ও বলিয়া উঠিলেন,—“বৎস, সাহস পরিত্যাগ কর।”

মকরন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে এবং কি জন্য আমাকে নিবারণ করিতে-ছেন?”

সৌদামিনী বলিলেন,—“আয়ুষ্মন্, তুমি কি মকরন্দ?”

মকরন্দ উত্তর দিলেন,—“আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি সেই হতভাগ্য বটি।”

সৌদামিনী তখন কহিলেন,—“বৎস, আমি যোগিনী, এই দেখ, মালতীর অভিজ্ঞান আনিয়াছি।”

এই বলিয়া বকুলমালা দেখাইলেন, উচ্ছ্বসিত-প্রাণে ও করুণ-হৃদয়ে মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—“আর্য্যে, মালতী কি জীবিত আছেন?”

‘তাহাই বটে’ বলিয়া সৌদামিনী উত্তর দিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—“মাধবের কি কোন অত্যাহিত ঘটিয়াছে? অনিষ্টকর কার্য্যে তোমার নিশ্চয়তা দেখিয়া আমি কম্পিত হইয়া উঠিতেছি, মাধব কোথায়?”

মকরন্দ বলিলেন,—“আর্য্যে, আমি তাঁহাকে অচেতন দেখিয়া বৈরাগ্যভরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, চলুন, শীঘ্র গিয়া তাঁহার রক্ষার চেষ্টা পাই।”

দুইজনে তখন দ্রুতপদে মাধবের নিকটে ছুটিয়া চলিলেন। সে সময় বর্ষার শীতল বাতাস অঙ্গ স্পর্শ করিয়া মাধবকে চেতন করিয়া তুলিয়াছিল; তিনি আপন মনে বলিতেছিলেন,—“হায়! কে আবার আমার চৈতন্য আনিয়া

দিল? নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই নব জলধরের বারিবিন্দু-বর্ষণে প্রভঞ্জনই এই ব্যাপার ঘটাইয়াছে।"

মাধবকে দেখিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"ভাগ্যে বয়স্য চেতনা লাভ করিয়াছেন।"

সৌদামিনীও তাঁহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মালতী ইঁহাদের দুজনের আকৃতির কথা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই দেখিতেছি বটে।"

মাধব আবার পূর্ব্ব-বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগবন্ সমীরণ, তুমি জলগর্ভ মেঘরাজিকে ভ্রমণ করাও, চাতকদিগকে আনন্দিত করিয়া তুল, কেকারবে উদ্‌গ্রীব ময়ূরকুলকে নাচাইতে থাক, কেতকীবৃক্ষ কঠোর কর। আমার ন্যায় বিরহী জন কোনরূপে মূর্চ্ছালাভ করিয়া ব্যথা নিবৃত্তি করিতেছিল, তাহার আবার সংজ্ঞা-ব্যাধি জাগাইয়া—নির্দ্দয়! এ কি চেষ্টা করিতেছ?"

মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"অখিলপ্রাণীর জীবন পবনদেব ভালই করিয়াছেন।"

মাধব আবার বলিতে লাগিলেন,—"বায়ুদেব, তথাপি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, যেখানে আমার প্রিয়তমা আছেন, সেইখানে বিকসিত কদম্ব-কুসুমের রেণুর সহিত আমার প্রাণটিও লইয়া যাও, অথবা তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শে শীতল কোন একটি বস্তু আমাকে আনিয়া দাও। এক্ষণে তুমিই আমার গতি।"

এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পবনকে প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অভি-জ্ঞানদানের অবসর বুঝিয়া সৌদামিনী মাধবের অঞ্জলিতে বকুলমালাগাছি ফেলিয়া দিলেন। বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! আমার রচিত প্রিয়াবক্ষের আদরের বস্তু মদনোদ্যানের বকুল-কুসুমমালা যে।"

তাহার পর—বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সন্দেহ কেন? তাহাই বটে, কারণ, তাঁহার মুগ্ধ ইন্দুসুন্দর মুখখানি দেখিয়া অনুরাগে বিশৃঙ্খল কৌতূহল-গোপনের জন্য যে ভাগে পুষ্প-বিন্যাস ভাল করিয়া করিতে পারি নাই, অথচ তাহাতেই লবঙ্গিকার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাই ত দেখিতেছি।"

মালতী নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন মনে করিয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়ে মালতি, তুমি নিশ্চয়ই এ সব দেখিতেছ; কিন্তু আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না; আমার প্রাণ যেন পলায়ন করিতেছে, হৃদয়ের যেন ধ্বংস হইতেছে, অঙ্গ সকল জ্বলিয়া যাইতেছে, চারিদিক্ হইতে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এক্ষণে ত্বরারই বিষয়, পরিহাসের নহে। তাই বলিতেছি, নয়নের আনন্দ বিতরণ কর,—আমার প্রতি নির্দ্দয়া হইও না।"

মাধব চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মালতীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বকুলমালাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বকুল-মালিকা, তুমি প্রিয়তমার প্রিয়তমা ও উপকারিণী; সেই জন্য তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি; যখন পদ্মাক্ষীর মদন-বেদনা অপ্রতিহত ও দুঃসহ হইয়া দেহ দাহ করিত, তখন তোমারই স্পর্শ আমার আলিঙ্গন-স্বরূপে তাঁহার প্রাণত্রাণ করিয়াছে। আমি এখন তোমার সেই আনন্দ মিশ্রিত মদন-জ্বরের উদ্দীপক, গাঢ়ানুরাগ-রসযুক্ত, স্নেহাকর, আমার ও মুগ্ধাক্ষীর কণ্ঠে যাতায়াত অতিকষ্টে স্মরণ করিতেছি।"

এই বলিয়া মালাগাছি হৃদয়ে ধরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মকরন্দ তখন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"মকরন্দ, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না—কোথা হইতে সহসা মালতীর স্নেহ বহন করিয়া সেই বকুলমালাগাছি আসিয়া পড়িল? তুমিও কি মনে কর না যে, ইহা কোথা হইতে আসিল?"

মকরন্দ কহিলেন,—"এই আর্য্যা যোগেশ্বরী মালতীর অভিজ্ঞান লইয়া আসিয়াছেন।"

শুনিয়া মাধব সৌদামিনীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন ও করুণভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্যে! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমার প্রিয়তমা জীবিত আছেন কি না?"

সৌদামিনী উত্তর দিলেন,—"বৎস, আশ্বস্ত হও, সে কল্যাণী জীবিত আছে।"

উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে মাধব ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ব্যাপার কি বলুন।"

সৌদামিনী মাধবের অঘোরঘণ্টবিনাশের কথা বলিবামাত্র আবেগ-সহকারে মাধব বলিলেন,—"আর্য্যে, ক্ষান্ত হউন, সমস্ত ব্যাপারই বুঝিয়াছি।"

মকরন্দ তাহা কি জিজ্ঞাসা করিলে, মাধব উত্তর দিলেন,—"কপালকুণ্ডলার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।"

মকরন্দ তাহা সত্য কি না জানিতে চাহিলে, সৌদামিনী কহিলেন,—"বৎস যাহা বলিতেছে, তাহাই বটে।"

মকরন্দ তখন বলিতে লাগিলেন,—"সৌন্দর্য্য-বিকাশের জন্য কুমুদ-কুলের সহিত যদি শরদিন্দু-চন্দ্রিকার যোগ হইয়া থাকে, তাহা শোভন বটে; কিন্তু ইহা কি প্রকার যে, অকাল-মেঘরাজি তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া দিল?"

মাধব বলিতেছিলেন,—"হা প্রিয়ে মালতি, কি বীভৎস দশায় না জানি পড়িয়াছিলে! কমলমুখি, কপালকুণ্ডলাগ্রস্তা হইয়া, তুমি কেতু-কবলিতা চন্দ্রকলার ন্যায়ই হইয়া উঠিয়াছিলে। ভগবতি কপালকুণ্ডলে! বিধাতার এ সফল নির্ম্মাণ সাদরে পালন করিতে হয়। সেইজন্য বলি, রাক্ষসী হইয়া উঠিও না। জগতের কল্যাণময়ী হও। সুরভি কুসুমের মস্তকে স্থিতিই স্বাভাবিকী ও চির-প্রসিদ্ধা, তাহাকে মুসল দিয়া দলন করিতে নাই।"

শুনিয়া সৌদামিনী কহিলেন,—"বৎস, কাতর হইও না; কপালকুণ্ডলা অতি নিষ্করুণা বটে, আমি যদি বাধা না দিতাম, তাহা হইলে সে পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত।"

মাধব ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের প্রতি আর্য্যার যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিতেছি। কিন্তু আপনি আমাদের এরূপ বন্ধু হইলেন কিরূপে?"

'পরে জানিতে পারিবে' বলিয়া সৌদামিনী উত্তর দিলেন। তাহার পর তিনি ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে বলিতে লাগিলেন,—"গুরুসেবা, তপস্যা, তন্ত্রমন্ত্র ও যোগা-ভ্যাসে যে আক্ষেপিণী সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহাই তোমাদের মঙ্গলের জন্য বিস্তার করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি মাধবকে লইয়া আকাশপথে উঠিলেন, অমনি অন্ধকার ও বিদ্যুতের ভীষণ মিশ্রণ চক্ষুবৃত্তি অভিভূত করিয়া ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। সবিস্ময়ে ও সভয়ে চাহিয়া মকরন্দ মাধবকে দেখিতে পাইলেন না। তখন যোগেশ্বরীর মহিমা বুঝিয়া কিছু শান্ত

হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বিতর্ক করিয়া ইহা অর্থ কি অনর্থ স্থির করিতে পারিলেন না। প্রভূত বিস্ময়ে তিনি পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইলেন। আবার অভিনব শঙ্কাজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। এককক্ষণে মোহের নাশ, আবার পরক্ষণে তাহার উদয়ে তাঁহার চিত্ত আনন্দ ও শোকের মিশ্রণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিল।

অবশেষে গহন বনে তিনি কামন্দকীর নিকট এই ব্যাপার বলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কামন্দকী তখন সকলের সহিত মালতীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

স্পর্শ।*

(প্রিয়ার)

এ কি আনন্দ অথবা বিষাদ
এ কি সুখ? এ কি দুঃখ?
মানস-রাজ্যে কেবা আজ জয়ী?
কোন্ ভাব আজি মুখ্য?
জেগে না ঘুমায়ে? অথবা অঙ্গে
বিষ-সঞ্চার সদ্য?
কিসের মত্ত প্রবাহ অঙ্গে?
করেছি কি পান মদ্য?
সব ইন্দ্রিয় বিহ্বল করি
সংজ্ঞা করিছে লুপ্ত,
একই পরশ জাগাইছে পুনঃ
হরষে চেতনা লুপ্ত।

শ্রীকালিদাস রায়।

* উত্তররামচরিত হইতে।

স্পর্শ (সন্তানের) *

মম অঙ্গ-বিগলিত প্রমূর্ত্ত স্নেহের সার
প্রাণ মন জুড়াল মরি রে,
আমার চৈতন্য-ধাতু করি মূর্ত্তি পরিগ্রহ
প্রাদুর্ভূত হলো কি বাহিরে ?
আনন্দ-তরঙ্গাহত মম ক্ষুব্ধ হৃদয়ের
এ কি পূত অভিষ্যন্দ-ধারা ?
পরশে আমার অঙ্গে কে তাপ জুড়াল ঐ
অমৃতের রসস্রোতঃ দ্বারা।

শ্রীকালিদাস রায়।

সতী-লক্ষ্মী। (গল্প)

(১)

কলঙ্ক-কালিমা।

সে অনেক দিনের কথা। তখন ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট্‌গণেরই সম্পূর্ণ একাধিপত্য ছিল। যে সময়ের ঘটনা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, সে সময়ে প্রজাপ্রিয় নবাব গিয়াসুদ্দিন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন ঐতিহাসিকগণই আপন আপন ইতিহাসে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। ইহা যে আমার মত মূর্খেরই কল্পনা-প্রসূত উপকথা মাত্র, তাহা বোধ হয়, কোন পাঠক-পাঠিকাকে ব'লিয়া দিতে হইবে না।

* উত্তররামচরিত হইতে।

সে সময় বাঙ্গালা প্রদেশস্থিত কোন গ্রামে এক শূদ্র-পরিবারে তিন ভ্রাতা অবস্থান করিতেছিল। জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ, মধ্যম যদুনাথ ও কনিষ্ঠ শম্ভুনাথ। তাহাদের পিতামাতা তিন ভ্রাতারই বিবাহ দিয়া পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমের কয়েকটি ছেলে-মেয়েও হইয়াছিল। কিন্তু কনিষ্ঠ শম্ভুনাথের সন্তানাদি হয় নাই। তবে সে সময় তাহার স্ত্রী দুঃখিনীর পঞ্চমাস গর্ভ ছিল। দুঃখিনীর মা, দুঃখিনীকে অনেক দুঃখে প্রতিপালন করিয়াছিল বলিয়া মেয়ের ওরূপ নাম রাখিয়াছিল।

সংসারের অবস্থা সচ্ছল না হইলেও তিন সহোদরে নানারূপ কার্য্য করিয়া সংসারের ভরণ-পোষণ করিত। কিন্তু কুসংসর্গে মিশিয়া কনিষ্ঠ শম্ভুনাথের প্রকৃতি কলুষিত হইয়াছিল। সুরা ও বারবিলাসিনীর জন্য শম্ভুনাথ দৈনিক উপায়ের প্রায় সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিত। ইহার জন্য জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুনাথকে তিরস্কার করিত,—সময় সময় কলহও হইত। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হইত একমাত্র দুঃখিনীকে।

একদিন এইরূপ ভয়ানক কলহ হওয়ায়, শম্ভুনাথ বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। ভ্রাতারাও তাহার কোন অনুসন্ধান করিল না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া একমাস কাটিয়া গেল; কিন্তু শম্ভুনাথ বাড়ী ফিরিল না।

শম্ভুনাথের স্ত্রী দুঃখিনী, জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা বধূদ্বয়ের গলগ্রহ হইয়া পড়িল। তাহারা দুঃখিনীকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। তাহাকে অনাহারে রাখিয়া সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে কলহ করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখিনী স্বামীর কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, এক পাও বাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। অবশেষে জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা বধূ পরামর্শ করিয়া গ্রামমধ্যে দুঃখিনীর কলঙ্ক রটাইল। ঘরে, বাহিরে, মাঠে, ঘাটে সকলেই দুঃখিনীর চরিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিল। একদিন জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা বধূ সত্য সত্যই দুঃখিনীর মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপিয়া গলাধাক্কা দিয়া দুঃখিনীকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। রঘু ও যদু এই ব্যাপার দেখিয়া কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিল না।

(২)

কাননমাঝে।

দুঃখিনী কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রাম হইতে বহির্গত হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মনে মনে ভাবিল, "এ সময়ে পিত্রালয়েই গমন করি।" কিন্তু ঘৃণা ও লজ্জা, তৎক্ষণাৎ তাহার সে আশায় বাধা দিল। আবার ভাবিল যে, "আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত জ্বালার অবসান করি।" কিন্তু তখনই মায়ের উপদেশ তাহার কর্ণ-কুহরে ঝঙ্কার করিয়া বলিল,—আত্মহত্যা মহাপাপ—দুরন্ত নরকে তাহার জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দুঃখিনী ভাবিল,—'তাই তো, আত্মহত্যা করিলে পতিকেও পাইব না, কলঙ্কও ঘুচিবে না। বরং কলঙ্কটা লোকলোচনে যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, এবং পরিণামে ইহার চেয়েও নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। হা ভগবন্, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।' এই সমস্ত চিন্তা করিয়া দুঃখিনী গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া, এক অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন ভগবান্ অংশুমালী অস্ত যাইবার জন্য পশ্চিমাকাশের পাদমূলে আশ্রয় লইয়াছেন।

একে দুর্গম অরণ্য,—সন্ধ্যা হইতেও বিলম্ব নাই, নিকটেও কোন গ্রাম দেখা যাইতেছে না; সুতরাং দুঃখিনী এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পতিকে স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। নিকটস্থিত ঝোপের মধ্যে একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র নিদ্রা যাইতেছিল। সে দুঃখিনীর চীৎকারে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং দুঃখিনীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া দুঃখিনী "হা স্বামিন্! হা দেবতা!" বলিয়া ভূমিতলে অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

চৈতন্যলাভ হইলে পর দুঃখিনী দেখিতে পাইল, রাজপরিচ্ছদ বিভূষিত এক মুসলমান বীর তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, স্বীয় উত্তরীয়-বস্ত্র দ্বারা বাতাস করিতেছেন। অদূরে ব্যাঘ্রটি সুতীক্ষ্ণ শরাহত হইয়া নিস্পন্দ ও নিশ্চলা-বস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে। দুঃখিনী লজ্জায় মাথার কাপড় টানিয়া গাত্রোত্থান করিল।

মুসলমান বীর দুঃখিনীর ওরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দুঃখিনী কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত সকল কথাই প্রকাশ করিল। দুঃখিনীর কথা

শুনিয়া মুসলমান বীর বলিলেন,—"তুমি এ সম্বন্ধে আদালতে অভিযোগ করিলে না কেন ?"

দুঃখিনী বলিল,—"মহাত্মন্, আমি কাহার নামে অভিযোগ করিব ? সকলেই যে নিজের লোক। তদ্ভিন্ন আমার অদৃষ্টে যে কষ্ট আছে, তাহা ভোগ করিতেই হইবে। নতুবা পতি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন কেন ?"

মুসলমান বীর বলিলেন,—"মা, তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাকে থাকিবার জন্য স্থান দিব এবং তোমার ভরণ-পোষণ যোগাইব। তদ্ভিন্ন তোমার পতির অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করিব না। এক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আর এখানে থাকা উচিত নয়। তুমি আমাকে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করিবে না। আমি সর্ব্বদাই তোমাকে জননীর ন্যায় অবলোকন করিব। আমি বাঙ্গালার নবাব গিয়াসুদ্দিন।"

নবাব গিয়াসুদ্দিন কয়েকজন অনুচর লইয়া সে দিন ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রারম্ভে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি দুঃখিনীর রোদনধ্বনি শ্রবণানন্তর অনুচরদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে দুঃখিনীর নিকট উপস্থিত হন। সে সময় ব্যাঘ্রটি দুঃখিনীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। নবাব গিয়াসুদ্দিন ইহা নিরীক্ষণ করিয়া, ক্ষিপ্র হস্তে অব্যর্থ শর-সন্ধানে ব্যাঘ্রটিকে ধরাশায়ী করেন, এবং নিজ উত্তরীয়-বসন দ্বারা ব্যজন করিয়া, দুঃখিনীর চৈতন্য-সম্পাদনে সচেষ্ট হ'ন।

গিয়াসুদ্দিন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। দুঃখিনী তাঁহার মহত্ত্বের কথা অনেকদিন হইতেই লোকমুখে শ্রবণ করিয়া আসিতেছিল। আজ স্বচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, করুণাময় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, নবাব অনুচর-গণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দুঃখিনীর দুঃখের কাহিনীর পরিচয় দিতে দিতে রাস্তা অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

নবাব গিয়াসুদ্দিন রাজধানী পাণ্ডুয়া নগরে উপস্থিত হইয়া, দুঃখিনীর জন্য থাকিবার গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং অনুচর দ্বারা বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী আনাইয়া দুঃখিনীকে খাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। খাদ্য-সামগ্রীগুলি পাকের পর দুঃখিনী উহা পতি-দেবতাকে নিবেদন করিয়া,

প্রসাদ পাইল। নবাব ইহা অবলোকন করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

পুত্র-বলি।

এইরূপে সুখে দুঃখে দুঃখিনীর বৎসর কাটিয়া গেল। ৬।৭ মাস গত হইল, সে একটি পুত্র-সন্তানও লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে নবাব বাহাদুরও দুঃখিনীর পতি শম্ভুনাথের অনুসন্ধান করিতে চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু এ পর্য্যন্ত শম্ভুনাথের কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানের দৃষ্টি দুঃখিনীর উপর নিপতিত হইল। তাহারা দুঃখিনীর অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, দুঃখিনীর নিকটে আসিয়া কুপ্রস্তাব করিতে লাগিল, ও নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু দুঃখিনী সে দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া, তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। একদিন একজন দুর্ব্বৃত্ত এইরূপভাবে বিতাড়িত হইয়া, আরক্তিম-লোচনে দুঃখিনীকে বলিয়া গেল—"আচ্ছা, তুমি যে কেমন সতীলক্ষ্মী, তাহা দেখা যাইবে।"

একদা নবাব বাহাদুর দুঃখিনীর তল্লাস করিতে আসিলে, দুঃখিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার নিকট দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচারের কথা জানাইল। "তাহাদের নাম কি, তাহারা দেখিতে কেমন?" নবাব বাহাদুর ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, দুঃখিনী কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। কারণ, সে তাহাদের নামও জিজ্ঞাসা করে নাই, এবং তাহারা যে কেমন, তাহাও চক্ষু মেলিয়া দেখে নাই। অবশেষে নবাব বাহাদুর দুঃখিনীকে অভয় দিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বৈশাখ মাস। একদিন রাত্রিকালে গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ দুঃখিনী শিশু সন্তানটিকে কোলে লইয়া প্রাঙ্গণমধ্যে শুইয়া আছে। শুক্লাষ্টমীর অর্দ্ধ চন্দ্রমা আপনার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচল-ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। রজনী দেবী অমল-ধবল কৌমুদী-বসন পরিত্যাগ করিয়া, ঘন তিমিরাম্বরে বিভূষিতা হইলেন। জগৎ নিস্তব্ধ; কেবল মাঝে মাঝে ২।৪টি শৃগাল-কুক্কুরের বিকট নাদে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। একটু মৃদু সমীরণ-সংস্পর্শে দুঃখিনী

শিশু সন্তানটিকে কোলে লইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভুত হইয়াছে। সে স্বপ্নে দেখিতে লাগিল,—একজন নর-পিশাচ আসিয়া তাহার ক্রোড় হইতে শিশুটিকে কাড়িয়া লইল। দুঃখিনী শিশুটিকে পাইবার জন্য পিশাচের নিকট কত অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল—কত করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিন্তু পিশাচ বলিল,—"তুমি আমাদের প্রাণে যেরূপ যাতনা দিয়াছ, আমরাও তোমাকে তাহার প্রতিফল প্রদান করিব।" এই বলিয়া পিশাচ শাণিত তরবারি দিয়া শিশুর হাত কাটিল,—পা কাটিল,—অবশেষে গলদেশও দ্বিখণ্ডিত করিল। এইরূপ হৃদয়-বিদারক স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে দুঃখিনী চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার বিকট চীৎকারে শিশুটির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে 'ও মা' 'ও মা' রবে কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর রোদনে দুঃখিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর, সে শিশুকে স্তনপান করাইতে লাগিল। শিশু পুত্র স্তন পাইবামাত্র চুপ করিল। মাতা স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। একবার মনে হইল,—গৃহমধ্যে যাইয়া শয়ন করি। কিন্তু অত্যন্ত আলস্য বশতঃ পরক্ষণেই নিদ্রাভিভূত হইল।

এমন সময়ে হুড় হুড় শব্দে বহির্দ্বারের কবাট খসিয়া পড়িল। দুঃখিনীর চমক ভাঙ্গিল। সে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইল,—তিনজন দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দুঃখিনী অমনি শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিল। শয্যা ত্যাগ করিবার সময় একব্যক্তি তাহাকে তাড়া করিয়াছিল বলিয়া, শিশুটিকে শয্যা হইতে আনিতে পারিল না।

দুর্ব্বৃত্তেরা আসিয়া গৃহের কবাটে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখিনী কবাটের অর্গল বন্ধ করিয়া উহা এরূপ দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছিল যে, তিনজনে সজোরে আঘাত করিয়াও দ্বারের কবাট উন্মোচন করিতে পারিল না।

অনন্যোপায় হইয়া দুর্ব্বৃত্তেরা শিশুটিকে শয্যা হইতে তুলিয়া আনিল, এবং দুঃখিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—যদি তুমি দ্বার উন্মুক্ত না কর, তবে তোমার ছেলেটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিব। আর 'যদি ছেলের মঙ্গল চাও, তবে শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দিয়া আমাদের আশা পূর্ণ কর। আমরা তোমার জন্য পাগল হইয়াছি।"

এরূপ ভীতিপ্রদ বাক্যেও দুঃখিনা কবাট খুলিল না।

অবশেষে দুর্ব্বৃত্তেরা প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহের দেওয়ালস্থিত ক্ষুদ্র গবাক্ষমধ্যে স্থাপন করিল, এবং সত্য সত্যই শিশুটির একটি হস্ত কর্ত্তন করিয়া, ঐ গবাক্ষপথে দুঃখিনীকে দেখাইল। শিশুটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, কিন্তু চীৎকার করিতে পারিল না। কারণ, দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া দিয়াছিল। দুঃখিনী ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কবাট খুলিল না।

দুর্ব্বৃত্তেরা আরও একটি হস্ত ছেদন করিয়া দেখাইল। দুঃখিনী ইহা দেখিয়া কেবল করুণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ভিতরের চীৎকার শ্রবণ করিবে কে?

দুর্ব্বৃত্তগণ ক্রমে ক্রমে শিশুর পদ ও গলদেশ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া দুঃখিনীকে দেখাইল। কিন্তু দুঃখিনী তথাপি কবাট খুলিল না দেখিয়া, তাহারা নিরাশ-হৃদয়ে জড় পদার্থের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় নবাব গিয়াসুদ্দীন কয়েকজন সশস্ত্র অনুচরকে সঙ্গে লইয়া দুঃখিনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচগণকে ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন করিলেন।

পরে নবাব বাহাদুর কবাটে করাঘাত করিয়া দুঃখিনী মাকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখিনীর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে অনুচরদিগকে কবাট ভাঙ্গিতে বলিলেন। অনুচরেরা কবাট ভাঙ্গিলে পর, নবাব বাহাদুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার দুঃখিনী মা চেতনাশূন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দুঃখিনী মা'কে প্রাঙ্গণে বাহির করিয়া, শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

অনেক চেষ্টার পর দুঃখিনীর চৈতন্যলাভ হইল; সে পুত্রের কর্ত্তিত দেহ দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া, নবাব বাহাদুরের নয়নদ্বয়েও অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, দুঃখিনী মা'কে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।...

কাজীর বিচার।

(৪)

পরদিন সকাল বেলায় আসামীত্রয়ের সহিত শিশুর কর্ত্তিত দেহ চালান দিয়া, নবাব বাহাদুর পাণ্ডুয়ার বিচারালয়ে কাজী সুরাজুদ্দিনের নিকট অভিযোগ উত্থাপিত করিলেন। কাজীসাহেব আসামী তিনজনের মধ্যে একজনকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। কারণ, সে ব্যক্তি তাঁহারই কনিষ্ঠ শ্যালক।

কাজী সুরাজুদ্দিন ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু বিচারপতি বলিয়া ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং বিচারকালে তাঁহাকে শ্যালকের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি নবাব বাহাদুরের, তাঁহার অনুচরগণের, দুঃখিনীর ও আসামীত্রয়ের মৌখিক এজাহার লইলেন। আসামীরা স্বমুখে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিল। কাজী সাহেব আদেশ করিলেন,—"আগামী কল্য বেলা দ্বিপ্রহরের সময় নবাব বাহাদুর ও দুঃখিনীর সম্মুখে আসামীগণকে শূলে বসান হইবে।"

সময়ের অপেক্ষা সকলেই করে, কিন্তু সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে পরদিন বেলা দুই প্রহর যথাসময়ে উপস্থিত হইল। কাজীর আদেশ রক্ষা করিবার জন্য নবাব বাহাদুরও দুঃখিনী মা'কে সঙ্গে লইয়া শূল-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য দর্শকগণের উপস্থিতিতেও সে স্থান লোকে লোকারণ্য হইল।

কাজী সাহেবের আদেশে কয়েকজন চাপরাসী আসামী তিনজনকে বন্ধনাবস্থায় লইয়া আসিল। আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত তাহাদিগকে কিছুক্ষণ আলাপ করিতে দিবার পর শূলে বসান হইল। ভয়ঙ্কর চীৎকার রবে প্রাণত্যাগ করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

সে সময় আর একজন খুনী আসামীর শূলদণ্ড হওয়ার কথা। সে আসামী বাঙ্গালী। সে প্রবঞ্চনা দ্বারা সহরের এক বারবিলাসিনীর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিয়া, অর্থ ও অলঙ্কার লইয়া পলাইতেছিল। সহরের কয়েকজন লোক ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। পরে আদালতের বিচারে তাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

উক্ত আসামীকে শূল-প্রাঙ্গণে উপস্থিত করা হইলে, দুঃখিনী তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাজী সাহেব আসামীকে শূলে চড়াইতে হুকুম দিলেন, এমন সময়ে দুঃখিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া দৌড়িয়া গিয়া আসামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। নবাব ও কাজী সাহেব এই ব্যাপার দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কাজী সাহেব দুঃখিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা, তোমার হঠাৎ এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি? এ আসামীটি কি তোমার কোনরূপ আত্মীয়?"

দুঃখিনী কাঁদিয়া যুক্তকরে বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার, ইনি আমারই পতি-দেবতা।"

কাজী সাহেব বলিলেন,—"মা, তোমার পতি হইলেও ত এ ব্যক্তি আমার নিকট খুনী আসামী। এ ব্যক্তি অর্থের কুহকে মজিয়া এক অসহায়া রমণীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। সুতরাং ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিচার করিলে, ইহার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত ভাবিয়া, আমি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছি। মা, ক্ষমা করিলে, বিচারকের নিকট আত্মপর বিবেচনা থাকে না। রাজ্যের শান্তিভঙ্গের জন্য দোষী বলিয়া স্থির হইলে, তাঁহারা ন্যায়ানুসারে পিতাকেও দণ্ড দিতে বাধ্য। আজ দেখিলে ত, নিজের শ্যালককেই চক্ষুর সম্মুখে শূলে বসাইতে হইল। তাই বলি মা, তোমার পতি হইলেও আর আমি এ সময় কি করিব?"

কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখিনী বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, দোষ করিলেই শাস্তি ভোগ করিতে হয়, এ বিধান শুধু রাজ-বিধান নহে, বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বরাজেরও যে এই নিয়ম, তাহা আমি জানি। আমার পতি অপরাধ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার জন্য তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহকালের বিচারে নিষ্কৃতি লাভ করিলে, পরকালের বিচারেও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ধর্ম্মাবতার, আমি পতির প্রাণ ভিক্ষা করি নাই, এবং তাঁহার মুক্তির জন্যও প্রার্থনা করি নাই। তবে অনেকদিনের পর তাঁহার শ্রীপদ দর্শন করিলাম বলিয়া এরূপ আকুল হইয়াছি। পতি ভদ্র হউন বা অভদ্র হউন, সাধু হউন বা চোর হউন, সদয় বা নির্দ্দয় হউন, রমণীর সে বিচারে কিছুমাত্র অধিকার নাই। পতি যে বেশেই থাকুন না কেন, তিনি রমণীর নিকট সদা-সর্ব্বদা

দেবতা তুল্য। ইহকালে, পরকালে পতিই রমণীর একমাত্র গতি। রমণীর যাহা কিছু মানসম্ভ্রম, তাহা কেবল পতিকে লইয়াই, এবং এ সংসারে পতিসেবা করিবার জন্যই রমণীর জন্মগ্রহণ। পতি ভিন্ন রমণীর ধর্ম্ম নাই,—পতি ভিন্ন রমণীর দেবতা নাই। ধর্ম্মাবতার, আমার পতির প্রাণদণ্ড দিবেন বলিয়া আমি দুঃখিত নই। কিন্তু আপনি দয়া করিয়া এই হতভাগিনীর জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন, যেন পতির মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সম্মুখে হাসিতে হাসিতে মরিতে পারি। ধর্ম্মাবতার, পতির আশাতেই এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখুন—পতি ভিন্ন অভাগিনীর আর কে আছে?"

কাজী সাহেব নীরবে দুঃখিনীর কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"মা, তুমি সাধ্বী সতী রমণী, তোমার অকাল-মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া কোন্ হতভাগ্য অপরাধী হইবে? তোমার গুণাবলী অতুলনীয়, তুমি অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রকে বলি দিয়াছ,—পতির বিরহ-ব্যথা পাইয়া সত্য সত্যই দুঃখিনী হইয়াছ। আজ সেই পুণ্যবলেই এরূপ দুঃসময়ে পতির সাক্ষাৎলাভ পাইলে, এবং তোমার পতি পাষণ্ড পাপিষ্ঠ হইয়াও তোমারই পুণ্যবলে আজ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইল। এক্ষণে আমরাও জগদ্‌বাসীকে জানাইতে চাই যে, 'দেখ জগদ্‌বাসী, সতী রমণীর ক্ষমতা কতদূর।' যাও মা, আমি তোমার কার্য্যগুণে একান্ত মুগ্ধ হইয়া, তোমার পতিকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলাম। তবে তোমার পতির চরিত্র-সংশোধনের জন্য, তাহাকে আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই থাকিতে হইবে। তুমি আর নিজের গ্রামে না যাইয়া, নবাব বাহাদুরের প্রদত্ত বাড়ীখানিতেই পতিকে লইয়া সুখে অবস্থান কর। আমি আশা করি, নবাব বাহাদুর কৃপাপরবশ হইয়া তোমাদের সাংসারিক খরচ যোগাইবেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমার দুঃখময় জীবনের অবশিষ্ট কাল পরমসুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত হয়।"

দুঃখিনী বলিল,—"ধর্ম্মাবতারের কৃপালাভে এ হতভাগিনী অত্যন্ত অনুগৃহীতা হইল। তবে দুঃখিনী ওরূপ প্রশংসালাভের অনুপযুক্তা। কারণ, আমি মা'র মুখে শুনিয়াছি যে, অতি প্রাচীনকালে সতী সাবিত্রী যমের হস্ত হইতে আপনার স্বামীকে আনিয়াছিলেন। আমি ত কোন্ কীটানুকীটতুল্য ধর্ম্মাবতার।"

হাসিতে হাসিতে কাজী বলিলেন,—"মা, যমে আর আমাতে প্রভেদ কি? যম পরকালের বিচারকর্ত্তা,—আর আমি এখন ইহকালের বিচারকর্ত্তা। এই যা প্রভেদ। নতুবা সাবিত্রীও যেমন যমের হস্ত হইতে পতিলাভ করিয়াছিলেন, বুঝিতে গেলে তুমিও তেমনই আমার মত যমের হস্ত হইতেই পতিলাভ করিলে।"

কাজী সাহেবের বিচার শুনিয়া, নবাব বাহাদুর প্রফুল্ল-বদনে বলিলেন,—"কাজী সাহেব, আমি আপনার ন্যায় বিচারপতি লাভ করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। 'যে রাজ্যে এরূপ বিচারপতি থাকেন, সে রাজ্যও ধন্য, সে রাজ্যের রাজাও ধন্য।' আমি আপনার আদেশে দুঃখিনী মা'র সাংসারিক খরচ যোগাইব। ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

অতঃপর নবাব বাহাদুর দুঃখিনী ও দুঃখিনীর পতি শম্ভুনাথকে সঙ্গে লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

—জাহ্নবী অঙ্কে—

দেখিতে দেখিতে ১৪।১৫ বৎসর কাটিয়া গেল। ভগবৎপ্রসাদে দুঃখিনী ইতিমধ্যে দুইটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছে। এক্ষণে পুত্র দুইটির বয়স ১২ ও ১০ বৎসর মাত্র। নবাব গিয়াসুদ্দীন কৃপা করিয়া শম্ভুনাথকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া শম্ভুনাথের স্বভাবও নির্ম্মল হইয়াছে। পতি-পুত্র লাভ করিবার পর দুঃখিনীর সংসার বেশ সুখের হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে শম্ভুনাথের মধ্যম সহোদর যদুনাথের স্ত্রী আপনার ছেলেগুলিকে লইয়া, দুঃখিনীর গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কারণ, তাহার স্বামী যদুনাথ বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিলে, জ্যেষ্ঠ রঘুনাথের স্ত্রী কলহ করিয়া যদুনাথের স্ত্রীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। সে ছেলেগুলিকে লইয়া প্রথমে পিত্রালয়ে যায়। কিন্তু তাহার পিতামাতা জীবিত না থাকায়, ভ্রাতৃবধূগণ কলহ করিয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেয়। পরে সে ছেলেগুলিকে লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিতে থাকে। অনাহারে দিন দিন কৃশ হইয়া, ৩।৪মাস পরে তাহারা একদিন পাণ্ডুয়া নগরে দুঃখিনীর গৃহে উপস্থিত

হয়। দুঃখিনী তাহাদের তদবস্থার কারণ অবগত হইয়া সাদরে আপনার গৃহে আশ্রয় দেয়। দুঃখিনী তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংবাদ লইলে, সে কাঁদিয়া তাহাদের মৃত্যুসংবাদ জানাইল। ইহাতে দুঃখিনীরও হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। এক্ষণে মধ্যমা বধূ, সময় সময় কৃতকর্ম্মের আলোচনা করিয়া, দুঃখিনীর নিকট দুঃখপ্রকাশ করে। কিন্তু দুঃখিনী "তোমার দোষ কি দিদি, আমার অদৃষ্টের ফল" এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীতুল্য মধ্যমা যাতার সেবা করে ও তাহার ছেলেগুলিকে নিজের ছেলেদের চেয়ে অধিক স্নেহ করে।

জ্যেষ্ঠ রঘুনাথের স্ত্রী বাড়ীর একমাত্র কর্ত্রী হইয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিল। সে পতির অজ্ঞাতসারে আর একজন পুরুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, স্ত্রীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল। এই অপরাধে তাহার ছেলে দুইটি একদিনেই মারা যায়। কিন্তু জ্যেষ্ঠা বধূর তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ হইল না। একদিন রঘুনাথকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। আজ পতি বাড়ী আসিবে না চিন্তা করিয়া, (পাঠক, ক্ষমা করিবেন, উপায় নাই) জ্যেষ্ঠা বধূ প্রেমানন্দ-তরঙ্গে উছলিয়া উঠিল। সে উপপতিকে গৃহে আনিয়া পতির ন্যায় সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই রাত্রেই রঘুনাথকে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইল। রঘুনাথ স্ত্রীর শয্যায় অপর পুরুষকে দেখিয়া, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; পরে কুঠারাঘাতে দুইজনকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। সে যে কোথায় চলিয়া গেল, অনেক সন্ধান করিয়াও তাহার সংবাদ পাওয়া গেল না।

জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি লইয়াই কালপুরুষের লীলাভিনয়। তাই মর-জগতে অমর হইয়া কেহই কিছুরই একাধিপত্য ভোগ করিতে পারে না। ভাগ্যনিয়ন্তা কালপুরুষেরই ইচ্ছানুসারে সকলের ভাগ্য পরিচালিত হয়। আমরা সেই কালপুরুষের কোন খবর রাখি না; কিন্তু কালপুরুষকে অহরহ আমাদের খবর লইতে হয়। এই জীবনের রঙ্গভূমিতে ক্রীড়নক পুত্তলিকার ন্যায় কর্ম্মসূত্রে পরিচালিত হইয়া,—সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি নানাবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া,—শৈশবে পিতামাতার স্নেহ, যৌবনে দাম্পত্যপ্রণয় এবং বার্দ্ধক্যে জরা-মৃত্যু লইয়া,—তাঁহারই ইঙ্গিতে আমাদিগকে অভিনয় করিতে হয়। কিন্তু আমরা এমনই বোকা যে, এ সমস্ত রহস্য বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। হায় রে, মায়ামোহান্ধ, মদগর্ব্বিত জীব আমরা!

সেই কালপুরুষের পরিচালনায় যৌবনাবস্থা অতিক্রম না করিতেই, শম্ভুনাথকে হঠাৎ কালগ্রাসে পড়িতে হইল। একদা রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থাতেই শম্ভুনাথের জ্বর আসিল। তৎপরদিন বিকারের সূত্রপাত হইল। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বিশেষ চিকিৎসাতেও রোগের উপশম হইল না। দুঃখিনী অনবরত পতির নিকটে থাকিয়া, পতির সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। একদিন চিকিৎসক রোগীকে দেখিয়া বলিলেন,—"আজ রোগীর অবস্থা বড়ই খারাপ,—রোগীর মৃত্যুর বেশী বিলম্ব নাই।"

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নবাব বাহাদুর শম্ভুনাথকে দেখিতে আসিলেন। দুঃখিনী নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়া পতির সেবায় ব্যস্ত। পতির জন্য তাহার ক্রন্দন বা হৃদয়ের চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নাই। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল,—সেও যেন পতির মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

নবাব বাহাদুর শম্ভুনাথকে ডাকিলেন। শম্ভুনাথ চক্ষু মেলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল; কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। দেখিতে দেখতে নবাব বাহাদুরের সম্মুখেই শম্ভুনাথের জীবনাবসান হইল

দুঃখিনীর হৃদয়ে তখনও চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। সে পুত্র দুইটিকে নবাব বাহাদুরের সম্মুখে আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"বাবা, আমরা আপনার ঋণে আবদ্ধ হইয়া চলিলাম। আশা আছে, এই পুত্র দুইটি আপনার ঋণ হইতে আমাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত করিতে পারিবে। এক্ষণে আপনি ইহাদের পিতামাতা। আমার মত আমার মধ্যমা দিদিকেও স্নেহের চক্ষে দেখিবেন। আমার আর পতিশূন্য জীবনে কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে আমাকে পতির অনুগামিনী হইবার জন্য অনুমতি দিউন। আমি হর্ষবদনে পতির সহিত শুভযাত্রা করি।" পরে মধ্যমা দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দিদি, আমার অভাবে তুমিই ছেলে দুটিকে মায়ের মত পালন করিও।" মধ্যমা বধূ এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

নবাব বলিলেন,—"মা, আমি আর কি বলিব? ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করুন। মধ্যমা দিদি ও ছেলেদের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না।"

দুঃখিনী সীমন্তে সিন্দুরের ফোঁটা লইল, পরে পতির চরণ মস্তকে স্পর্শ করিয়া, আস্তে আস্তে পতির শয্যায় শয়ন করিল। বালক দুইটি চীৎকারস্বরে

রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখিনী আর নয়ন মেলিয়াও চাহিল না : নবাব বুঝিতে পারিলেন,—সতী সত্য সত্যই পতির অনুগামিনী হইল।

পরে নবাব বাহাদুর সহর হইতে শম্ভুনাথের স্বজাতীয় লোক ডাকাইয়া, পতি-পত্নীর মৃতদেহ গঙ্গায় লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। আদেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হইল। নবাব বাহাদুর স্বয়ং শোভাযাত্রায়, বাহির হইলেন। বাদ্যরবে সহর মুখরিত হইল। অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া, দম্পতীযুগলের শেষ মিলন দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল।

যথাসময়ে গঙ্গাতীরে দম্পতীর চিতাবহ্নি প্রজ্বলিত হইল। শম্ভুনাথের পুত্রদ্বয় পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাবিহিতরূপে সম্পন্ন করিল। সতী-দেহ-স্পর্শে গঙ্গাদেবীও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে জাহ্নবী-সলিলে চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া সকলে সহরাভিমুখে গমন করিলেন। আসিবার সময় নবাব-বাহাদুর স্বহস্তে সতীর চিতাভস্ম লইয়া আসিলেন।

ইতর ভদ্র সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল,—"ধন্য সতীত্ব, ধন্য পতি-পরায়ণতা! এইরূপ রমণীই প্রকৃতপক্ষে সতীলক্ষ্মী।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।"

দিল্লী।

মুসলমান-রাজত্ব।

(পাঠান শাসনকাল—লোদী-বংশ।)

বিলোল লোদীর পূর্ব্বপুরুষেরা ফিরোজসা তোগলকের সময় হইতে মুল-তানে বাস করিতেন। বিলোল ক্রমে প্রাধান্যলাভ করিয়া সরহিন্দ, পরে দিল্লী অধিকার করিয়া বসেন। মসনদে বসিয়া বিলোল উজীর হমীদ খাঁর প্রভুত্ব-লাঘবের চেষ্টা পান, এবং কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য করেন।

দিল্লীর অধীন প্রদেশ সকলের মধ্যে কোন কোন স্থানের শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হইয়া উঠায়, তাহাদের দমনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে জৌনপুরের স্বাধীন অধিপতিরা প্রবল হইয়া বিলোলের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, বিলোলের অনেক কর্ম্মচারী তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। প্রথমে জৌনপুরের মামুদসা সুরকীর সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মহম্মদ সা সুরকীর সহিত বিবাদ চলিতে থাকে, অবশেষে মহম্মদের ভ্রাতা হোসেন সা সুরকীর সহিত বিবাদ ঘোরতররূপ ধারণ করে। এই বিবাদে অনেকবার সন্ধিও হয়, এবং উভয় পক্ষে সন্ধিভঙ্গও করেন। অবশেষে কালীনদীর তীরে শেষ যুদ্ধে হোসেন সা পরাজিত হইয়া জৌনপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং বিলোল তাহা অধিকার করিয়া লন।

বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায় বিলোল আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য আত্মীয়ের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভারার্পণ করেন। তাঁহার পুত্র নিজাম খাঁ দিল্লী ও দোয়াব প্রদেশের শাসনভার পাওয়ায় বিলোলের মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই নিজাম খাঁই সেকেন্দর লোদী নামে ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

সেকেন্দর লোদী আফগান সর্দ্দারগণের সাহায্যেই সিংহাসনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বশুতা অস্বীকার করায় তাহাদিগকে দমন করা হয়। তাঁহার ভ্রাতা আলম খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করায়, তাঁহাকে বশুতা স্বীকার করাইতে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁহার অপর ভ্রাতা জৌনপুরের অধিপতি বার্ব্বাক্ খাঁ বাদসাহের অধীনতা স্বীকার না করায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। বার্ব্বাক্ খাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় বন্দী হন, তিনি অবশেষে বাদসাহের পক্ষ অবলম্বন করেন। বার্ব্বাক্ খাঁ পরাজিত হইয়া সেকেন্দরের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে জৌনপুরের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি হোসেন সা সুরকী বিহারে অবস্থিতি করায়, বার্ব্বাক্ খাঁকে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়।

তাহার পর সেকেন্দর অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থা করেন। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ বশুতা স্বীকার করিয়া উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। আবার জৌনপুরে গোলযোগ উপস্থিত হয়, উক্ত প্রদেশের জমীদারেরা মিলিত হইয়া বার্ব্বাক্ খাঁকে বিতাড়িত করেন। সেকেন্দর অবশেষে তাঁহাদিগকে পরাজিত

করিয়া নিজে জৌনপুর অধিকার করিয়া লন, বার্ব্বাক্ খাঁ বন্দিরূপে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন।

জৌনপুরের হোসেন সা সুরকী বিহার প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। চুনার দুর্গ তাঁহার অধীনে থাকায় সেকেন্দর তাহা অবরোধ করেন, তাহার পর তিনি ক্রমে বিহার অভিমুখে ধাবিত হন। কুটুম্বার রাজা বলবন্ত রায় প্রথমে সেকেন্দরের পক্ষ অবলম্বন করেন, পরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। সেকেন্দর বলবন্তের পুত্র নরসিংহ রায়কে যুদ্ধে পরাজিত করায়, নরসিংহ ও অন্যান্য জমীদারেরা হোসেন সা সুরকীকে আহ্বান করেন। বারাণসী হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে সেকেন্দর ও হোসেন সার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, হোসেন সা পরজিত হইয়া পাটনা অভিমুখে পলায়ন করেন। সেকেন্দর তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে, হোসেন সা প্রথমে বিহারে, পরে গৌড়ে গিয়া তথাকার বাদসাহ সুপ্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন হোসেন সার আশ্রয় লন। সেইখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সেকেন্দর ত্রিহুত, সারণ প্রভৃতি অধিকার করিয়া বাঙ্গালা অভিমুখে ধাবিত হন। গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সা তাহা অবগত হইয়া সন্ধির জন্য স্বীয় পুত্র ডানিয়ালকে পাঠাইয়া দেন। সেকেন্দরের প্রেরিত লোকের সহিত বাঢ়নগরে ডানিয়ালের সাক্ষাৎ, এবং উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। বিহার প্রদেশ সেকেন্দারের অধিকারে আইসে, বাঙ্গালা হোসেন সার অধীন থাকে।

সেকেন্দর পান্নার রাজা শালিবাহনের নিকট তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠান, রাজা অসম্মত হওয়ায় তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করা হয়। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ ও ঢোলপুরের রাজা বিনায়কদেব দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন, ঢোলপুর কিন্তু অবশেষে দিল্লী-সম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

সেকেন্দর লোদী আগরা নগরীকে রাজধানীতে পরিণত করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি অনেক সময় তথায় অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার সময়ে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে আগরার অনেক উচ্চ অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া যায়, এবং বহুলোকের প্রাণ নষ্ট হয়। ক্রমে সেকেন্দর হিন্দু রাজাদিগের রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন, ও হনুমন্তগড়

প্রভৃতি অধিকার করিয়া লন। মালব রাজ্যের চন্দেরী তাঁহার অধিকারে আইসে। সেকেন্দর রণথম্ভর অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গোয়ালিয়র অধিকারের জন্য তিনি সৈন্য সমবেত করেন, কিন্তু সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই।

মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ সেকেন্দর লোদীর অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে খাদ্য-দ্রব্যাদি সুলভ ছিল, এবং রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিত। তিনি সকলের অভাব অভিযোগ শুনিতেন ও সুবিচার করিতেন। মুসল্‌মান ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষরূপ আস্থা ছিল, তজ্জন্য হিন্দুগণ নিগৃহীত হইত। সেকেন্দর অনেকস্থানে হিন্দু-মন্দির ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌএর নিকট কোন স্থানের একজন ব্রাহ্মণ 'অকপটভাবে অনুষ্ঠান করিলে, হিন্দু ও মুসল্‌মান উভয় ধর্ম্মই ঈশ্বরের গ্রাহ্য হইতে পারে।' এই কথা প্রচার করায়, মুসল্‌মান কাজীদিগের দ্বারা বিচার করাইয়া—তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নাপিতদিগের প্রতি মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করার নিষেধাজ্ঞা থাকায়, হিন্দুরা তীর্থস্থানে যাইতে পারিত না। তাঁহার সময়ে রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি মস্‌জীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি লেখাপড়ারও আদর করিতেন। সেকেন্দর নিজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, তাঁহার সময়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাঁহার সময় হইতেই হিন্দুরা ফারসী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। তিনি শিক্ষা ও বংশের পরিচয় লইয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। চারিদিকের সংবাদ লওয়ার জন্য সেকেন্দর ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সেকেন্দর লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইব্রাহিম স্বজাতি আফ্‌গানদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার না করায়, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এবং তাঁহার ভ্রাতা জালাল খাঁকে জৌনপুরে স্বাধীন রাজা করিবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু খাঁ জোহান লোহানী নামে একজন আফগান রাজকর্ম্মচারী তাহাদিগকে নিবৃত্ত করায়, তাহারা জালাল খাঁকে নিরস্ত হইতে বলে। জালাল খাঁ তাহা না শুনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, ইব্রাহিম তাঁহাকে পরাজিত করিলে, জালাল খাঁ গোয়ালিয়রে পলাইয়া যান। ইব্রাহিমের সেনাপতিগণ কয়েক মাস অবরোধের পর গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করেন। এই সময়ে রাজা মানসিংহের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার পুত্র বিক্রমজিৎ গোয়ালিয়রের

রাজা হইয়াছিলেন। একশত বৎসর হিন্দুদিগের হস্তে থাকার পর গোয়ালিয়র এক্ষণে দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। জালাল খাঁ পলায়ন করিতে করিতে অবশেষে ধৃত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

তাহার পর ইব্রাহিম অনেকগুলি কর্ম্মচারীর প্রাণ-নাশের ব্যবস্থা করেন, ইহার ফলে তাঁহার রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইব্রাহিমের সেনাপতিগণ সর্ব্বদাই বিদ্রোহ-দমনে ব্যস্ত থাকেন। বিহারের শাসনকর্ত্তার পুত্র বাহাদুর খাঁ লোহানী মহম্মদ সাহ উপাধি ধারণ করিয়া গঙ্গার পূর্ব্বভাগের সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন। এই সময়ে কাবুলের মোগল অধিপতি বাবরশাহ ভারতবর্ষ আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিলেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদী শেষে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। চারিবার চেষ্টার পর পঞ্চমবারে বাবর দিল্লী অধিকারে কৃতকার্য্য হন।

প্রথমবার ১৫১৯খৃষ্টাব্দে বাবর পঞ্জাবের বাহাড়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই দ্বিতীয়বার পেশোয়ার ও সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। ১৫২০ খৃঃ তৃতীয়বার সিয়ালকোট ও সৈয়দপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ১৫২৪ খৃঃ দৌলত খাঁ লোদী ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারের ভয়ে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। বাবর চতুর্থবার হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইয়া লাহোর অধিকার করেন ও শতদ্রু পার হন। দৌলত খাঁ লোদী প্রথমে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরে বিরুদ্ধাচরণ করায়, বাবর তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র গাজী খাঁকে বন্দী করেন, পরে আবার মুক্তি দেন। বাবর পঞ্জাব প্রদেশ শাসনের ব্যবস্থা করিয়া অবশেষে কাবুলে ফিরিয়া যান।

দৌলত খাঁ লোদীর উপদ্রবে ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা আলাউদ্দীন লোদী কাবুলে বাবরের নিকট পলাইয়া যান, ইব্রাহিমও তাঁহার উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। বাবর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। আলাউদ্দীন হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিলে, বাবরের আদেশে মোগল সর্দ্দারেরা তাঁহার সহিত যোগ দেন, দৌলত খাঁ ও তাঁহার পুত্রও যোগদান করেন। ইঁহাদের সাহায্যেই আলাউদ্দীন দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হন। তিনি প্রথমে ইব্রাহিমের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে নিজে পরাস্ত হইয়া পঞ্জাবে পলাইয়া আসেন। ১৫২৫ খৃঃ শেষভাগে বাবর শাজাদা

হুমায়ুনের সহিত পঞ্চমবার হিন্দুস্থানে আগমন করেন, আলাউদ্দীন তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। দৌলত খাঁ ও তাঁহার পুত্র কিন্তু ইব্রাহিমের পক্ষ অবলম্বন করেন, ইব্রাহিম লোদীও ক্রমে সসৈন্যে অগ্রসর হন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে পানিপথ প্রান্তরে উভয় পক্ষের সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তিনিও সমরক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাবর হুমায়ুনকে আগরা অধিকারে পাঠাইয়া, দিল্লী অধিকারের জন্য একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন, নিজেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। দিল্লী অধিকার করিয়া বাবর আগরায় গমন করেন। সেখানে গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতের সৈন্যেরা অবস্থিতি করিতেছিল। বিক্রমজিৎ পানিপথের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। রাজার লোকজন একখণ্ড উজ্জ্বল হীরক পেস্‌কসস্বরূপ প্রদান করিলে, বাবর তাহা হুমায়ুনকে উপহার দেন। দিল্লী ও আগরা অধিকার করিয়া বাবর ক্রমে দিল্লী-সাম্রাজ্য অধিকারে প্রবৃত্ত হন।

মুষ্টিযোগ।

(১)

বৈশাখের শাশ্বতীতে "মিথ্যার প্রচার" প্রবন্ধ পড়িয়া সুখী হইতে পারিলাম না। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বলে, পুরাণকাসুন্দি চট্‌কান কাজটাই ভাল নয়। কিন্তু লেখক যখন হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আমার পক্ষে লোভ সংবরণ করাও কষ্টকর। আর এক কথা এই যে, আমি ছাড়িলেও কাসুন্দি আমাকে ছাড়িতে চায় না। পুনশ্চ, সম্মুখে একটা অন্যায়—একটা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের অনুমন্তা হওয়া ত দূরের কথা, উহার উপদ্রষ্টা হওয়াতেও প্রত্যবায় আছে। এই কাসুন্দি অনেক দিন হইতে পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সময় থাকিতে প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পথ দেখিয়াছিলেন। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সে পথে যাইবার শক্তি ছিল না,—অতএব অধি-

কারও ছিল না। তিনি গোস্বামী মহাশয় অপেক্ষা ওজনে অনেক লঘু ছিলেন। এখন, মনে রাখিতে হইবে, লঘুকে গুরু বলিয়া বর্ণনা করিবার ভার হইতেছে পুরাণের, ইতিহাস সে ভার লইলে উহা আখ্যায়িকায় পরিণত হয়। ইতিহাস স্বতন্ত্র বস্তু। ভারতে খাঁটি ইতিহাস ছিল না, ছিল পুরাণ ও ইতিহাসের ভগ্নাংশ-সংযোগে খিচুড়িবিশেষ। আমাদের পাকস্থালী এখনও খাঁটি ইতিহাস হজম করিতে পারে না। তাই এখনও চণ্ডীবাবুপ্রমুখ দলের এ সকল প্রচেষ্টা। কোনওরূপে ইতিহাসকে চাপা দিয়া পুরাণ রচনা করা চাই। বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২০ সালের শ্রাবণের 'ভারতী' পত্রিকায় ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিতের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন,—"তাঁহার সে সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রবল চাপে শশধরপ্রমুখ দলের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত"। এ কথার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার 'সাহিত্য' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩২০) লিখিয়াছিলেন,—"না, এ তথ্য আমাদের বিদিত ছিল না। প্রত্যেক চেষ্টাই দীর্ঘ শৃঙ্খলের একটা অংশমাত্র। কোনও চেষ্টাই বিফল হয় না। 'শশধরপ্রমুখের' চেষ্টাও বিফল হয় নাই। প্রমাণ—নগেন্দ্রনাথের শেষজীবন। প্রমাণ,—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ। তবে, সে চেষ্টার বিফলতা কল্পনা করিয়া কোনও পক্ষ যদি সুখী হন, সে সুখে আমরা বাদ সাধিব না।" আসল কথা এই যে, আত্মারাম সরকারকে গালি না দিয়া কোনও ভেল্কিবাজিকর ভেল্কিবাজি দেখাইতে পারেন না। ইহা তাঁহাদের ওস্তাদের আজ্ঞা। শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় আত্মারাম সরকারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, ভেল্কিবাজিকরদিগের ভেল্কি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাদের যে অনর্থসাধন করিয়াছেন, তাহার ফলে এ সকল কথা আরও কিছুদিন শুনিতে হইবে। ইহাতে রাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা, বণিক্‌পুত্রের সুখস্বপ্ন বণিক্‌পুত্রই ভাঙ্গিবে, চিন্তা নাই।

(২)

গীতায় আছে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"। বঙ্কিম বাবুর মতে স্বধর্ম্ম অর্থে Duty। তিনি বলেন—"ইহজীবনে যে, যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম"। তাঁহার স্পষ্ট কথা এই যে, গীতা কেবল হিন্দুর জন্য নহে, গীতা জগদ্বাসীর জন্য। যে দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

নাই, সে দেশের লোকের স্বধর্ম্মও নাই, এ কথা অগ্রাহ্য। ঈশ্বরাবতারগণ যখন যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন সেই দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই তদ্দেশবাসীর নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণও সমসাময়িক রীতিনীতি আচারাদির প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া, ব্যাখ্যাকৌশলে বরং সে সকলের দৃঢ় সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। গীতার ব্যাখ্যাগুলি এই প্রণালীতে রচিত হওয়ায়, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হইতে পারে না; অপিচ, ব্যাখ্যাগুলি সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ নহে। এই স্বধর্ম্মের ব্যাখ্যাই তাহার উদাহরণ। বঙ্কিমবাবুর কথাই ঠিক। কিন্তু স্বধর্ম্ম অর্থে Duty বুঝিলে অর্থটি সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। Duty অর্থে একরূপ দেনাশোধ, —a thing that is due and must be paid. স্বধর্ম্ম অর্থে দেনাশোধ এবং পাওনা আদায় দুই বুঝিতে হইবে। আমি যেমন তোমার প্রাপ্য গণ্ডা শোধ করিতে বাধ্য, আমার প্রতি তোমার দেয়বস্তু আমি আদায় করিতে সেরূপ বাধ্য নহি। এই জন্যই অনেকস্থলে dutiful মানুষকেও (স্বধর্ম্মের আংশিক অনুষ্ঠানবশতঃ) ভবের হাটে ঠকিতে দেখা যায়। duty করা বা দেনাশোধ অর্থে আত্মরক্ষা বা আপনাকে depensive এ রাখা! আর পাওনা আদায় অর্থে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা,—offensiveএ বা আক্রমণ-পক্ষে থাকা। 'স্ব' বা জীবাভিমানী আত্মার ধর্ম্ম দুটি, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। কেবল duty করিলে স্বধর্ম্মের প্রথম অর্দ্ধাংশ সম্পাদন করা হয়, যাহা শেষ অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা সহজ-সম্পাদ্য।

এ স্থলে প্রাচীন পন্থী বলিবেন,—আত্মরক্ষা বজায় রাখিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্ম-প্রসার সম্পাদন করা সুখের কথা, কিন্তু তাহার বিপরীত ঘটিতে দেখিলে,—আপনার বিশিষ্টতা হারাইতে দেখিলে বলিব, তোমাদের তথাকথিত আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মহানির নামান্তর মাত্র। কারণ, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণাশ্রমের কথা না থাকিলেও, অষ্টাদশে ব্রাহ্মণাদির 'স্বভাবজ' লক্ষণ ও 'স্বভাবজ' কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গীতাবক্তা তাহাদের অনুষ্ঠান দ্বারাই স্ব-ধর্ম্ম হইতে রক্ষা হইবে, এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। অষ্টাদশে আছে,—'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্"॥ ১৮—৪৭। স্বো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের অহিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্তি, ব্যাধের পশুবধে

প্রবৃত্তি ইত্যাদি 'স্বভাবজ' লক্ষণ বুঝিতে হইবে, আর তাহাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মও তদনুরূপ হওয়া চাই। তাঁহাদের মত এই যে, পশুবধ ইত্যাদি বিষয়ে যে প্রবৃত্তি, ইহা একটা ধর্ম্ম বা Law ধরিয়া আছে, তাহা আবার যাহাকে ধরিয়া আছে, তাহার নাম প্রকৃতি, স্বভাব বা Nature।

কিন্তু এই স্বভাব শব্দের অর্থ লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। মিল (J. S, Mill) বলেন, তোমরা যাহাকে natural (স্বাভাবিক) বল, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, তাহাকে অভ্যাসের ফল ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। "whatever is usual seems natural" (Subjection of Women)। যাহা ব্যবহারিক, যাহা চিরাভ্যস্ত, তাহাকে তোমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতকাল 'স্বাভাবিক' বলিয়া আসিতেছ,—যেমন স্বামীর স্ত্রীর উপর, প্রভুর ভৃত্যের উপর, রাজার প্রজার উপর যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা তোমাদের মতে 'স্বাভাবিক'। এ কথার প্রতিবাদে ফল নাই; কেননা, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ-শিশু শূদ্র-শিশুর সহিত একত্র ভোজনে আপত্তি করে না; বরং শূদ্র-শিশু হইতে সে যে শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞানটুকু শিখিবার জন্য অনেক সময়ে তাহাকে বেত্রদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ব্যাঘ্রশিশু গোবৎসের সহিত একপাত্রে তৃণ ভক্ষণ করিতে যে ঘোরতর আপত্তি করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব স্বাভাবিক অর্থে এখানে চিরাভ্যস্ত বা usual বুঝিতে হইবে। গীতাবক্তা এ তর্ক না তুলিলেও, স্বভাবজ অর্থে যে usual হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্" ॥ ৯—৩২। অতএব বলিব, যদি উপাসনামার্গে, ভক্তিযোগাধিকারে বর্ণগত দোষ পরা গতি লাভের পথে বাধক না হয়, তবে তদপেক্ষা শতগুণ সহজসাধ্য ব্যবহারিক জগতে Progress বা উৎকর্ষসাধনের পথে, বর্ণগত দোষ সাধকের (সকাম সংসারীর) পূর্ণ সফলতালাভে বাধক হইতে পারে না। স্বভাবজ শব্দ এখানে চিরাভ্যস্ত বা usual অর্থে গ্রহণ না করিলে, গীতার মাহাত্ম্য কমিয়া যায়। চিরাভ্যাসের পথে, আত্মতুষ্টির (মনু) অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসারে দেনাশোধ ও পাওনা আদায়,—আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই পূর্ণমাত্রায় স্বধর্ম্মপালন। যেখানে চিরাভ্যাস ও আত্মতুষ্টির মধ্যে বিরোধ ঘটিবে, সেখানে আত্মতুষ্টিই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

শ্রীগুরুদাস সান্যাল।

বানের গান।

আয় তোরা কে বানের জলে
ভেলা ভাসাবি,
শৈশবেরে টেনে এনে
ছেলে হাঁসাবি।
আয় সখি আয় বিকেল বেলা
ঢেউয়ের সনে করবি খেলা,
সলিল ছুড়ি আকুল করি
সখায় শাসাবি
আয় তোরা কে বানের জলে
ভেলা ভাসাবি।
ভাসিয়ে দিয়ে সোণার দেহ
নবীন লহরে।
আন্‌বি ধ'রে ভাসিয়ে দেয়া
ভেলার বহরে।
পুরাতনে নূতন করি,
আবার বুকে আনবি ফিরি,
নূতন করে হৃদয়রাজে
ভাল বাসাবি।
আয় তোরা কে বানের জলে
ভেলা ভাসাবি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পৃথ্বীরাজ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাদশাহের দূত।

যথাসময়ে চরেরা আসিয়া শাহাবুদ্দীনকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। শুনিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সর্দ্দারগণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সকলের পরামর্শে স্থির হইল যে, আরব খাঁকে হিন্দুস্থানে পাঠান হউক; তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট সুল্‌তানের পত্র লইয়া যাইবেন। প্রথমে হুসেনের নিকট গিয়া চিত্ররেখাকে চাহিতে হইবে, যদি তিনি তাহাকে দেন, তাহা হইলে ক্ষমা করা যাইবে,—না শুনিলে পৃথ্বীরাজকে পত্র দিয়া সমস্ত বুঝাইয়া বলিতে হইবে। পৃথ্বীরাজ তাঁহাদের কথায় সম্মত না হইলে, তাঁহাকে বন্দিদশায় হুসেন ও চিত্ররেখার সহিত গজনীতে আসিতে হইবে বলিয়া শাহাবুদ্দীন ব্যক্তও করিলেন।

তিন শত সওয়ার লইয়া আরব খাঁ হিন্দুস্থানে আসিলেন এবং নাগরে পৌঁছিলেন। তিনি হুসেনকে সুল্‌তানের কথা জানাইলেন; হুসেন তাহাতে কান দিলেন না। তখন আরব খাঁ পৃথ্বীরাজের দরবারে উপস্থিত হইলেন।

সামন্তগণকে লইয়া পৃথ্বীরাজ দরবারে বসিয়াছিলেন; আরব খাঁ আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিলেন। রাজা বাদশাহের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। তখন আরব খাঁ সুল্‌তানের পত্রের কথা বলিলেন। পৃথ্বীরাজ মন্ত্রী কৈমাসকে তাহা পড়িতে আদেশ করিলেন, পত্র লইয়া কৈমাস পড়িতে লাগিলেন।

"বীরশিরোমণি, আজমীর-যুবরাজ শ্রীযুক্ত পৃথ্বীরাজ সমীপেষু।"

আপনি আমার শত্রু মীর হুসেনকে আশ্রয় দিয়াছেন; যদি আমার সহিত প্রণয় রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে আপনার রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন।"

পত্র শুনিয়া পৃথ্বীরাজের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কৈমাস বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সুল্‌তান দেখিতেছি, আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠধর্ম্মের কথা জানেন না। সেইজন্য এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। হুসেন পৃথ্বীরাজের শরণ লইয়াছেন, শরণাগতকে ত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।"

আরব খাঁ উত্তরে বলিলেন,—"তবে কি বাদশাহের সহিত আপনারা বিবাদ করিতে চান?"

তখন কাকা কণ্ব বলিয়া উঠিলেন,—"আমরা কি শাহাবুদ্দীনকে ভয় করি? বরঞ্চ যে রাজধর্ম্ম জানে না, তাহার মত মূর্খকে শিক্ষা দেওয়াই উচিত।"

শূরসিংহ বলিলেন,—"আমরা প্রস্তুতই আছি।"

গোবিন্দ রায় উত্তর করিলেন,—"শাহের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার ক্ষমতা আমরা রাখি।"

চাঁদ পুণ্ডীর কহিলেন,—"মীর হুসেনকে কিছুতেই ত্যাগ করা হইবে না।"

এই সমস্ত শুনিয়া আরব খাঁ বলিলেন,—"তাহা হইলে সুল্‌তানকে গিয়া আমি এ কথা নিবেদন করি।"

কৈমাস উত্তর দিলেন,—"সেই ভাল।"

ব্যাপার তত সহজ নহে মনে করিয়া, আরব খাঁ ধীরে ধীরে দরবার পরিত্যাগ করিলেন এবং গজনীর পথে অগ্রসর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাদশাহের দরবার।

গজনীর সুসজ্জিত দরবার-গৃহে মণিমাণিক্যখচিত ভূষণে ও অপরূপ পরিচ্ছদে সাজিয়া সুল্‌তান শাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী মসনদের উপর বসিয়া আছেন, পার্শ্বে সর্দ্দারগণও বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত; সিপাহীগণ স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া শান্তিরক্ষা করিতেছে। চামর-হস্তে দাসীগণ বাদশাহকে ব্যজন করিতে ব্যগ্র; এমন সময়ে আরব খাঁ দরবারগৃহে প্রবেশ করিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিলেন।

বাদশাহ ও সর্দ্দারগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং আরব খাঁর নিকট হইতে সংবাদ জানিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আরব খাঁ, খবর কি?"

আরব খাঁ উত্তর দিলেন,—"খবর ভাল নহে।"

উজীর তাতার খাঁ বলিলেন,—"হুসেন কি সম্মত হয় নাই?"

আরব খাঁ,—"না।"

কোরসান খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর পৃথ্বীরাজ?"

আরব খাঁ,—"তিনি হুসেনকে ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন।"

রস্তম খাঁ বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি কাফের আমাদের সহিত লড়াই করিবে?"

আরব খাঁ,—"তাহা ছাড়া আর কি হইতে পারে?"

শুনিয়া তাতার খাঁ কহিলেন,—পৃথ্বীরাজের যখন এত অভিমান যে, বাদশাহের অপমান করিতেও প্রস্তুত, তখন আর তাহাকে ক্ষমা করা যায় না। তাহার উপর লড়াই করিয়া তাহার সৈন্য ও প্রজা ধ্বংস করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার গর্ব্ব ধূলিতে মিশিয়া যাইবে।"

কোরসান খাঁ বলিয়া উঠিলেন,—"এত তাড়াতাড়ি করা ভাল নহে; পৃথ্বীরাজের বলের একবার বিচার করিয়া দেখিতে হয়।"

আরব খাঁ বলিলেন,—"সত্য সত্যই তাঁহার বল অতুল বটে, যাহারা চক্ষে না দেখিয়াছে, তাহাদের অবিশ্বাস হইতে পারে।"

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার কিরূপ বল ও পরাক্রম, একবার জানিতে চাহি।"

তখন আরব খাঁ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পৃথ্বীরাজের মন্ত্রীরা সৎপরামর্শই দিয়া থাকেন। তাঁহার একশত সামন্ত, পঁচিশ পঁচিশ জন পালাক্রমে হাজির থাকেন। এক একজন সামন্ত এক হাজার সিপাহীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন। এক পলে দশ সিপাহীকে মারিয়া ফেলিতে তাঁহারা সমর্থ। তাঁহাদের মাথা কাটা গেলেও ধড়েতে যুদ্ধ করে। বীরগণের তরবারির ধার দেখিলে, আনন্দে বিহ্বল হইতে হয়। সৈন্যগণও সুশিক্ষিত, তাহারা কোনরূপ কষ্ট গ্রাহ্য করে না। আর রাজপুত সৈন্যের কথা কেই বা না জানে?"

আরব খাঁর কথা শুনিয়া তাতার খাঁ হাসিয়া উঠিলেন। বিরক্তিসহকারে তখন আরব খাঁ বলিলেন,—"আপনি নিজ চক্ষে এ সব কিছুই দেখেন নাই, তাই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। আমি বলি, তাঁহার সামন্তগণের ন্যায় একজনও আপনাদের দরবারে নাই।"

শাহাবুদ্দীনের এ সকল সহ্য হইল না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"পৃথ্বীরাজের যেরূপ বল ও পরাক্রম থাকুক না কেন, তাহার সৈন্য-সামন্ত যেরূপ হউক না কেন, আমি অপমানের প্রতিশোধ লইবই লইব। কাজেই বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এখনই সমস্ত সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থানে যাইতে হইবে, তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।"

তাতার খাঁ—"বাদশাহের আদেশ শিরোধার্য্য।

কোরসান খাঁ—"তবে তাহাই হউক।"

রুস্তম খাঁ—"কাফেরকে শীঘ্রই শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে বটে।"

আরব খাঁ বলিলেন,—"তাহা হইলে বিশেষ সাবধান হইয়া আপনারা অগ্রসর হইবেন।"

বাদশা উত্তর দিলেন—"তাহাই হইবে।"

তাহার পর দরবার ভঙ্গ করিয়া বাদশাহ অন্দরে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রি ভাল করিয়া তাঁহার নিদ্রা হইল না। পৃথ্বীরাজের চিত্র সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষের সমক্ষে আসিতে লাগিল। কতক্ষণে অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ণপ্রয়াগ হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণমুখে কর্ণ-গঙ্গার পার্শ্ব দিয়া রামনগর ষ্টেশনাভিমুখে গিয়াছে। দ্বিতীয় রাস্তা অলকনন্দার ধারে ধারে রুদ্র-প্রয়াগ, শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ হইয়া হরিদ্বার অবধি গিয়াছে। আমরা রাম-নগরের রাস্তায় কর্ণ-গঙ্গার ধারে ধারে ৩ মাইল চলিয়া সিমলী নামক একটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চটীতে রাত্রিযাপনার্থ উপস্থিত হইলাম। একটা দোকানে

আশ্রয় লইয়া কম্বল বিছাইয়া বসিলাম। পুরী, দুগ্ধ ইত্যাদি জলযোগ করিয়া সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করা গেল। পরদিন ২৭শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে চলিতে লাগিলাম। পার্ব্বত্য জঙ্গল-রাস্তায় চলিয়া ২ মাইলে সিরোলী চটীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। অনুমান ২ মাইল গিয়া ভটোলী চটী এবং তথা হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তায় ৪ মাইল চলিয়া আদি-বদরীতে উপস্থিত হইলাম। রাস্তার বাম পার্শ্বে সামান্য উচ্চ ভূমিতে একটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ডাক-বাংলা আছে। সুন্দর মন্দিরমধ্যে আদি-বদরী ও আদি-কেদার এবং আরও কয়েকটি দেবমূর্ত্তি আছেন। কয়েক খানি দোকান, ধর্ম্ম-শালা ও ডাকঘর আছে। চটীতে ঝরণা আছে, নদীও নিকটে; অনেক ক্ষণ এই চটিতে বিশ্রাম করিয়া আমরা পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অল্প কিছু দূর চলিয়া একটি ক্ষুদ্র চটী পাওয়া গেল। সেইখানেই মধ্যাহ্ন-কার্য্য সমাধা করা হইবে বলিয়া আমরা একটি দোকানে আশ্রয় লইলাম। চটী নিতান্ত সামান্য, কিছু পাওয়া গেল না; কোনরূপে জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিয়া অপরাহ্নে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর ভাল রাস্তাতে চলিয়াই চড়াই আরম্ভ হইল। যেমন বিশ্রী চড়াই, তেমনি চতুর্দ্দিকে জঙ্গল। দিবালোকেই সে সমস্ত স্থান অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। কি ভীষণ জঙ্গল! নানাবিধ বৃক্ষ-লতা-পরিপূর্ণ সুনিবিড় অরণ্যে কত শত হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান রহিয়াছে। অনেক রকম পশু-পক্ষীর কণ্ঠধ্বনি আমাদিগের শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। প্রতিক্ষণেই আমরা হিংস্র শ্বাপদাদির প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একে চড়াইয়ের পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর, তাহার পর চতুর্দ্দিকে এই ভীষণ অরণ্য দেখিয়া প্রাণ একেবারে আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়িল। জীবনে এরূপ ভয়ঙ্কর অরণ্য কখনও দেখি নাই। একজন লোকের সহিতও এই রাস্তায় দেখা হইল না। ক্রমাগত ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমরা তিনটি প্রাণী ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অপরাহ্নকালে এইরূপ রাস্তায় অনুমান ৪ মাইল চলিয়া জোঁকাপাণী চটীতে রাত্রিযাপনার্থ উপস্থিত হইলাম। চতুষ্পার্শ্বে ভীষণ অরণ্যবেষ্টিত সামান্য উচ্চ ভূমিতে ৩ খানি মাত্র ছাপ্পর-ঘর একটি ক্ষীণধার ঝরণা; যাত্রিবর্গের আশ্রয়স্থল চটীর অস্তিত্ব জ্ঞাপন

করিতেছে। ইহারই একটি ঘরে আমরা আশ্রয় লইলাম। তখনও অনেকখানি বেলা আছে। কিন্তু চতুর্দ্দিকে জঙ্গলাবৃত থাকায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। দোকানদার হাতে গড়িয়া পুরী করিয়া দিল। আমরা যথাসম্ভব জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম। সেই ছাপ্পর-ঘরে কোনরূপে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইল। পরদিন ২৮শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে জঙ্গল-রাস্তায় চলিতে লাগিলাম। দুই পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য, আমরা মধ্য-রাস্তা বহিয়া অগ্রসর হইতেছি। ৩ মাইল চলিয়া একটি চটী পাওয়া গেল। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ৪ মাইল চলিবার পর ধোবীঘাটা নামক একটি ভাল চটীতে উপস্থিত হইলাম। এই চটী বেশ সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। বড় একটি ঝরণা আছে।

নিকটেই রামগঙ্গা নদী প্রবাহিত। অনেকগুলি দোকান, ডাকঘর, পুলিস প্রভৃতি সবই আছে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ জলযোগ করা হইল। এখান হইতে ৫ মাইল মেহল চোরী পৌঁছিয়া আহারাদি করা হইবে বলিয়া আমরা বেশীক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিলাম না। রাস্তা মন্দ নয়, রামগঙ্গার ধারে ধারে বেশ সড়ক রাস্তা। মাঝে মাঝে অধিবাসীদিগের বস্তি এবং নদীর ধারে ধারে কয়েকখানি দোকান দেখিতে পাইলাম। ক্রমেই আমরা লোকালয়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। সমতল সুন্দর রাস্তায় অনেক লোকজন এবং নদীও নিকটে। পাহাড়ের রাস্তা বলিয়া বোধ হয় না। বেশ আনন্দে আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। এ অঞ্চলের তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি সমস্তই যেন সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। স্থানমাহাত্ম্যে নিতান্ত অসার দ্রব্যও এখানে রমণীয় বোধ হইতেছে। সমস্ত রাস্তা প্রায়ই সমতল, কোন কোন স্থানে সামান্য উঁচু-নিচু। আর দূরে পাহাড়গুলি বিরাট-গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক একবার পাহাড়ের দিকে চাহিতেছি, আর প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বিশ্রামলাভার্থে পথিমধ্যস্থ একটি অশ্বত্থবৃক্ষমূলে বসিয়া বহু-দূর-বিস্তৃত হিমালয়ের এই অনির্ব্বচনীয় শোভা পরমাগ্রহে দেখিতে লাগিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল পর্ব্বতের পর পর্ব্বত সমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, সেই অভ্রভেদী—অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি কি প্রশান্তভাবেই দণ্ডায়মান আছে। অত্যুজ্জ্বল মার্ত্তণ্ড-কিরণ সেই চিরশুভ্র তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতের উপর পতিত

হইয়া যে অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ বিচিত্র রমণীয় পরম ভাবময় দৃশ্য দেখিলে আনন্দোচ্ছ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। অনেকক্ষণ আমরা এই অলৌকিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিলাম। ধীরে ধীরে কয়েক মাইল চলিয়া আমরা মধ্যাহ্নকালে মেহলচৌরী নামক একটি জনবহুল চটীতে উপস্থিত হইলাম। চটীতে অনেক লোকজন; নিতান্তই স্থানাভাব। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারকে ধরিয়া অনেক কষ্টে একটি লোহার সিন্ধুকের ন্যায় ঘর আবিষ্কার করা গেল এবং "ঝুলি-ঝাপ্পা" নামাইয়া পাক-ভোজনের কার্য্য সমাধা করিতে উদ্যোগী হইলাম।

আজ একমাস হইল, এই পাহাড়ের কোলে কোলে ফিরিতেছি; দিন নাই, দুপুর নাই, সকাল নাই, বিকাল নাই, উঁচু-নীচু অপ্রশস্ত রাস্তা অতিক্রম করিয়া, ক্রমাগত অগ্রসরই হইতেছি; এ পাহাড়ের রাজত্ব হইতে ফিরিয়া অন্য দেশে যাইতে হইবে, এ চিন্তা আর মনে নাই। প্রভাতে উঠিয়াই এই পর্ব্বতকে আলিঙ্গন করি, সমস্ত দিন তারই বুকে বুকে আনন্দে কাটিয়া যায়। সে আমাকে কত আদরে কত যত্ন করিয়া স্বীয় পাষাণ অঙ্গের ভিতর হইতে পরম মধুর স্নেহ-রস পান করাইয়া জীবিত রাখিয়াছে। আহা! কত তাহার করুণা! ভাল-বাসার কি অচ্ছেদ্য বন্ধন!! প্রেমময়ের অমৃতধারায় আপনার বিরাট কলেবর পূর্ণ রাখিয়া, আশ্রিত জনগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হেতু পরম কল্যাণকর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করতঃ স্নেহ এবং প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। মহা-ভাগ হিমালয় কঠিন দুর্ভেদ্য পাষাণময় দেহের আবরণে অপার করুণায় পূর্ণ এক-খানি অতি সুকোমল হৃদয় লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। পরম ভাবময় হিমালয় সে করুণারাশি অকাতরে বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত বলিয়াই কি আপনার সুবিশাল দেহ এই মহাকঠিন দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত রাখিয়াছেন? এত প্রেম, এত ভাল-বাসা ইনি কোথা হইতে লাভ করিলেন? এইরূপ অচল অটল ভাবে সৃষ্টির কোন্ প্রথম যুগ হইতে কাহার মহাত্ম্য প্রচার করিতে বিরাজ করিতেছেন? যাঁহার চির তুষারময় পাষাণগাত্র হইতে সিকতারাশি ভেদ করিয়া ত্রিলোকপাবনী অলকনন্দা অবিরাম কল-কল-নাদে সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে অবতরণ করিতেছেন, অত্যদ্ভুত সুনিবিড় অরণ্যানী-সমন্বিত, সুধা-নিস্যন্দিনী অসংখ্য নির্ঝরিণীর আনন্দোচ্ছ্বাস-পরিপ্লাবিত, এবং অসংখ্য বিহগ-

কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত-লহরীতে চিরমুখরিত সেই দেবতাত্মা হিমালয়, সেই অসীম চৈতন্যময় পরমাদ্ভুত জীবন্ত মূর্ত্তি নিত্য নব প্রেম অনুরাগে তাঁহার বন্দনা গান করিতেছেন।

"বল, দেখি রে হিমাচল
তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল
কার অনুরাগে মিশে"।

তাঁহার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া আমারও আজ গাহিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ঘন অচল নভো নীলাঞ্চল কানন কার গুণ গায় রে।
বন বিটপী সাথে, বিহঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে কার গুণ গেয়ে ধরা মাতায় রে॥
অংশুমালী নিত্য কার মহিমা গায়,
কাননে ফুল ফুটে কার তরে কে ফুটায়,
ঘোর ঘনে বারি কে করে বরিষণ,
তৃপ্ত হয় এই তাপিত ভুবন,
জীবেতে কার এত, করুণা সমাগত, কে জানে আছে সে কোথায় রে॥
ঐ যে প্রকৃতি মাখা মধুরতায়, কলতানে নদী সাগর পানে ধায়,
শীত গ্রীষ্ম ছয় ঋতু আসে যায় বারবার,
সংঘটন ইহা হয় আদেশে কার,
কাহার সুশাসনে, বাঁচাতে জীবগণে, মধুর সমীরণ বয় রে॥
অসম্ভব হেরে সব মনেতে জ্ঞান হয়,
কর্ত্তা কেহ আছে এর অবশ্য সুনিশ্চয়,
চির-জ্যোতির্ম্ময় তিনি মধুর মূরতি তাঁর,
বিশাল মহীমণ্ডলে তিনিই সারাৎসার,
ভাবিলে যাঁহারে মন,
ঘুচে এ ভববন্ধন,
অজ্ঞান-তম দূরে যায় রে॥

ভাবে বিভোর হইয়া থাকিলে অনেক সময় ক্ষুধার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। যথাবিহিত উপচারে উদর-দেবের পূজা করা দরকার হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাকেও সেই প্রচলিত নীতির অনুসরণ করিতে হইল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, বৃদ্ধ শ্যা—বাবু প্রায় সমস্তই ঠিক করিয়াছেন; আমি ও ভ—বাবু তাড়াতাড়ি স্নান করিতে চলিলাম।

আমাদের ঘর হইতে একটু নীচে নামিয়া একটা ঝরণা'তে বেশ করিয়া স্নান করিলাম। বাসায় আসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বৈকালে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে দিন আর বৃষ্টির মধ্যে অপরাহ্ণে রাস্তা চলিতে ইচ্ছা হইল না। রাত্রিবাস এইখানেই করা হইবে স্থির করিয়া মেহল চৌরীর বাজার দেখিতে বহির্গত হইলাম। প্রথমেই পোষ্টাফিসে যাওয়া গেল। দ্বিতল বাটীর নিম্নতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে চাউল, দাইল, আটা প্রভৃতির একখানি দোকান; আসবাবপত্রের মধ্যে কয়েকটি ধামা ও দাঁড়ীপাল্লা আর একটি চটমোড়া বাক্সের উপর দোকানদার উপবিষ্ট। পোষ্টাফিসের খাতাপত্র দাইলের ধামার মধ্যে রক্ষিত। বাহিরে ডাক-ঘরের একটি লেটার-বক্স্ (চিঠির বাক্স)। পোষ্টমাষ্টারের সহিত আলাপ করা মানসে দোকানের সম্মুখে যাইতেই 'ক্যা চাহিয়ে' বলিয়া দোকানদার হাঁক ছাড়িল। সে বেলার মত আমাদের যে আর চাউল-দাইলের প্রয়োজন নাই, ইহা বোধ হয় সে জানিত না। আর আমিও জানিতাম না যে, স্বয়ং ডাক-বাবুই দোকান-দাররূপে আমাকে ছলনা করিতেছেন। আমার জিনিস খরিদের আবশ্যক নাই, পোষ্ট-মাষ্টারের সহিত আলাপ করিতে চাই—বলিলাম।

তখন সেই দোকানদার বিনীতভাবে উত্তর করিল, 'আমিই এখান-কার পোষ্ট-মাষ্টার।' যাহা হউক, ডাক-বাবুর সহিত আলাপাদি করিয়া বেশ খুসী হইলাম। তাঁহার বিশুদ্ধ হিন্দীর মধ্যে মধ্যে ইংরেজী বুকনী দেওয়া কথায় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে ডাক-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন্ জাতি? আমি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলাম। তিনি বলিলেন, 'আপ্‌লোক মছলী খাতা হ্যায়?' আমি বলিলাম, 'হাম নেহি খাতা হ্যায়, লেকেন হামারা দেশমে কোই কোই খাতা হ্যায়।' তিনি উত্তেজিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ক্যা, ব্রাহ্মণ হোকে মছলী খাতা হ্যায়? সো ত ঘাতক হ্যায়, চণ্ডাল হ্যায়'

ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের মৎস্যভক্ষণ যে নিতান্তই গর্হিত, তাহা ডাক-বাবুর কথার ভাবে বেশ বুঝিতে পারা গেল। উহা শাস্ত্রসম্মত কি না, তাহার বিচার করিতেছি না, আমি সেই দোকানদার পোষ্ট-মাষ্টারের, ব্রাহ্মণের মৎস্যভক্ষণে নিতান্ত ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ দেখিয়া একটু বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অনেকক্ষণ নানা কথা আলোচনার পর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টির আয়োজন হইতেছিল; আমাদের রুটী প্রস্তুত করিয়া খাওয়া-দাওয়া হইতে না হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। অতি অপ্রশস্ত ঘরে বৃষ্টির মধ্যে কোনরূপে মেহল চৌরীর রাত্রি প্রভাত হইল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিন ২৯শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে আমরা বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হইলাম। ঘর হইতে বাহির হইয়াই চড়াই আরম্ভ হইল। একে মুষলধারে বৃষ্টিপতন, তাহাতে চড়াই আরোহণ—অবস্থা যে বিশেষ সুবিধাজনক নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পথে ১ মাইল চড়াই করিয়া পুনরায় ২। ২॥ মাইল উৎরাই নামিবার পর কথঞ্চিৎ সোজা রাস্তা পাওয়া গেল।

মেহল চৌরী গড়োয়াল জেলার শেষ-সীমানা; তাহার পর হইতে কুমায়ুন জেলা আরম্ভ হইয়াছে। এখন আমরা কুমায়ুন জেলা দিয়া চলিতেছি। মেহল চৌরীতে আমাদের কাণ্ডীওয়ালা প্রিয় দুর্গাসিংকে বিদায় দিতে হইল। সেখানে এক কুরীতি যে, গড়োয়াল জেলার লোক, এমন কি, কাণ্ডী, ঝামপান প্রভৃতি কিছুই ভিন্ন জেলায় যাইবে না। মেহল চৌরীতে যাত্রিবর্গকে নূতন করিয়া, কাণ্ডী ঝামপান্ করিতে হইবে। কুলী, কাণ্ডী, ঝাম্পান, ঘোড়া সবই এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাহার জন্য সরকার হইতে একজন ঠিকাদার বা চৌধুরী নিযুক্ত আছে। চৌধুরীর নিকট হইতে চিঠি লইয়া ঐ সমস্ত কুলী, কাণ্ডী প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইতে হয়। রামনগর রেল-ষ্টেশন এখান হইতে ৬৫ মাইল। সাধারণতঃ ঘোড়া ১৭৲ টাকা এবং কুলী মণকরা ৫৲ টাকায় পাওয়া যায়। কাণ্ডীওয়ালা দুর্গাসিংকে বিদায় দিয়া আমাদিগকেও একটি নূতন কুলী ঠিক করিয়া লইতে হইল। এক মাস হইল দুর্গাসিং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। আজ, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইল। অনেক রকম সুখ-দুঃখ তাহার সহিত ভোগ করা হইয়াছিল। কত দিন হইল, সেই পাহাড়ী বালককে ছাড়িয়া আসিয়াছি; কিন্তু যখনই তাহার

সেই সরল হাসিমাখা মুখখানি মনে পড়ে, প্রাণে যেন আনন্দ অনুভব করি। তাহার কথা মনে হইলেই হিমালয় আমার চক্ষুর সম্মুখে পরম সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হন। সে পাহাড়ী বালককে আমি ভুলিতে পারি নাই। হিমালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও আমার প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তাহাকে ভুলিতে পারিব না; কিন্তু আর তাহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব কিনা, তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

যাহা হউক, সেই অপ্রশস্ত সামান্য উঁচু-নীচু রাস্তায় ৮ মাইল চলিয়া গণাই নামক একটি ভাল চটীতে উপস্থিত হইলাম। ইহার অপর নাম চোখুটিয়া। মাঝে ২।১টি চটী পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের নাম আমার স্মরণ নাই। আজ বৃষ্টিতে বড়ই ভিজিতে হইতেছে। কখনও রৌদ্র, কখনও বৃষ্টি সহ্য করিয়া রাস্তা চলিতে হইতেছে। সোজা রাস্তা পাইয়া আজ আর বড় বেশী বিশ্রাম করা হইতেছে না। শীঘ্র শীঘ্র রামনগর ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিলে বাঁচা যায়। ক্রমাগত এক মাসকাল পাহাড়ে এই চড়াই উৎরাই করিয়া শরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিছু দিন বিশ্রাম প্রয়োজন। একটা দিনও কোথাও স্থিরভাবে অবস্থিতি করা হয় নাই। প্রত্যুষে উঠিয়া রাস্তায় নামি, সমস্ত দিন রাস্তার সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যাবেলা কোন চটীতে উপস্থিত হইয়া রাত্রিযাপন করি। রাত্রিটুকু কোনরূপে কাটাইয়া প্রভাতে উঠিয়াই আবার যাইবার জন্য তাড়া পড়ে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যাত্রিবর্গের সহিত একত্রে চলিতেই হইবে। পাথরে অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ লাগিতে লাগিতে পা দুখানি একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তবুও বিরাম নাই। আজ মনে হইতেছে, কোথাও দশদিন বিশ্রাম করিয়া পুনরায় এই পর্ব্বতের মধ্যে ডুবিয়া যাই। কিন্তু সঙ্গিদ্বয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবার আমাকে তাঁহাদের সহিত ফিরিতেই হইবে। এত দিনের ভালবাসার বন্ধন এত শীঘ্র ছিঁড়িতে পারিলাম না।

গণাই চটীতে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করা হইল। এখানে কয়েকখানি দোকান ও একটি ডাকঘর আছে। এখান হইতে দুইটি রাস্তা বাহির হইয়া একটি রামনগর ষ্টেশন ও অপরটি কাঠগুদাম অবধি গিয়াছে। চটীর নীচেই রামগঙ্গা নদী। জল অল্প, কিন্তু স্রোত বড় ভয়ানক। একটি পয়সা কুলীকে

দিলে, সে হাত ধরিয়া পার করিয়া দেয়। আমরা লাঠীতে ভর করিয়া অতি সন্তর্পণে পিচ্ছিল পাথরের উপর দিয়া অতি কষ্টে পার হইলাম। একটা পুলের কিয়দংশ প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম। চটীর চৌধুরী আমাদিগকে অনুরোধ করিল, "আপনারা বাঙ্গালী যাত্রী, আলমোড়া জেলার কর্ত্তাকে এই পুলের জন্য একটু লিখিয়া দিবেন।"

আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া এপারে আসিলাম; শুনিলাম, কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি যাত্রী এই রামগঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এপারে কয়েকখানি দোকান আছে—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমরা একটি দোকানে বসিলাম; পার্শ্বেই অন্য একটি দোকানে তেজবল, কদম্ প্রভৃতি পার্ব্বতীয় কাষ্ঠের সুন্দর সুন্দর লাঠি বিক্রয় হইতেছে। স্থির হইল, কিছু ধারণ করিয়া পুনরায় চলিতে হইবে। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

অজয়-তীরে ।

(উজানী)

হে অজয় ! পুণ্যময়ি ! স্নিগ্ধ প্রবাহিণি !
ও তীরে ইন্দ্রাণী শোভে—শিব ইন্দ্রেশ্বর !
খুল্লনা-লহনা দুটি আছিল সতিনী,
কো-গ্রামে মঙ্গলচণ্ডী !—(উজানী সুন্দর !)
প্রাচীন এ পীঠভূমি—কোন্ যুগান্তের ?
ভক্ত, সাধকের চির-সাধনার স্থল !
জয়দেব-চণ্ডিদাস গীতি অতীতের,
আজো করে আত্মহারা—মরমে বিহ্বল !
সে চির-মধুর গীতি জাগাও সুন্দরি !
বহি ওই মৃদু মৃদু করুণ হিল্লোলে,
মুখর কবির দেশ দিবা-বিভাবরী,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের কূজন-কল্লোলে ।
রাখ স্মৃতি, রাখ গীতি মোহিনী তটিনি !
উরসে সুবাস যথা রাখে লো নলিনী !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ।

শ্রীগুরবে নমঃ।

৩য় খণ্ড। ভাদ্র ১৩২২ ৫ম সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি, এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি, এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র, ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট হইতে মহাকবি ভাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যজগতে এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থাপিত করিয়াছে, আমরা ভাসের নাটকাবলী কথাকারে অনূদিত করিবার জন্য ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে অনুমতিপত্রের নকল প্রদত্ত হইল। কবিকথার মালতী-মাধব শেষ হইলেই ভাসের নাটকাবলী কবিকথাকারে প্রকাশিত হইবে।

No. 220.

Office of the Curator for the publication of Sanskrit
Mss. Trivandrum
6th. April 1915.

Dear Sir,

In reply to your kind letter dated 5. 3. 15, I have great pleasure to inform you that the Government have permitted you to translate into Bengali the works of Bhasa in the form of a tale. You may also consult with advantage the Pratimanataka one of the best works of Bhasa and also an improved second edition of Svapnavasavadatta; both will be published in a month.

I am Dear Sir,
Yours truly
Sd T. Ganapati Sastri
Curator.

To Nikhil Nath Ray esq.

যশোদা গোপাল।

শ্রীগুরবে নমঃ।

আলোচনা।

দেশের অবস্থা।

এবার আমাদের বড়ই দুর্দ্দিন, ও দিকে যুদ্ধ চলিতেছে, আবার এদিকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আশঙ্কায় আমরা চিন্তিত হইয়া পড়িতেছি। পূর্ব্ববঙ্গ বন্যায় ভাসিয়া গেল, আবার পশ্চিমবঙ্গ বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া উঠিতেছে। তাই চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ও সহৃদয় মহোদয়গণ যত্ন লইতেছেন, কিন্তু এখনও সকলে মনোযোগ দেন নাই। পূর্ব্ব হইতে যত্ন না লইলে বিপদের আর সীমা থাকিবে না। সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া যখন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে, তখন এ বিষয়ে বিশেষরূপে উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং অন্য প্রদেশ হইতে শস্যাদি আসিবে না; যুদ্ধের জন্য বহির্দ্দেশ হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায় না। কাজেই এবার এ সমস্যার মীমাংসা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিবে। সকলে পূর্ব্ব হইতে যত্নবান্ হউন।

হিন্দুমতে স্ত্রী-শিক্ষা।

হিন্দুমতে স্ত্রী-শিক্ষার এক ধুয়া উঠিয়াছে, গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন শুনা যাইতেছে। আমাদের কিন্তু তাহা ভাল বোধ হইতেছে না, আমাদের সমাজেও নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে; যাহা কিছু শান্তি আছে আমাদের অন্তঃপুরে, যদিও পাশ্চাত্য বিলাসের মোহে ও নাটক উপন্যাসের কুহকে আমাদের অন্তঃপুর এখন আর পূর্ব্বের মত নাই, তথাপি তাহাতে যেটুকু শান্তি, যেটুকু পবিত্রতা আছে, তাহা সমাজের আর কোথাও নাই; সেই শান্তি ও পবিত্রতা ঐরূপ স্ত্রী-শিক্ষায় যে নষ্ট হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। যদিও

বড়লোকের অন্দরে ছাড়া গরীবের অন্তঃপুরে তাহা প্রবেশ করিতে পারিবে না, তথাপি বড়লোকের ঘরণীদিগের আদর্শ সমাজে যে বিস্তৃত হইবে না, এ কথা কে বলিল? শিক্ষা কাহাকে বলে? কেবল দুই চারিখানি বহি পড়ায় বা দুই একটা জিনিস সেলাই করার নাম কি শিক্ষা? সে শিক্ষা ত চলিতেছে, তবে এ কি শিক্ষা? বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এক্ষণে বিবাহিতা ও বিধবাদের শিক্ষার জন্ত বোধ হয় অন্তঃপুরশিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। যাহারা সন্তান-পালন, পূজা, অর্চ্চা, রন্থই-বিন্থই লইয়া ব্যস্ত, তাহাদিগকে কেতাব পড়াইয়া, শেলাই শিখাইয়া কি লাভ হইবে, বুঝিতে পারি না। ফলতঃ আমরা এরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী নহি; ইহাতে আমাদের অন্তঃপুরের শান্তি ও পবিত্রতা নষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়।

সাহিত্যে রুচি।

আজকাল যাহার যাহা রুচি, তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যে চলিতেছে। ক্রমে দেখিতেছি, সভ্যতা ও শীলতার বিরুদ্ধে রুচি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন কোন প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে এরূপ ধরণের লেখা বাহির হইতেছে যে, তাহা পড়িলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। আবার ওরূপ লেখার সমর্থনও চলিতেছে। আমরা সাহিত্যকে লোকশিক্ষার আধার বলিয়া জানি। যদিও প্রাচীন সাহিত্যে কোন কোন স্থানে শীলতার অভাব দেখা যায়, কিন্তু সে সে স্থানে সংযত ভাষার অভাব দেখা যায় না। আমাদের বর্ত্তমান লেখকদিগের মধ্যে কিন্তু সংযত ভাষারও অভাব দেখা যাইতেছে। রসাত্মক বাক্যই কাব্য, তাহাই সাহিত্য, একটু প্রচ্ছন্ন থাকিলেই রস মিষ্ট লাগে, উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলে তাহা মাতিয়াই উঠে, তখন তাহা ভদ্রলোকের উপভোগ্য হয় না, ইতরেরই হইয়া থাকে; আমাদের সাহিত্য এক্ষণে কি ইতরেরই উপভোগ্য হইয়া উঠিবে? সাহিত্যে, ভাষায় সংযম না থাকিলে তাহাই ঘটিবে বলিয়া মনে হয়। আমার মনে পড়িতেছে, শ্রীমান্ পাঁচকড়ির উমার সমালোচনায় আচার্য্য চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন যে, সাহিত্যেও সংযমের প্রয়োজন; উমার ভাষায় কিছু সংযমের অভাব ছিল না, কেবল তাহার উপাখ্যানভাগকে অবলম্বন করিয়া আচার্য্য ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি যদি বর্ত্তমান

গল্পাদি পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহা জানিয়া দেখিলে ভাল হয়। ফলতঃ আমাদের সাহিত্যে ও ভাষায় সংযমের প্রয়োজন হইয়াছে। উচ্ছ্বাস সাহিত্যে, বা ইতর ভাষায় সাহিত্যের গৌরব নষ্ট করে। আমরা আশা করি, বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচকগণ এ দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।

গুরুভক্তি।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। গুরু দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, গুরু দেবতা হইতে অভিন্ন, এই ভাবে চিরদিনই আর্য্যগণ গুরুকে দেখিয়া আসিতেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন, গুরুকে দেবভাবে দর্শন করিবার উপদেশ বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া অনেকের ধারণা, তান্ত্রিক সময়েই গুরুভক্তির বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র আবার বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনেক পরে বৌদ্ধ তন্ত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, এই মত বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইতেছে; সুতরাং গুরুভক্তি ও গুরুকে দেবতাভাবে পূজা করা ইত্যাদি আচারও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে হিন্দুগণ প্রাপ্ত হইয়াছে, এই মতও আজকাল প্রচারিত হইতেছে দেখা যাইতেছে। এই মত কিন্তু যথার্থ নহে, উহা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাসাদিতে সর্ব্বত্রই গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'

যে মহাত্মার দেবতার (ঈশ্বরের) প্রতি পরা ভক্তি আছে ও ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ ভক্তি, গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, এই নিগূঢ় আত্মতত্ত্ববিষয় তাঁহার নিকট কথিত হইলে, তাঁহার চিত্তে প্রকাশিত হইয়া থাকে; অন্য কাহারও নিকট প্রতিভাত হয় না। এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা বেদই স্বয়ং গুরুভক্তি প্রচার করিতেছেন। অন্যান্য উপনিষদেও কিরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে গুরুর

নিকট উপনত হইয়া শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে আত্মতত্ত্বের উপদেশ লাভ করিবে, তাহা বর্ণিত আছে। ভগবান্ মনুও গুরুকে ভগবানের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।

আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি॥

শিষ্য গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। শিষ্য বেদপাঠ করিবার পূর্ব্বে ও পাঠশেষ হইলে গুরুর চরণদ্বয় গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিবে। বর্ত্তমান কালেও সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রগণ চতুষ্পাঠীতে এই আচার পালন করিয়া থাকে। শিষ্যগণ গুরুর নিন্দাবাদ নিজে করিবে না; অপরে নিন্দা করিলে, সেই স্থানে বসিয়া কর্ণপিধান করিবে; অথবা তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিবে। শিষ্য সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। মহাভারতে—আরুণি, উতঙ্ক, একলব্যাদির উপাখ্যান দ্বারা প্রাচীনকালে গুরুর প্রতি শিষ্যের কিরূপ ভক্তি ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে আর একটি কথা উঠিয়াছে যে, গুরুর উচ্ছিষ্টভক্ষণ প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল না, উহা বৌদ্ধদের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি; প্রাচীন সংহিতাশাস্ত্রে উহার উল্লেখ নাই। মনুসংহিতা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এরূপ আচার ভগবান্ মনুর সম্পূর্ণ অনুমোদিত। মনুসংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে গুরুর প্রতি শিষ্যের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার উল্লেখের পর অন্যান্য পূজনীয় ব্যক্তিগণের প্রতি ব্রহ্মচারীর ব্যবহার-প্রসঙ্গে এইরূপ কথিত হইয়াছে৭ যাঁহারা বিদ্যা ও তপস্যাদিদ্বারা সম্মানার্হ, শিষ্যের অপেক্ষা অধিকবয়স্ক, গুরুপুত্র (সমানজাতীয়) ও গুরুর জ্ঞাতিবর্গ—ইঁহাদের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুপুত্র যদি শিষ্যের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া নিজে শিষ্য হন, কিন্তু যদি তাঁহার অন্য শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবার শক্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার পিতার শিষ্যের যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌ভাবেই হউক বা দর্শকভাবেই হউক, যে কোন ভাবে উপস্থিত হইলে, পিতৃশিষ্যের নিকট গুরুর ন্যায় সম্মান পাইবেন। *

* বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবৎ মানমর্হতি॥

তবে ঐ গুরুপুত্রের প্রতি তাঁহার পিতার শিষ্যের ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণ বিভিন্ন হইবে।

"উৎসাদনং চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনম্॥"

অর্থাৎ এরূপ স্থলে পূর্ব্বোক্ত শিষ্য তাঁহার গুরুপুত্রের গাত্রমার্জ্জন, স্নাপন, উচ্ছিষ্ট-ভোজন ও পাদ-প্রক্ষালন করিবেন না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শিষ্য নিজ গুরুর গাত্রমার্জ্জন, উচ্ছিষ্ট-ভোজন ও পাদপ্রক্ষালনাদি সম্পাদন করিবে। গুরুপুত্রের প্রতি "গুরুবন্মানমর্হতি" এই বাক্য দ্বারা সমান ভক্তিপ্রদর্শন করিবার উপদেশ দিয়া, ঐরূপ গুরুপুত্রের গাত্রমার্জ্জনাদিরূপ পরিচর্য্যা—যাহা গুরুর প্রতি সম্পাদিত হইত, তাহার নিষেধ করা হইতেছে। বৌধায়ন তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে স্পষ্টরূপেই গুরুর প্রতি শিষ্যের এইরূপ পরিচর্য্যার বিধান করিতেছেন।

"প্রসাধনোৎসাদনোচ্ছিষ্টভোজনানি গুরোঃ"

অর্থাৎ গুরুর প্রসাধন (অলঙ্করণ), গাত্রমার্জ্জন ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে। বৌধায়নের এইরূপ স্পষ্ট বিধান থাকিলেও, বর্ত্তমানে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এই বিধানে ব্রহ্মচারী গুরুর এইরূপ পরিচর্য্যা করিবে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের পর কোন ব্রাহ্মণই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। কারণ, বৌধায়নের এই বচন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। এই বচনের এইরূপ অর্থসংকোচ করিবার প্রয়োজন বোধ হয় না। মনু বলিতেছেন যে, যদি কোন গুরুপুত্র তাঁহার পিতার শিষ্যের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে, কেবল উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি করিবে না। এই উপদেশও শুদ্ধ ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিতেছে না। ব্রহ্মচর্য্যের পর শিষ্যের গৃহস্থ অবস্থাতেও গুরুপুত্রের প্রতি ব্যবহার বিহিত হইতেছে। সুতরাং সে অবস্থায় গুরু শিষ্য-গৃহে উপস্থিত হইলে, শিষ্যের উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি আচার-পালন ত নিষিদ্ধ হইল না, বরং বিহিতই থাকিল বুঝিতে হইবে। মনুর ৪র্থ অধ্যায়ের ২১১ শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্ট "উচ্ছিষ্টং চ ভুক্তাবশিষ্টং অন্নং অবিশেষাৎ কস্যাপি ন ভুঞ্জীত। গুরূচ্ছিষ্টস্তু বিহিতত্বাদ্-ভোজ্যম্" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। গৃহস্থ (স্নাতক) দ্বিজ কাহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন খাইবে না। কিন্তু গুরুর উচ্ছিষ্ট বিহিত হেতু তাহা ভোজ্য বলিয়া জানিবে।

এই চতুর্থ অধ্যায়ে স্নাতক-ধর্ম্মও কথিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে যখন গুরুর উচ্ছিষ্ট কুল্লূক ভট্টের মতে বিহিত বলিয়া ভোজ্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন কোন ব্রাহ্মণই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না ও বৌধায়নের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট গুরুর উচ্ছিষ্ট-ভোজন কেবল ব্রহ্মচারীর জন্য বিহিত হইয়াছে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণের জন্য নহে, এইরূপ অর্থসংকোচ কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তাহা হইলে দেখা গেল, গুরু-ভক্তি ও গুরুর পরিচর্য্যা কেবল তন্ত্রশাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই,—বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শাস্ত্রই ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছে। আজকাল বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ধূয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক আচারই এখন বৌদ্ধ আচার বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। এখন আমাদের প্রাচীন ঋষি কপিল অনার্য্য বাঙ্গালী বলিয়া—আমরা নিজে সে গৌরবান্বিত মনে করিয়া আনন্দে তাণ্ডব-নৃত্য করিতে উদ্যত হইয়াছি। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

শ্রী———

কবিকথা।

(ভবভূতি)

মালতী-মাধব।

(১০)

মালতীকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া কামন্দকী, লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা বনের মধ্যে একস্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন, ও তাঁহার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। অশ্রুমোচন করিতে করিতে সকরুণভাবে কামন্দকী বলিতে-ছিলেন,—“হা বৎসে মালতি, আমার অঙ্কের অলঙ্কার, তুমি কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও, জন্মাবধি প্রতিমুহূর্ত্তে রমণীয় তোমার অঙ্গবিলাস এবং চারু ও মধুর প্রিয় বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া, আমার দেহ দগ্ধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অস্থির হাস্য-রোদনে সুন্দর, কতিপয় কোমল দন্তাঙ্কুরে

শোভিত, অর্দ্ধস্ফুট ও অসংবদ্ধ মনোহর বচনে পূর্ণ তোমার শৈশবের মুখপদ্মটি মনে পড়িতেছে।”

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকার নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হইতেছিল, তাঁহারাও বলিতে লাগিলেন,—“হা প্রিয়সখি, প্রসন্ন-চন্দ্রমুখি, তুমি কোথায় গেলে? দৈব একাকিনী তোমার শিরীষ-কুসুমের ন্যায় কোমল শরীরের কি পরিণাম ঘটাইল, তাহা ত জানিতে পারিতেছি না। হা মহাভাগ মাধব, তোমার জীবলোকের মহোৎসব উদিত হইয়া আবার অস্তমিত হইয়া গেল।”

দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,—“হা বৎস মাধব, হা বৎসে মালতি, লবলী-লবঙ্গের ন্যায় তোমাদের অভিনব, অনুরাগ-রসে পূর্ণ, কৌতুকময় আলিঙ্গন শেষে কিনা নিয়তি-বাত্যায় অভিহত হইয়া পড়িল?”

‘রে দুষ্ট বজ্রময় হৃদয়, তুই অত্যন্ত নৃশংস হইয়া উঠিয়াছিস্’ উদ্বেগ সহকারে এই কথা বলিতে বলিতে লবঙ্গিকা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ভূতলে পড়িয়া গেল। মদয়ন্তিকা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—“সখি লবঙ্গিকে, আমি বলিতেছি, ক্ষণমাত্র আশ্বস্ত হও।”

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—“মদয়ন্তিকে, কি করিব? দৃঢ় বজ্রলেপে প্রতিবদ্ধ হইয়া আমার প্রাণ যেন নিশ্চল হইয়া পড়িতেছে, তাই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।”

লবঙ্গিকার অবস্থা দেখিয়া, তখন কামন্দকী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—‘বৎসে মালতি, লবঙ্গিকা তোমার জন্মাবধি প্রিয়সখী, তবে সেই কণ্ঠাগতপ্রাণা দুঃখিনীর প্রতি দয়া করিতেছ না কেন? সে যে এক্ষণে তোমার বিয়োগে উজ্জ্বলালোক দীপশিখার ত্যাগে স্নেহবতী ম্লানমুখী বর্ত্তিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। আর কল্যাণি, আমাকেই বা পরিত্যাগ করিলে কেন? নির্দ্দয়ে, আমার এই জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলের তাপে তোমার অঙ্গলতিকা কি বাড়িয়া উঠে নাই? জননীর স্তন্যত্যাগের পর হইতে, সুমুখি, আমিই ত তোমাকে গজদন্ত-পুত্তলিকার ন্যায় প্রথমে খেলা, পরে কলাবিদ্যা শিখাইয়া বিনীত করিয়া তুলিয়াছি, অবশেষে লোকশ্রেষ্ঠ গুণবান্ বরে সমর্পণ করিয়াছি। তাই আমাকে মাতার অধিক স্নেহ করিতে! এক্ষণে এ কার্য্য কি তোমার উপযুক্ত হইতেছে? চন্দ্রমুখি, আমার সকল আশারই শেষ হইল। আমি মনে

করিয়াছিলাম, অকারণ হাস্তে মনোহর বদনটিতে ও বিকীর্ণ শ্বেতসর্ষপে ভূষিত-শিখ ললাটে সুন্দর তোমার পুত্রটিকে ক্রোড়ে শুইয়া স্তন্যপান করাইতে দেখিব, কিন্তু ভাগ্যপরিবর্ত্তনে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"ভগবতি, প্রসন্না হউন। আমি এক্ষণে আর জীবনভার সহ্য করিতে পারিতেছি না, ঐ গিরিশিখর হইতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সুখী হইবার ইচ্ছা হইতেছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জন্মান্তরেও প্রিয়সখীকে দেখিতে পাই।"

কামন্দকী উত্তর করিলেন,—"লবঙ্গিকে, কামন্দকীও মালতীর বিয়োগের পর আর বাঁচিয়া থাকিতেছে না, আমাদের দুজনেরই উৎকণ্ঠাবেগ সমান। যদি কর্ম্মভেদে পরে আমাদের মিলন নাও হয়, কিন্তু প্রাণত্যাগে সন্তাপ-শান্তিরূপ ফললাভ ঘটিবে।"

'আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই সত্য' বলিয়া লবঙ্গিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে কামন্দকী মদয়ন্তিকাকে আহ্বান করিলেন,—"বৎসে মদয়ন্তিকে!"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"আমাকে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন, আমি প্রস্তুত আছি।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"সখি, প্রসন্ন হও, এ আত্মনাশে ক্ষান্ত থাক, আমাকে ভুলিয়া যাইও না।"

মদয়ন্তিকা কোপের ভাব দেখাইয়া কহিলেন,—"তুমি দূর হও, আমি ত আর তোমার অধীন নহি।"

কামন্দকী বলিলেন,—"হায়! এ দুঃখিনীও নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছে।"

মদয়ন্তিকা তখন মনে মনে মকরন্দকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। লবঙ্গিকা বলিতে আরম্ভ করিল,—"ভগবতি, ঐ সেই মধুমতীস্রোতে পবিত্র পর্ব্বতের উচ্চস্থান দেখা যাইতেছে।"

কামন্দকী উত্তর দিলেন,—"তবে আর প্রস্তুত কার্য্যের বিলম্ব কেন?"

তাহার পর তাঁহারা গিরিশিখর হইতে মধুমতীবক্ষে পড়িবার উপক্রম করিলেন, সেই সময়ে আবার অন্ধকার ও বিদ্যুতের ভীষণ মিশ্রণে চক্ষুবৃত্তি

অভিভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া অদূরে মকরন্দ 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

মকরন্দকে দেখিয়া বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস মকরন্দকে যে দেখিতেছি।"

তাহার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, এ কি?"

তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মকরন্দ উত্তর দিলেন,—"কি আর বলিব, ইহা যোগেশ্বরীরই মহিমা।"

মকরন্দকে দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, মালতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই সময় দূর হইতে আবার শব্দ উঠিল, "ভয়ানক জনতা হইতেছে, মালতীর অবসান শুনিয়া সাংসারিক বিষয়ে ও জীবনে বিরক্তচিত্ত হইয়া অমাত্য ভূরিবসুর বহ্নিপতন নিশ্চয় করিয়া সুবর্ণবিন্দু আসিতেছেন, হায়! আমরা হত হইলাম।"

অমাত্যের পরিজনদিগের কথা বলিয়াই ইহা সকলে মনে করিবেন।

মালতী-মাধবের দর্শন-কল্যাণ, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অত্যাহিত ঘটায়, মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। কামন্দকী ও মকরন্দের নিকট তাহা যেন অসিপত্র ও চন্দনরস-বৃষ্টির পতন, অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও বিনামেঘে অমৃত-বর্ষণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আর বিধাতাও যেন তাহাকে সঞ্জীবনী ওষধি ও বিষের, আলোক ও তিমিরের এবং বজ্র ও চন্দ্র-কিরণের মিলনের সদৃশ করিয়া তুলিলেন।

সেই সময়ে নিকটে শব্দ হইল,—"হা পিতঃ, ক্ষান্ত হও, আমি তোমার বদন-কমল দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি, আমাকে অনুগৃহীত কর। আমার জন্য লোকালোক পর্ব্বতের বাহিরেও যে নির্ম্মল কুলের খ্যাতি বিস্তৃত, তাহার মঙ্গল-প্রদীপ-স্বরূপ আত্মাকে পরিত্যাগ করিতেছ কেন? আমি মনে করিয়া-ছিলাম, তোমরা বুঝি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছিলে।"

তখন ইহা মালতীর কথা বলিয়া সকলে বুঝিয়া লইলেন এবং কামন্দকী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হা বৎসে, জন্মান্তর হইতে লাভ করার ন্যায় তোমাকে রাহুর শশিকলাগ্রাসের মত আবার এক অনর্থ অভিভূত করিতে আসিল।"

আর আর সকলেও বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মূর্চ্ছিতা মালতীকে ধরিয়া মাধব সেখানে আসিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—"কোন-রূপে প্রবাস অতিক্রম করিয়া ইনি আবার দেখিতেছি, আর এক সংশয়ে পড়িলেন। অথবা ফলোন্মুখ ভাগ্যের দ্বার কোন্ প্রাণী রোধ করিতে পারে ?"

মকরন্দ তখন অগ্রসর হইয়া মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সখে, সেই যোগিনী কোথায় ?"

মাধব উত্তর দিলেন,—"আমি তাঁহার সহিত এখনই শ্রীপর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু বনচরদিগের কথা শুনিয়া তিনি কোন্ দিকে গেলেন, আর দেখিতে পাইলাম না।"

শুনিয়া কামন্দকী ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"মহাভাগে, আবার আমা-দিগকে রক্ষা করুন, আপনি কি জন্য অন্তর্হিতা হইলেন ?"

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা 'মালতি, মালতি' বলিয়া আহ্বান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মালতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে কামন্দকীকে কহিলেন,—"ভগবতি, রক্ষা করুন, নিঃশ্বাস-রোধে ইঁহার হৃদয় নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। হা অমাত্য, হা প্রিয়সখি, তোমরা দুজনেই দুজনার অবসানের কারণ হইয়া উঠিলে।"

কামন্দকী, মাধব এবং মকরন্দ বিলাপ করিতে লাগিলেন. ও সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সহসা যেন বিদীর্ণ জলদজাল হইতে তাঁহাদের অঙ্গে বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাতে সকলেরই চৈতন্য আসিল। কামন্দকী সেই অমৃত-বর্ষণের কথা বলিয়া উঠিলেন।

মালতী চৈতন্য লাভ করায়, তাঁহার উন্মুক্ত শ্বাসে বক্ষঃস্থল কম্পিত ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল, চক্ষু নিজ প্রকৃতি লাভ করিল, আর বদনটিও মূর্চ্ছানাশে শোভাময় প্রভাত-পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন বোধ হইতে লাগিল।

সেই সময়ে উর্দ্ধে শব্দ হইল,—"রাজা ও নন্দনের চরণপ্রণতি না শুনিয়া অমাত্য ভূরিবসু অগ্নিমধ্যে পতিত হইতেছিলেন, আমার কথায় তিনি প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন।"

মাধব ও মকরন্দ আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, সৌদামিনী জলদ-

জাল বিলোড়ন করিয়া তাঁহাদের নিকট আসিতেছেন। তখন তাঁহারা কামন্দকীকে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি, ভাগ্যক্রমে সেই যোগিনী আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছেন; আহা, তাঁহার বচনামৃতধারা জলধরের জলবর্ষণ হইতেও কত সুশীতল।"

কামন্দকী তাহাতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন, মালতীও উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। পরিব্রাজিকা মালতীকে সম্ভাষণ করিলে, তিনি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। কামন্দকী তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর তিনি মালতীকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তুমি বাঁচিয়া থাক, জীবন-স্বরূপকে বাঁচাও, তোমার সুহৃজ্জন বাঁচিয়া উঠুক। আর তুহিনশীতল অঙ্গে আমাকে এবং প্রিয়সখীকেও বাঁচাও।"

মাধব মকরন্দকে বলিলেন,—"বয়স্য, এক্ষণে মাধবের জীবলোক উপাদেয় হইয়া উঠিল।"

'তাহাই বটে' বলিয়া মকরন্দ উত্তর দিলেন। মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়সখি, তোমার দর্শন ত মনোরথেরও অতীত হইয়াছিল। তাই এস, আমাদিগকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ কর।"

মালতী উভয়কে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন, তখন কামন্দকী মাধব-মকরন্দের নিকট সমস্ত ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা উত্তর দিয়া কহিলেন,—"ভগবতি, কপালকুণ্ডলার কোপেই এই বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহার পর ঐ আর্য্যার অনুগ্রহেই অনেক চেষ্টায় তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করা গিয়াছে।"

শুনিয়া কামন্দকী কহিলেন,—"বুঝিয়াছি, ইহা অঘোরঘণ্টবধেরই ফল।'

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিলেন,—"বার বার নিদারুণ হইয়া, বিধাতা দেখিতেছি, পরিণাম-ফলটি রমণীয় করিয়া তুলিলেন।"

এই সময়ে সৌদামিনী অবতরণ করিলেন ও কামন্দকীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"ভগবতি, আপনার সেই চিরন্তন শিষ্য প্রণাম করিতেছে।"

কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,—"ভদ্রা! সৌদামিনীকে দেখিতেছি যে।"

বিস্ময় সহকারে মাধব ও মকরন্দ বলিলেন,—“ইনিই কি সেই সৌদামিনী, যাঁহার প্রতি ভগবতী এত পক্ষপাতিনী, তাহা হইলে এ সমস্ত সঙ্গত বটে।”

সৌদামিনীকে সম্ভাষণ করিয়া কামন্দকী বলিতে লাগিলেন,—“এস, এস, বহুলোকের প্রাণদানের পুণ্যসম্ভার তুমি ধারণ করিতেছ। অনেক দিন পরে তোমাকে দেখিলাম। আমার অঙ্গ তোমার দত্ত আনন্দে পুলকিত হইলেও আলিঙ্গনদানে আবার তাহাকে আনন্দিত করিয়া তুল। তুমি ত সৌহার্দ্দের আধার, প্রণাম করিতে বিরত হও। তুমি জগতের পূজনীয়, তুমি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা কাহার বা স্পৃহণীয় নহে; আর তোমার এই সকল কার্য্যে তুমি বোধিসত্ত্বদিগকেও অতিক্রম করিয়াছ। আমার প্রতি তোমার আচরণরূপ বৃক্ষের পূর্ব্ব-পরিচয়ে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রকৃত ফল প্রসব করিল।”

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিলেন,—“ইনিই কি সেই আর্য্যা সৌদামিনী?”

তখন মালতী বলিতে লাগিলেন,—“তাহাই সত্য, ইনিই ভগবতীর সম্বন্ধে পক্ষপাতিনী হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ভৎর্সনা করিয়া আমাকে নিজ আবাসে লইয়া যান, ও ভগবতীর ন্যায় যত্ন করেন। তাহার পর বকুলমালা দেখাইয়া তোমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছেন।”

শুনিয়া মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“কনিষ্ঠা ভগবতী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হউন।”

মাধব-মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—“চিন্তামণিও যাচকের চিন্তারূপ পরিশ্রমের অপেক্ষা করে, কিন্তু ইহা আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে, আর্য্যা অচিন্তিতই সমস্ত করিলেন।”

ইহাঁদের সকলের সৌজন্যে সৌদামিনীর লজ্জাবোধ হইতেছিল, তিনি তখন একখানি পত্র দেখাইয়া বলিলেন,—‘ভগবতি, নন্দনের সম্মতিক্রমে পদ্মাবতীশ্বর ভূরিবসুর সমক্ষে এই পত্রখানি লিখিয়া মাধবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

এই বলিয়া সৌদামিনী পত্রখানি দিলে, কামন্দকী লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"তোমাদের স্বস্তি হউক, মহারাজ আদেশ করিতেছেন,—তুমি শ্লাঘ্য গুণিগণের অগ্রণী, মহাকুল-প্রসূত, শ্রেষ্ঠ জামাতা। তোমার সমস্ত বিপদ্ দূরে গিয়াছে, আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আবার তোমার প্রীতির জন্য তোমার প্রিয় সখা মকরন্দকে পূর্ব্বানুরাগিণী মদয়ন্তিকা সমর্পণ করিতেছি।"

পাঠ শেষ করিয়া কামন্দকী মাধবকে কহিলেন,—"বৎস, শুনিলে ত?"

মাধব উত্তর দিলেন,—"শুনিলাম, এক্ষণে আমি সকল প্রকারেই কৃতার্থ হইলাম।"

মালতী বলিয়া উঠিলেন,—"সৌভাগ্যক্রমে এখন হৃদয়ের শঙ্কা-শল্য উৎপাটিত হইল।"

লবঙ্গিকা বলিল,—"শ্রীমাধবের ও মালতীর মনোরথ এতদিনে সম্পূর্ণরূপে ফললাভ করিল।"

সেই সময়ে অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা কলহংসের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন, মকরন্দ তাহা সকলকে জানাইয়া দিলেন।

অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংস উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার নৃত্য আরম্ভ করিলেন, পরে কামন্দকীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"কার্য্য-নিধানা ভগবতীর জয় হউক।"

তাহার পর মাধবকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন,—"মকরন্দের আনন্দবর্দ্ধক মাধব পূর্ণচন্দ্রের জয়, ভাগ্যক্রমে তোমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিল।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"কে এই পূর্ণ মহোৎসবে আমোদ না করিয়া থাকিতে পারে?"

কামন্দকী বলিলেন,—"সত্য বটে, ইহার ন্যায় বিচিত্র, রমণীয় ও উজ্জ্বল মহা প্রকরণ আর কি কোথাও আছে?"

সৌদামিনী কহিলেন,—"ইহা আরও রমণীয় যে, অমাত্য ভূরিবসু ও দেবরাতের পরস্পর অপত্য-সম্বন্ধের মনোরথ অনেক দিন পরে পূর্ণ হইল।"

শুনিয়া মালতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"সে আবার কি?"

কৌতুক সহকারে মাধব-মকরন্দ কামন্দকীকে বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতি, ব্যাপার ত একরূপ হইল, কিন্তু আর্য্যার কথাতে অন্যরূপ বোধ হইতেছে।"

লবঙ্গিকা চুপে চুপে কামন্দকীকে কহিল,—"ভগবতি, এক্ষণে কি প্রতিপন্ন করিবেন ?"

কামন্দকী মনে মনে ভাবিলেন যে, মদয়ন্তিকার সম্বন্ধে যখন নন্দন তাঁহাদের দিকেই আসিয়াছেন, তখন আর কোন আশঙ্কা নাই। তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাপার একইরূপ, পঠদ্দশায় আমার ও সৌদামিনীর সমক্ষে দেবরাত ও ভূরিবসু পরস্পরের অপত্য-সম্বন্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। নন্দনের ভয়ে এতদিন তাহা গুপ্ত ছিল।"

শুনিয়া মালতী, মাধব ও মকরন্দ, এই কল্যাণকরী সম্বরণ-নীতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর কামন্দকী মাধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস, আয়ুষ্মান্ তোমাদের যে কল্যাণ পূর্ব্বে মনোরথমাত্রে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুণ্যফলে আমার উদ্যোগে এবং আমার শিষ্যাদ্বয়ের ক্লেশস্বীকারে তাহা ফলিত হইল। আর তোমার প্রিয় সখার সহিত কান্তার সম্মিলনও ঘটিল, রাজা ও নন্দন প্রীত হইলেন, এক্ষণে তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য আছে, বল।"

আনন্দ-সহকারে প্রণাম করিয়া মাধব উত্তর দিলেন,—"ভগবতি, ইহার পর আর কি প্রিয়কার্য্য থাকিতে পারে ? তথাপি আপনার পদ-প্রসাদে সাধুগণ পাপ-বিরহিত হইয়া নিরন্তর পুণ্যশীল হউন। ধর্ম্ম-পথে অবস্থিতি করিয়া রাজারা বসুধা পরিপালন করুন। মেঘ-সকল কালে বারিবর্ষণ করিতে থাকুক। আর পুণ্যফলে স্থির থাকিয়া বন্ধুবান্ধব ও সুহৃদ্‌গোষ্ঠীর সহিত প্রজাবৃন্দ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক।"

'তাহাই হউক' বলিয়া পরিব্রাজিকা আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর সকলে সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

কুমার-কুমারীর প্রণয়ে পিতা-মাতাদি গুরুজনের অনুমোদনের প্রয়োজন। চক্ষুরাগে প্রণয় জন্মে বটে, কিন্তু সংযমের দ্বারা তাহার চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে হয়। অবোধ প্রণয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে। প্রগাঢ় প্রণয়ের চিত্রসহ এ সকলেরও সুন্দর চিত্র মালতী-মাধব হইতে জানা যায়।

অলকা।

কোরক সেথা কোরক থাকে উঠে না ফুটি'
কুসুম চির-নূতন থাকে পড়ে না টুটি'।
অফুরন্ত সেথায় মধু কনক-কমলে,
জড়াজড়ি নিতুই সেথা সবুজ শ্যামলে!
সুন্দরেরি মন্দিরেতে বন্দী সেথা কাল,
মৃত্যু জরা পায় না সেথা ফেল্‌তে শরজাল।
সত্য সেথা নিত্য থাকে বিচিত্রে ভরা
চমকে দাঁড়ায় বিশ্ব হয়ে আনন্দে হারা!
মহা কবির রাজ্য সেটি কল্পনা মাখা,
অমর চিত্রকরের ছবি মর্ম্মরে আঁকা।
স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য সেথা মিলেছে এসে,
মন্দাকিনীর স্রোতে কিছু পলায় না ভেসে।
মানস-সরের সঞ্জীবনী সলিল পরশে
অনিত্য হয় নিত্য সেথা বিপুল হরষে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মিলনের শেষ।

[গল্প]

(১)

উমাচরণ ও তারাচরণ নামে দুই ভ্রাতা একটি গ্রামে বাস করিত। উভয় ভ্রাতার মধ্যে উমাচরণই জ্যেষ্ঠ। উভয়ের প্রণয় অত্যন্ত প্রগাঢ়, পরন্তু উভয়েই উভয়ের জীবনস্বরূপ। আহারে, বিশ্রামে, কার্য্যে, পরামর্শে পরস্পর পরস্পরের সহচর। সকলেই বলিত,—'ইহাদের ভ্রাতায় ভ্রাতায় বেশ প্রণয়,—যেমন রাম-লক্ষ্মণ।'

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে উমাচরণ ও তারাচরণ প্রৌঢ়। সংসারে উমাচরণের স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ, এক পৌত্র ও এক পৌত্রী, এবং তারাচরণের এক পুত্র ও পুত্রবধূ বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন তারাচরণের একটি কন্যা শ্বশুরালয়ে ছিল। প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে তারাচরণের পত্নী জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছে।

উমাচরণ বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক। জমিতে ১৫।১৬ খানা হাল বয়। তাহার গোলাবাড়ী নানাবিধ শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। দুগ্ধবতী গাভীতে গোয়াল পূর্ণ এবং বাড়ীর নিকটে মৎস্যপূর্ণ একটি প্রকাণ্ড সরোবর আছে। মা লক্ষ্মীদের যত্নে গৃহ, প্রাঙ্গণ বেশ ঝক্‌ঝকে ও তক্‌তকে; একটি সূচ পড়িলেও হারাইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলেই হউক অথবা ইহজন্মের অধ্যবসায়-গুণেই হউক, কোন জিনিসের জন্য উমাচরণকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না।

এই কৃষক-পরিবারের মধ্যে এমন একটি সদ্‌গুণ নিহিত আছে, যাহা প্রত্যক্ষ বা শ্রবণ করিতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। সে গুণটি—প্রণয় বা মিলন। ভাইয়ে ভাইয়ে, বধূতে বধূতে, পিতা-পুত্রে যেরূপ প্রণয়, স্নেহ ও ভক্তি দৃশ্যমান, তাহা বস্তুতই শিক্ষার যোগ্য।

উমাচরণের স্ত্রী প্রত্যহ পতিদেবতার পদধূলি লইয়া পরে জলপান করিত। সে তারাচরণের পুত্র ও পুত্রবধূকে আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ অপেক্ষা এবং তারাচরণকে সহোদরাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত। তাহারাও উমাচরণের স্ত্রীকে মাতৃতুল্য ভক্তি করিত। সকালে সন্ধ্যায় উমাচরণের স্ত্রী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত,—"ভগবন্! এই সকল পরিবার রাখিয়া ছোটবধূর (তারাচরণের স্ত্রী) মত আমাকে স্বামীর পদতলে মরিতে দিও।"

উমাচরণ ও তারাচরণ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর অধিকক্ষণ ছাড়াছাড়ি হইত না। কিছুক্ষণ কেহ কাহাকেও দেখিতে না পাইলে, সন্ধানের জন্য বাহির হয়। এই ভ্রাতৃভাবের মধুর দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া, সকলেই একান্ত মুগ্ধ হইত। শতসহস্র মুখে তাহাদের গুণের প্রশংসা হইত। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যাহারা এই মধুর মিলনকে বিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিত। তাহারা এই মিলন-বন্ধন ছেদন করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট

থাকিত। কেহ কেহ উমাচরণের, আবার কেহ কেহ বা তারাচরণের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তিলকে তালে পরিণত করিয়া, তাহাদের হৃদয়ে ভ্রাতৃদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু উমাচরণ ও তারাচরণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সকল কথাই হাসিয়া উড়াইয়া দিত। পরন্তু কখনও তাহাদের সঙ্গে ভালরূপে মিশিত না,—ইচ্ছা করিয়া তাহাদের মজ্‌লিসে যোগ দিত না। সেই জন্য ঐ নিন্দুকগণ উমাচরণ ও তারাচরণর নিন্দা করিয়া সময় সময় বলিত,—"বিষয়ের জন্য ওদের এখন মেজাজ পাওয়া কঠিন। কেহ কাহারও কথা শুনে না, আমাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞানই করে। মজ্‌লিসে যোগ দেওয়াত দূরের কথা, গুরুপুত্রদ্বয়কে দেখা পাওয়াই ভার। এয়সা দিন্ নেহি রহেগা।"

(২)

একবার গ্রহণের সময় যোগ পাইয়া, কয়েকজন গ্রামের লোকের সহিত উমাচরণ ও তারাচরণ কালীঘাটে কালীদর্শন ও গঙ্গাস্নান করিতে গেল। সাধ্বী সতী উমাচরণের পত্নীও পতির অনুগামিনী হইল।

কালীঘাটে পৌঁছিলে পর সকলে যথাসময়ে গঙ্গাস্নান করিয়া, কালীমাতার পূজা ও দর্শনকার্য্য শেষ করিল ; অতঃপর উমাচরণ সকলকে এক জায়গায় রাখিয়া, জলযোগ করিবার জন্য কিছু সন্দেশ আনিতে বাজারে গেল। একে অপরিচিত স্থল, তাহাতে আবার কলিকাতা হইতে কালীঘাট ও গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রাস্তা, মাঠ, ঘাট, লোকে পরিপূর্ণ। সুতরাং সন্দেশ লইয়া নির্দ্দিষ্ট জায়গায় উপনীত হইতে উমাচরণের দিগ্‌ভ্রম হইল। উমাচরণকে এদিক্ ওদিক্ হইতে দেখিয়া কয়েকজন জুয়াচোর কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উমাচরণ সরলভাবে সকল কথাই প্রকাশ করিল, এবং তাহার সঙ্গিগণ যে স্থানে রহিয়াছে, সেই স্থানে যাইবার পথ দেখাইতে বলিল। জুয়াচোরগণ অন্য একদিকে রাস্তা দেখাইয়া দিয়া, তাহার অলক্ষিতে পিছু ধরিয়া চলিল।

কিছুক্ষণ পরে এক জায়গায় ভয়ানক গোলমাল উঠিল। ৩৪জন লোক একজনকে ধরিয়া 'চোর চোর' রবে প্রহার করিতেছে। এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, কয়েকজন পুলিস-প্রহরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যে লোকগুলি প্রহার করিতেছিল, তাহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, একজন

বলিয়া উঠিল,—"এই শালা চোর, আমার কোমর হইতে ৫০৲ টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিল।" এই কথা শুনিয়া প্রহার-পীড়িত ব্যক্তি ভয়ে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেল, তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। পুলিস-প্রহরিগণ চোর সাব্যস্ত করিয়া, তাহাকে বন্ধনাবস্থায় থানায় লইয়া গেল এবং উক্ত লোকগুলিও থানায় দারোগার নিকট আপনাদের এজাহার ও নাম, ঠিকানা লেখাইয়া আসিল। যে ব্যক্তিকে বন্ধনাবস্থায় লইয়া গেল, বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তি উমাচরণ। আর যে লোকগুলি চুরির চার্জ্জ করিল, তাহারা উমাচরণের পথপ্রদর্শক দুর্ব্বৃত্ত জুয়াচোরগণ। তাহারাই উমাচরণের কোমর হইতে ৫০৲ টাকা কাড়িয়া লইয়া, উমাচরণকে চোর সাজাইয়াছে।

অগ্রজের বিলম্ব দেখিয়া তারাচরণ সঙ্গিগণের সহিত তাহার সন্ধানে বাহির হইল; অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিল,—অনেক জায়গা ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গিগণ আহারান্তে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। তারাচরণ ও উমাচরণের স্ত্রী উপায়ান্তর না দেখিয়া, অনিদ্রায় অনাহারে শোকসন্তপ্তচিত্তে রাত্রিযাপন করিল।

প্রভাত হইলে, সঙ্গিগণ বাড়ী রওনা হইবার জন্য ষ্টেশনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তারাচরণ বৌদিদিকে তাহাদের সঙ্গে বাড়ী যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সে পতি ছাড়িয়া বাড়ী যাইতে চাহিল না। "এই অপরিচিত জায়গায় তুমি সঙ্গে থাকিলে, দাদার তল্লাসে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে" ইত্যাদি অনেক বুঝাইয়া তারাচরণ বৌদিদিকে তাহাদের সঙ্গে বাড়ী পাঠাইল।

(৩)

তারাচরণ পুনরায় অগ্রজের সন্ধানে বাহির হইল। সে সময় একাকী থাকায়, সে তাড়াতাড়ি কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়, গলীতে গলীতে দাদার খোঁজ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াও কোন ফল হইল না। সন্ধ্যা হইলে তারাচরণ রাত্রিযাপনের জন্য একটি পান্থশালায় আশ্রয় লইল। নানাবিধ কুচিন্তার উদয় হইয়া তাহার হৃদয়ে গুরুতর আঘাত করিল।

সে বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। পান্থনিবাসের অন্যান্য সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তারাচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। এইরূপে অনিদ্রায় অনাহারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তারাচরণ সে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রত্যূষে পান্থনিবাস পরিত্যাগ করিয়া তারাচরণ অগ্রজের সন্ধান করিতে লাগিল। অনেক স্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেলা দুই প্রহরের সময় এক জেল-খানার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময় কয়েকজন পুলিস-প্রহরী একদল বন্দীকে লইয়া জেলখানার মধ্যে প্রবেশ করিল। তারাচরণ তাহা অবলোকন করিয়া, 'দাদা গো' বলিয়া পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। জেলরক্ষক তখন জেলখানার সম্মুখেই ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দুই জন কন্‌ষ্টেবলকে পাঠাইয়া তারাচরণকে উঠাইয়া আনাইলেন। বহু চেষ্টার পর তারাচরণের চৈতন্যলাভ হইল। সে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ক্ষীণ-স্বরে ডাকিল,—'দাদা!' জেলরক্ষক বুঝিলেন, লোকটি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। তখন তিনি তারাচরণের জন্য কিছু খাবার ও পানীয় জল আনাইলেন। কিন্তু তারাচরণ তাহা দেখিয়া বলিল,—"দাদাকে খাইতে না দেখিলে, আমি কিছুই খাইব না।"

জেল-রক্ষক বলিলেন,—"তোমার দাদা কোথায় আছে?"

তারা।—এইমাত্র এই জেলখানায় প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

এই কথা শুনিয়া জেলরক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তারাচরণকে সঙ্গে লইয়া জেলখানার মধ্যে বন্দিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বন্দী-দিগকে দেখিবামাত্র তারাচরণ 'দাদা গো' বলিয়া পুনরায় আছাড় খাইয়া পড়িল। উমাচরণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "তারু, উঠ ভাই, এই যে আমি" এই কথা বলিয়া তারাচরণের হস্ত ধরিয়া উঠাইল। তারাচরণ অগ্রজের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। উমাচরণও স্থির থাকিতে না পারিয়া ভ্রাতার সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল।

জেলরক্ষক উভয়কে সান্ত্বনা করাইয়া আমূল বিবরণ জানিতে চাহিলেন। তারাচরণ কাঁদকাঁদস্বরে আদ্যন্ত সকল ঘটনাই প্রকাশ করিয়া, জেলরক্ষকের নিকট অগ্রজের মুক্তি-প্রার্থনা করিল।

যে মহকুমার মধ্যে উমাচরণের বাড়ী, জেলরক্ষক অনেক দিন পূর্ব্বে সেই মহকুমাস্থিত জেলে থাকিতেন এবং উমাচরণ ও তারাচরণ কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাও তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি কয়েক জায়গায় বদলী হইয়া শেষে কলিকাতার মধ্যে এই জেলের কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন। বহুকাল গত হইল, বিশেষতঃ অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং তিনি প্রথমে উমাচরণ কিংবা তারাচরণকে চিনিতে পারেন নাই। এক্ষণে নিজের পরিচয় দিয়া তিনি উমাচরণকে জেল-খানা হইতে বাহির করিলেন, এবং শীঘ্রই যে উমাচরণ মুক্তিলাভ করিবে, তাহাও বলিলেন।

একজন কারাপ্রহরী জেলরক্ষককে বলিল,—"হুজুর, এই লোকটি ছোট ভাইয়ের বিচ্ছেদে আজ ৩দিন হইতে কিছুই খায় নাই।"

জেলরক্ষক মুচ্‌কি হাসিলেন; কারণ, তাহাদের ভ্রাতৃপ্রণয় যে কিরূপ প্রগাঢ়, তাহা তিনি বহুপূর্ব্ব হইতেই জানিতেন।

অতঃপর জেলরক্ষক ভ্রাতৃযুগলকে অপনার বাসায় লইয়া গিয়া আহার করিতে দিলেন। আজ ৩ দিবসের পর ভ্রাতৃযুগল একস্থানে বসিয়া পরমানন্দে ভোজন করিল।

ইতিপূর্ব্বে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় বাদিগণের এজাহার লইবার জন্য তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইতে নোটীস দিয়াছিলেন। তাহারা পূর্ব্বে দারোগার নিকট কলিকাতামধ্যেই আপনাদের ঠিকানা বলিয়া-ছিল। কিন্তু চাপরাসী তাহাদের কোন সন্ধান না পাইয়া নোটীস ফিরাইয়া আনিল। তাহারা যে জুয়াচোর, পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের তাহা জানিতে কিছুমাত্র বাকী রহিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আদেশপত্র দ্বারা উমাচরণের কারামুক্তি জানাইলেন।

উমাচরণ ও তারাচরণ জেলরক্ষক বাবুর নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিল। উমাচরণের পত্নী ইতিপূর্ব্বে বাড়ী আসিয়াই শয্যায় আশ্রয় লইয়াছিল; পতির বিরহে আহার-নিদ্রা সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিল। পরন্তু দিবানিশি রোদন হেতু তাহার চক্ষু ও গণ্ডস্থল রক্তিমাকার ধারণ করিয়া, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। পতির আগমন-সংবাদ শ্রবণ

করিয়া সে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে পতির চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

পরে উমাচরণের পত্নী দেবতুল্য পতি ও ভ্রাতৃতুল্য দেবরকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া শেষে পতির প্রসাদ পাইল। উমাচরণকে দেখিবার জন্ত দলে দলে গ্রামের লোক আসিতে লাগিল। সকলকে মিষ্টকথায় সম্ভাষণ করিয়া উমাচরণ আপনার বিপদের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল,—"আমরা ভাব্‌তাম যে, কল্‌কাতার গুণ্ডারা উমাচরণকে একাকী পাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।"

প্রত্যুত্তরে উমাচরণ বলিল,—"এরূপ গুণের ভাই ও স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, ও রকম বিপদ ঘটিতে পারে না।"

(৪)

পুত্রদিগকে উপযুক্ত দেখিয়া, উমাচরণ ও তারাচরণ সাংসরিক কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখে না। পুত্রদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহারা দুই ভাইয়ে সময় সময় তীর্থযাত্রা করিয়া বেড়ায়। বলা বাহুল্য, উমাচরণের পত্নী সকল তীর্থেই উমাচরণের সহযাত্রিণী।

এক বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর হওয়ায়, কয়েকজন গ্রাম্যলোকের সহিত উমাচরণ ভ্রাতা ও পত্নীকে লইয়া, জগন্নাথদেব-দর্শনার্থ বাড়ী হইতে রওনা হইল। জগন্নাথদেবের কৃপায় সকলেই যথাসময়ে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রথযাত্রার দিন যথাকালে জগন্নাথদেব অগ্রজ বলরাম ও ভগ্নী সুভদ্রা-দেবীকে লইয়া রথারোহণে বাহির হইলেন। তাঁহাদের শ্রীপদপঙ্কজ-দর্শনাশায় লক্ষ লক্ষ নরনারী পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। রথোপরি ঠাকুরদিগকে দর্শন করিয়া সকলেই প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'জয় জগদীশ' 'জয় বলভদ্রজী' 'জয় সুভদ্রামায়ী' স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। আনন্দ হইবারই কথা! আজ কাঙ্গালের ঠাকুর ডাঙ্গালে,—আজ ঠাকুরের অবারিত দ্বার। সাধু-সন্ন্যাসী, পাপী-তাপী, হিন্দু অহিন্দু, আজ সকলেরই ঠাকুর দর্শনের সমান অধিকার। আনন্দ নয় কি?

ঊর্দ্ধে নীলাকাশ,—নিম্নে জলধি-বালুকাবৃত নীলাচল,—মধ্যে রথমঞ্চোপরি নীলাম্বকান্তমণি জগন্নাথ প্রভু। কি সুন্দর মিলন! কি মহান্ দৃশ্য!! কি অপরূপ রূপমাধুরী!! এ দৃশ্য দেখিয়াও শেষ করা যায় না,—বর্ণনায়ও শেষ হয় না। এ অয়স্কান্ত দর্শনেই শুদ্ধ,—স্পর্শনের ত কথাই নাই। ঠাকুরদের রথ টানিবার জন্যে সহস্র সহস্র যাত্রী যাইয়া রথরজ্জু ধারণ করিতে লাগিল। উমাচরণও স্ত্রী ও ভ্রাতাকে লইয়া জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া রথরজ্জু ধারণ করিল।

যাত্রীদিগের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে উমাচরণের স্ত্রী রথের সম্মুখে উল্টাইয়া পড়িল। কত শত যাত্রী যে তাহাকে দলিত করিয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই। উমাচরণের স্ত্রী আর সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। ঘর্ ঘর্ শব্দে রথের চাকা তাহার শরীরের উপর দিয়া পার হইয়া গেল।

পত্নীর অবস্থা অবলোকন করিয়া উমাচরণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সে পত্নীর মস্তক স্বীয় কোলে স্থাপন করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিতে লাগিল। তারাচরণও কাঁদিতে কাঁদিতে বৌদিদির পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল। নিদারুণ আঘাতের বেদনায় উমাচরণের পত্নী কথা কহিতে পারিল না। কেবল অশ্রুজলে নয়ন ভাসাইয়া দক্ষিণহস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক দেবরকে ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিল।

উমাচরণ ও তারাচরণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, শত শত লোক তাহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই বুঝিতে পারিল, উমাচরণের স্ত্রীর মৃত্যু সন্নিকট। বহুভাগ্যবতী রমণী বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

এমন সময়ে জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে দুই জন যুবক দ্রুতপদে আগমন করিয়া 'মা! 'মা!' রবে কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। উমাচরণ ও তারাচরণ সবিস্ময়ে যুবকদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। উমাচরণের পত্নী বাহুতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে মাথা তুলিয়া চাহিল; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না; আবার মস্তকখানি পতির উরুতে আসিয়া লাগিল। অতঃপর উমাচরণের পত্নী ক্ষীণকণ্ঠে আধ আধ স্বরে "জ—গ—দীশ ধ—ন্য—হ—লেম" বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিল। আর কোন কথা মুখ হইতে বাহির হইল না। দেখিতে দেখিতে নিমেষমধ্যেই পুণ্যক্ষেত্রে ভাগ্যবতীর জীবনলীলা শেষ হইল।

উমাচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"সতি! আজ তোমার বিপরীত ভাব কেন? যে উমাচরণকে পলকহারা হ'লে তুমি প্রলয় জ্ঞান করতে, আজ হ'তে সেই হতভাগাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি একাকী কিরূপে থাকিবে? তুমি জগদীশ্বরের কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে—'জগদীশ! আমাকে পতির কোলে মরিতে দিও।' জগদীশ্বর তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এক্ষণে আমি প্রার্থনা করিতেছি—জগদীশ! আমাকে সতীর অনুগামী কর। বল সতি! প্রভু কি আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না?"

(৫)

সহসা যে যুবকদ্বয় আসিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে একজন উমাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বামাচরণ এবং অপরটি তারাচরণের পুত্র কালীচরণ। উমাচরণ ও তারাচরণ জগন্নাথদেব-দর্শনের জন্য বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিলে, তাহাদেরও দুই ভাইয়ের হৃদয়ে জগন্নাথ দর্শন করিবার বাসনা বলবতী হয়। পরদিন তাহারাও ছোটভাই শ্যামাচরণকে বাড়ীতে রাখিয়া জগন্নাথধামে রওনা হয়। প্রথমে উমাচরণ ও তারাচরণের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎলাভ হয় নাই। কিন্তু এই বিপদ্ঘটনা দেখিতে আসিয়াই তাহাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল; পরন্তু স্নেহময়ী জননীর অন্তিমকাল স্বনয়নে অবলোকন করিল। জননীও জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ জ্ঞানে জীবন ত্যাগ করিল।

এই বিপৎকালেও সকলে আনন্দিত-মনে মৃতদেহের সৎকার্য্য সমাধা করিল। কালের অলঙ্ঘনীয় নিয়মবলে উমাচরণের স্ত্রীর ভস্মাবশিষ্টদেহ সমুদ্রের বালুকাকণাসহ মিশিয়া গেল।

উমাচরণের নিকট সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের আনন্দ, মুখের হাসি, বন্ধুজনের সহিত বাক্যালাপ প্রভৃতি সমস্তই ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। অগ্রজের এই ভাব সন্দর্শন করিয়া তারাচরণও ব্যথিত, সেও বিষণ্ণবদনে অগ্রজের নিকট উপবিষ্ট।

উমাচরণ আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া, ভ্রাতার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং ক্ষীণকণ্ঠে ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"ভাই,

বোধ হয়, তোমার সঙ্গে আমারও এই শেষ দেখা। পতিব্রতা সতী যে দেশে গমন করিয়াছে, আমিও সেই দেশে চলিলাম। আমি আর বাঁচিব না, কারণ, আমার কলেরা হইয়াছে। ৪।৫ বার দাস্ত ও বমি করিয়াছি,—প্রস্রাবও বন্ধ হইয়াছে। তোমরা ইহার কিছুই জান না, অথচ আমিও জানাই নাই। কিন্তু এবারে আমার শরীর অত্যন্ত অবশ হইয়াছে। এ সময়ে চিকিৎসা করাও বৃথা। দেখো ভাই, এই ছেলেগুলিকে…”

অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় উমাচরণ আর কথা বলিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে দাস্ত ও বমি হইল। তারাচরণ তাহা পরিষ্কার করিয়া, একটি শয্যার উপরে উমাচরণকে শোয়াইল, এবং তাহার আদেশে বামাচরণ ও কালীচরণ ডাক্তার আনিতে গেল। তখন রাত্রি প্রহরাধিক হইয়াছে। ডাক্তার বাবু আসিয়া রোগীর অবস্থা ভাল বুঝিলেন না। তিনি রোগীকে ঔষধ দিয়া ও নিজের পারিশ্রমিক লইয়া চলিয়া গেলেন। পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রসহ তারাচরণ সমস্ত রাত্রি অগ্রজের সেবায় অতিবাহিত করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে উমাচরণের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইল। সকলেই জানিল যে, উমাচরণের আর বাঁচিবার আশা নাই। বামাচরণ ও কালীচরণ কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তারাচরণ নীরবে ভ্রাতৃসেবায় নিযুক্ত।

একবার গদগদকণ্ঠে তারাচরণ ডাকিল,—“দাদা!” উমাচরণ অশ্রুসিক্ত-নয়নে তারাচরণের দিকে চাহিয়া বলিল,—“কি ভাই?” তারাচরণ পুনরায় ডাকিল,—“দাদা!” উমাচরণ এবার দুই হস্তে তারাচরণের গলা জড়াইয়া বলিল,—“ভাই,—ভাই, আমার প্রেমবারিসিঞ্চিত সংসার-কাননের নির্ম্মল পারিজাত-স্বরূপ পরম ভ্রাতৃভক্ত ভাই! এতদিন পরে আজ আমাদের মিলনের শেষ! যে সকল মন্দব্যক্তি আমাদের এই ভ্রাতৃমিলনকে বিষনয়নে নিরীক্ষণ করিত, এতদিন পরে তাহাদের কামনা পূর্ণ হইল! অহো! কি মধুর বুলি—ভাই!—ভাই!!—ভাই!!!”

এতক্ষণ পরে তারাচরণ কাঁদিয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“দাদা! কি বল্লে, মিলনের শেষ? এখনই মিলনের শেষ, না জীবনের শেষে মিলনের শেষ দাদা?”

ক্ষীণস্বরে উমাচরণ বলিল,—"না ভাই, এখন নয়। জীবনের শেষে মিলনের শেষ।"

তারাচরণ চক্ষু মুছিল। সে যে কি ভাবের কথা বলিল,—তাহার কথায় যে কিরূপ তথ্য নিহিত আছে, উমাচরণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে উমাচরণের বাক্য বন্ধ হইল, আর কথা বলিতে পারিল না। সে ইঙ্গিতে ভ্রাতাকে জানাইল যে, আমার জীবনের শেষ। পরে কয়েকটি হিক্কা তুলিয়াই উমাচরণ পরম পুণ্যময় জগন্নাথধামে জীবন-লীলা সংবরণ করিল।

"দাদা গো! কোথায় ফেলে যাও" এইকথা বলিয়া তারাচরণ মৃত উমাচরণের চরণ-যুগলে আছাড় খাইয়া পড়িল। আর বাক্য নির্গত হইল না; শরীর নিস্পন্দ ও নিশ্চল হইয়া গেল। বামাচরণ ও কালীচরণ তাড়াতাড়ি উঠাইয়া দেখিল, তাহারও প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। পরম ভ্রাতৃভক্ত ভ্রাতা অগ্রজের চরণে মাথা রাখিয়া জীবন-শেষের সঙ্গে ইহকালের মিলনের শেষ করিল। কিন্তু এই মিলনের শেষ যে পরকালের মধুর মিলনে পরিণত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

কয়েকজন সঙ্গীর সহিত শোকাতুর ভ্রাতৃদ্বয় উমাচরণ ও তারাচরণের মৃতদেহ সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া সৎকার সমাধা করিল। সে সময় সমুদ্রে স্নান করিতে করিতে একদল তীর্থযাত্রী গাহিয়া উঠিল:—

"বাবা ভালে বিরাজে হো
ঠাকুর জী ভালে বিরাজে হো

উড়িষ্যা জগন্নাথ পুরীমে ভালে বিরাজে হো।"

গানটি শুনিয়া বামাচরণ ও কালীচরণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহারাও মনে মনে গানটির আলোচনা করিয়া, আপনাদের ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিল।

সৎকার শেষ করিয়া ভ্রাতৃযুগল সঙ্গিগণের সহিত সেই দিনই বাড়ী রওনা হইল; বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে পিতামাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিল। এই কার্য্যোপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও কুটুম্ব নিমন্ত্রিত হইয়া-

ছিলেন। নিঃস্বার্থ সেবা ও দানকার্য্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

দিল্লী।

মুসলমান রাজত্বকাল।

(মোগলবংশ—বাবর ও হুমায়ুন)

বাবর তৈমুরের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ওমার সেথ মিরজা ফর্গনা প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বাবরের পিতৃব্যগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেও বাবর ফর্গনা নিজ অধিকারে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি সমরকন্দ অধিকার করেন; কিন্তু তাহা অবশেষে একেবারেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাবর কাবুল অধিকার করিয়া তথায় নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; কাবুল হইতেই তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং তাহার সম্রাট্ হইয়া উঠেন।

রাজকোষ হস্তগত করিয়া বাবর হুমায়ুন এবং অন্যান্য আত্মীয় ও কর্ম্মচারিগণকে উপহার প্রদান করেন। তিনি ইব্রাহিম লোদীর মাতারও বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময়ে বায়ান্ন কোটি টাকা দিল্লী সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায় হইত; পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত ছিল। বাবর যে সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্য অধিকার করেন, তখন তাহা ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও চারিটি মুসলমান ও দুইটি প্রধান হিন্দু-রাজ্য ছিল; তদ্ভিন্ন কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা কতকগুলি পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশ অধিকার করিয়া রাখেন। মুসলমান রাজ্য চারিটির মধ্যে গুজরাট সুলতান মহম্মদ মজঃফরের, দাক্ষিণাত্য বামণীবংশের, মালব সুলতান মামুদের ও বাঙ্গালা আলাউদ্দীন হোসেন শার পুত্র নসরৎ শার অধীন থাকে। হিন্দু রাজ্যের মধ্যে

দাক্ষিণাত্যের বিজয় নগরই সর্ব্বপ্রধান ছিল। হিন্দুস্থানে রাণা সঙ্গের মেবার রাজ্যও প্রবল হইয়া উঠে। (১)

(1) The capital of all Hindustan is Dehli. Ftom the time of Sultan Shahabuddin Ghori to the end of Sultan Firoz Shah's time, the gaeater part of Hindustan was in the possession of the Emperor of Dehli. At the period when I conquered that country five Musulman kings and two Pagans exercised royal authority. Although there were many small and inconsiderable Rai's and Raja's in the hills and woody country. Yet these were the chief and the only ones of importance. One of these powers was the Afghans, whose government included the capital, and extended from Bahrah to Behar. Jaunpur, before it fell into the power of the Afghans, was held by Sultan Husain Sharki. This dynasty they called the Purbi (or eastern). Their forefathers had been cupbearers to Sultan Firoz Shah and that race of Sultans. After Sultan Firoz Shah's death, they gained possession of the kingdom of Jaunpur. Delhi was at that period in the hands of Sultan Alau-ddin, whose family were saiyids. When Timur Beg invaded Hindustan, before leaving the country, he had bestowed the country of Dehli on their aucestors. Sultan Bahlol Lodi Afgan. and his son Sultan Sikandar, afterwards seized the throne of Delhi, as well as that of Jaunpur, and reduced both kingdoms under one Government.

The second prince was Sultan Muhammad Muzaffar, in Gujarat. He had departed this life a few days bofore Sultan Ibrahim's defeat. He was a prince well skilled in bearing and fond of reading the hadis (or traditions). He was constantly employed in writting of Kuran. They call this race Tang. Their ancestors were cupbearers to the Sultan Firoz that has been maintained, and his family. After the death of Firoz Shah, they took possession of the throne of Guzrat. The third kingdom is that of the Bahmanis in the Dekhin, but at the present time the Sultans of the Dekhin have no authority or power left. All the different districts of their kingdom have been seized by their most powerful nobles, and when the prince needs anything, he is obliged to ask it of his own amirs. The fourth king was Sultan Mahmud, who reigned in the country of Malwa, which they likewise call Mandu. This dynesty was called the Khilji. Rana Sanka, a Pagan, had defeated them and occupied a number of their provinces. This dynasty also had become weak. Their ancestors, too, had been originally brought forward and

বাবর দিল্লী সাম্রাজ্য অধিকার করিলেও আফগানেরা কিন্তু একেবারে হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা মোগলদিগকে দূরীভূত করিবার জন্ত ক্রমে সমবেত হইতে লাগিল। রাণা সঙ্গও তাহাদের সহিত যোগ দিলেন। সে সময়ে রাজপুতানার অধিকাংশ রাজাই রাণা সঙ্গের সহিত মিলিত

patronized by Sultan Firoz Shah, after whose demise they occupied the kingdom of Malwa.

The fifth prince was Nusrat Shah, in the kingdom of Bengal. His father had been king of Bengal, and was a saiyid of the name of Sultan Alau-ddin. He had attained this throne by hereditary succession. It is a singular custom in Bengal, that there is little of hereditary descent in succession to the sovereignty. There is a throne allotted for the king, there is, in like manner, a seat or station assigned for each of the amirs, wazirs, and mansabdars. It is that throne and these stations alone which engage the reverence of the people of Bengal. A set of dependents, servants, and attendants are annexed to each of these situatations. When the king wishes to dismiss or appoint any person, whosoever is placed in the seat of the one dismissed is immediately attended and obeyed by the whole establishment of dependents, servants, and retainers annexed to the seat which he occupies. Nay, this rule obtains even as to the royal throne itself. Whoever kills the king, and succeeds in placing himself on that throne, is immediately acknowledged as king, all the amirs, wazirs, soldiers and peasants, instantly obey and submit to him, and consider him as being as much their sovereign as they did their former prince, and obey his orders implicitly. The people of Bengal say, "We are faithful to the throne ; whoever fills the throne we are obedient and true to it." As for instance before the accession of Nusrat Shah's father an Abyssinian having killed the reigning king, mounted the throne and governed the kingdom for some time, Sultan Alau-ddin killed the Abyssinian ascended the throne, and was acknowledged as king. After Sultan Alau-ddi'ns death, the kingdom devolved by succession to his son, who now reigned. There is another usage in Bengal ; it is reckoned disgraceful and mean for any king to spend or diminish the treasures of his predecessors. It is reckoned necessary for every king, on mounting the throne, to collect a new treasure for himself. To collect a treasure is, by these people, deemed a great glory and ground of distinction. There is another custom, the parganas have been assigned from ancient times to defray the expenses of each depart-

হইয়াছিলেন ; রায়নার শাসনকর্ত্তা সঙ্গের ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। এ দিকে আবার গোয়ালিয়রের রাজা স্বীয় রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিম লোদীর মাতাও বাবরের প্রাণনাশের জন্য বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; বাবর তাহা কোনরূপে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। এইরূপে চারিদিক্ হইতে উত্ত্যক্ত হইয়া বাবর অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িলেন ; তাঁহার সর্দ্দারেরা তাঁহাকে কাবুলে, অন্ততঃ পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতে পরামর্শ দিলেন ; কিন্তু বাবর তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি দিল্লী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলেন।

রাণা সঙ্গ হিন্দু ও পাঠানগণকে লইয়া বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

ment, the treasury, the stable, and all the royal establishments ; no expenses are paid in any other manner.

The five kings who have been maintained are great princes, and are all Musulmans, and possessed of formidable armies. The most powerful of the Pagan princes, in point of territory and army, is the Raja of Bijanagar. Another is the Rana Sanka, who has attained his present high eminence, only in these later times, by his own valour and his sword. His original principality was Chitur. During the confusion that prevailed among princes of the kingdom of Mandu, he seized a number of provinces which had depended on Manda, such a Rantpur (Rantambhor), Sarangpur, Bhilsan, and Chanderi. In the year 934, by the devine favour, in the space of a few hours, I took by storm Chanderi, which was commanded by Maidani Rao, one of the highest and most distinguished of Rana Sanka's officers put all the Pagans to the sword, and from the mansion of hostility which it had long been, converted it into the mansion of the faith, as will be here after more fully detailed. There were a number of other Rais and Rajas on the borders and within the territory of Hindustan ; many of whom, on account of their remoteness, or the difficulty of access into their country, have never submitted to the Musulman Kings.

The countries from Bahrah to Bihar, which are now under my dominion, yield a revenue of fifty-two krors, as will appear from the particular and detailed statement. Of this amount, parganas to the value of eight or nine krors are in the possession of some Rais and Rajas, who from of old times have been submissive and have received these parganas for the purpose of confirming them i heir obedience.

মেবাতের হোসেন খাঁ তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন ; তাঁহারা সেকেন্দর লোদীর পুত্র মামুদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রায়নার নিকট কনুয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এ যুদ্ধে বাবরই জয়লাভ করেন, অনেক হিন্দুরাজা জীবন বিসর্জ্জন দেন, হোসেন খাঁ মেবাতীও প্রাণ হারাইয়াছিলেন, রাণা সঙ্গকে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিতে হয়। রাজস্থানের ভট্টগণ বলেন যে, শিলাদি নামে একজন তোমর সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় বাবর জয়লাভে সমর্থ হন।

ইহার পর বাবর মেবাতে অগ্রসর হইয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলেন। সঙ্গ রাণার সামন্ত মেদিনী রায় চন্দেরীর অধিপতি ছিলেন ; বাবর তাঁহার হস্ত হইতে চন্দেরী অধিকার করেন ; আফগানেরা আবার গোলযোগ আরম্ভ করায় বাবর তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য কনোজের দিকে ধাবিত হন। গঙ্গা পার হইয়া মোগল সৈন্যেরা আফ্‌গানদিগকে পরাজিত করে। সঙ্গ রাণার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমজিৎকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য বিক্রমের মাতা রাণী পদ্মাবতী চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকেন্দর লোদীর পুত্র মামুদ লোদী বিহার অধিকার করায় তাঁহাকে বিতাড়িত করা হয়। আফগানেরা পুনর্ব্বার গোলযোগ করায়, বাবরের পুত্র আস্করি মির্জ্জা ও সেনাপতি চীন তৈমুর সুলতান গঙ্গাপার হইয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন ; ক্রমে বাবরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি আগরায় প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কাবুলে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

বাবর লেখাপড়া ভালই জানিতেন ; তিনি কবিতা রচনা করিতেও পারিতেন। তুর্কী ভাষায় তিনি নিজ জীবন-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। আক্‌বর বাদশাহের সময় তাহা ফার্‌সী ভাষায় অনূদিত হয়। দূরত্ব মাপের জন্য সেকেন্দর লোদী যে সেকেন্দরী গজ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, বাবর তাহার পরিবর্ত্তে বাবরী গজের প্রচলন করেন। বাবরের বীরত্ব চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি সুরা ও কামিনীর মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। কাবুলের উদ্যানমধ্যে চৌবাচ্চা করিয়া তিনি মদ্যে পরিপূর্ণ করিতেন ; তাহার গাত্রে লিখিত থাকিত,—

"দাও মোরে শুধু সুরা, সুন্দরী রমণী,
আমোদ যতেক আর এর কাছে ছার।

ভোগ কর রে বাবর, সময় না গণি,
যৌবন ফুরায়ে গেলে আসিবে না আর।”

বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হন; হুমায়ুন ভ্রাতা কামরণকে পঞ্জাব, হিন্দালকে মেবাত ও আস্করি মির্জ্জাকে সম্ভল প্রদেশ প্রদান করিয়া নিরস্ত করেন।

তাহার পর হুমায়ুন কালিঞ্জর অধিকারে অগ্রসর হন; কিন্তু সেই সময়ে সেকেন্দর লোদীর পুত্র মহম্মদ লোদী আফগান সর্দ্দারগণের সহায়তায় জৌনপুর অধিকার করিলে, হুমায়ুন জৌনপুরের দিকেই আগমন করেন এবং আফগান-দিগেক বিতাড়িত করিয়া দেন। তিনি সের খাঁ আফগানকে চুনার দুর্গ পরি-ত্যাগ করিতে বলিলে, সের খাঁ অসম্মত হন। সেই সময়ে গুজরাটের বাহাদুর শাহ উত্তরদিকে অগ্রসর হওয়ায়, হুমায়ুন সের খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া বাহাদুর শার দমনে যাত্রা করেন।

বাহাদুর শা এই সময়ে চিতোর অধিকারের চেষ্টা করিতেছিলেন। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্ন, পরে দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমজিৎ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহাদুর শা বিক্রমজিৎকে পরাজিত করিয়া চিতোর অবরোধে সচেষ্ট হন। সঙ্গের শিশুপুত্র উদয়সিংহের মাতা রাণী কর্ণবতী চিতোর-রক্ষার জন্য হুমায়ুনের নিকট রাখীসূত্র পাঠাইয়া দেন। হুমায়ুন আসিতে না আসিতে বাহাদুর চিতোর অবরোধ করেন। সঙ্গের প্রধানা মহিষী জবহর বাই ও রাজপুত সর্দ্দারগণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন; কর্ণবতী চিতারোহণ করেন; উদয়সিংহকে কোনরূপে রক্ষা করা হয়।

হুমায়ুন যদিও চিতোর রক্ষা করিতে পারেন নাই, তথাপি বাহাদুরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং গুজরাট ও মালব অধিকার করিয়া লন। আস্করি মির্জ্জার হস্তে ঐ সমস্ত প্রদেশ অর্পণ করা হয়; কিন্তু বাহাদুর শা পুনর্ব্বার উহা অধিকার করিয়া বসেন।

এই সময়ে আফগানগণ সের খাঁর অধীনে সমবেত হইয়া বিদ্রোহ আরম্ভ

করে। হুমায়ুন জৌনপুর পর্য্যন্ত ধাবিত হইলে, সের খাঁ বাঙ্গালার দিকে চলিয়া যান। হুমায়ুন গাজী খাঁ সুরের হস্ত হইতে চুনার দুর্গ অধিকার করিয়া লন। বাহাদুর শার ভূতপূর্ব্ব গোলন্দাজ সেনাপতি রুমি খাঁর যত্নে চুনার দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল। সের খাঁ ইত্যবসরে গৌড়ের বাদশাহ মামুদ শার হস্ত হইতে বাঙ্গালা অধিকার করেন; মামুদ শা হুমায়ুনের শরণাপন্ন হইলে, হুমায়ুন বাঙ্গালার অভিমুখে ধাবিত হইয়া রাজধানী গৌড়ে উপস্থিত হন। সের খাঁ ঝাড়খণ্ড দিয়া পলায়ন করিয়া রোটাসগড়ে আগমন করেন; ইহার পূর্ব্বে তিনি রোটাস অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। হুমায়ুন গৌড়ের জিন্নেতাবাদ আখ্যা প্রদান করিয়া তথায় প্রায় তিন মাস অবস্থিতি করেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য গণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হওয়ায়, হুমায়ুন গৌড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ও দিকে তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল মির্জ্জা আগরা প্রদেশে বিদ্রোহের সূচনা করেন; হুমায়ুন তখন সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। সেই সময়ে সের খাঁ রোটাসগড় হইতে বহির্গত হইয়া কর্ম্মনাশা নদীর তীরে চৌসা নামক স্থানে হুমায়ুনের গতিরোধ করিলেন।

এই বিপৎকালে আবার বাদশাহের ভ্রাতা কামরণ নিজেই বাদশাহ হইবার জন্য দিল্লী ও আগরা অধিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। হিন্দাল প্রথমে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরস্পরে ঈর্ষ্যায় দুই ভ্রাতার মধ্যেই বিবাদ উপস্থিত হয়। হুমায়ুন ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া সের খাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করেন নাই। এ দিকে সের খাঁ হুমায়ুনের সহিত সন্ধির ভাণ করিতে লাগিলেন। সের খাঁ বিহার ও বাঙ্গালা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, এইরূপই স্থির হয়; কিন্তু কোনরূপে হুমায়ুনের সৈন্য নাশ করাই সের খাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ কথা-বার্ত্তার পর হুমায়ুন যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি সের খাঁ তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। সৈন্য সহিত বাদশাহ গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলেন, পরে কোনরূপে পার হইয়া আগরার দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার অনেক সৈন্য গঙ্গাগর্ভে চিরদিনের জন্য নিমগ্ন হইয়া গেল। হুমায়ুনের ভ্রাতারা এই সময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিলেন। বাদশাহের কর্ম্মচারীরাও বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিলেন। কামরণ মির্জ্জা অবশেষে কিন্তু

হুমায়ুনকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, অনেক সৈন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ইহার পর সের খাঁ গঙ্গার তীরে তীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; হুমায়ুন তাঁহার গতিরোধের জন্য কোন কোন সেনাপতিকে পাঠাইয়া দিলেন; কন্নৌতে দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হইলে, মোগলেরা জয়লাভ করিল; তাহার পর বাদশাহ সসৈন্য যাত্রা করিলেন। কনোজের নিকট গঙ্গাপার হইয়া তিনি সের খাঁর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন কোন সেনাপতি শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিলেন; অনেক সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। সেই সময়ে আবার বর্ষা উপস্থিত হওয়ায়, হুমায়ুনের শিবির ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সের খাঁ এই সুযোগে হুমায়ুনকে আক্রমণ করিলেন; হুমায়ুনও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং কোনরূপে গঙ্গা পার হইয়া আগরায় আসিলেন। সের খাঁ কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। হুমায়ুন তখন আগরা পরিত্যাগ করিয়া লাহোর চলিয়া গেলেন।

সের খাঁও পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। হুমায়ুন অবশেষে সিন্ধুনদ পার হইয়া টাটা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কামরণ কাবুলে ও হিন্দাল কান্দাহারে পলাইয়া গেলেন; হুমায়ুন সিন্ধুনদের তীরস্থ প্রদেশ অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও নিকট হইতে সাহায্য না পাওয়ায়, অবশেষে সিন্ধুর পূর্ব্ব-তীরে আসিলেন। তাহার পর তিনি যশলমীর হইয়া নাগর ও আজমীরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাড়বারের রাজা মালদেব নাগর প্রভৃতির অধিপতি ছিলেন; তিনি হুমায়ুনকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাকে শত্রুপক্ষের হস্তে প্রদানের ইচ্ছা করেন; হুমায়ুন কোনরূপে রক্ষা পাইয়া অমরকোটে উপস্থিত হন। এইখানে তাঁহার মহিষী বানু বেগম এক পুত্র প্রসব করেন; এই পুত্রই ভারতের আদর্শ-সম্রাট্ আকবর শাহ। হুমায়ুন অবশেষে কান্দাহারে যান, কামরণ হিন্দালের নিকট হইতে কান্দাহার প্রদেশ অধিকার করিয়া আস্করি মির্জ্জার হস্তে প্রদান করেন। হুমায়ুন তথায় উপস্থিত হইলে, আস্করি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসেন। হুমায়ুন শিশু সন্তান আকবরকে পরিত্যাগ করিয়া বেগমের সহিত পলাইয়া যান। আস্করি শিশু আকবরকে কান্দাহার নগরে লইয়া আসেন। তাহার পর

হুমায়ুন সিস্তান ও হিরাট হইয়া পারস্তে উপস্থিত হন ও তথাকার অধিপতি শাহ তমাস্পের আশ্রয় লন।

দাম্পত্য-প্রেম।

ভালবাসার পরিপক্ক বা শেষাবস্থার নাম প্রেম। ইহাকে পূর্ণতাগের নামান্তরও বলা যাইতে পারে। জাগতিক প্রেম বহুভাগে বা বহুনামে বিভক্ত বা অভিহিত। তন্মধ্যে ভগবৎপ্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর্য্য-ঋষিগণ এই ভগবৎপ্রেমের ঠিক নিম্নেই দাম্পত্য-প্রেমের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তাহা বর্ত্তমান কালের দাম্পত্য-প্রেম নহে। যদি বর্ত্তমান কালের দাম্পত্যপ্রেম তাঁহাদের লক্ষ্যান্তর্ভুক্ত হয়, তবে উহা পিতৃ-মাতৃ প্রভৃতি গুরুজন-ভক্তি, বন্ধুপ্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ প্রেম-সমূহের উর্দ্ধে স্থানলাভ করিবার যোগ্য কিসে? ইহা স্থির নিশ্চয়, তাহা প্রাচীন কালের দাম্পত্য-প্রেম। সে প্রেম এতই সুনির্ম্মল যে, তাহা লাভ করিবার জন্য প্রাচীনকালের পূর্ণ সংযতেন্দ্রিয় আদর্শ কামজয়ী সাধকগণও অসার সংসারাশ্রমে প্রবেশ লাভ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কামভস্মকারী, যোগিচূড়ামণি, শ্মশানবিহারী স্বয়ং মহাদেবই একজন আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমিক। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ যাহাকে দাম্পত্য-প্রেম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই ভগবৎপ্রেমের নীচে বা ভগবৎপ্রেম বাদে জাগতিক সমস্ত প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগে যাহাকে দাম্পত্যপ্রেম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা প্রেম নহে—কামের নামান্তরমাত্র। দম্পতি-যুগলের পরস্পর ভোগেচ্ছা পূরণের জন্য বা পূরণ-জনিত মৌখিক ও ক্ষণস্থায়ী ভালবাসাকে অর্থাৎ যেখানে কেবল ভোগ, ত্যাগের নামমাত্রও নাই, তাহাকে কাম না বলিয়া প্রেম বলা যাইতে পারে কি করিয়া? ইহাকে প্রেম নামে অভিহিত করিতে মানব-হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হয় না কি? বর্ত্তমান কালের এই কামকে প্রেম নামে অভিহিতকারী ব্যক্তিগণের নিকট

জিজ্ঞাসু, আপনারা ঋষি-বর্ণিত প্রাচীনকালের দাম্পত্য-প্রেমের লক্ষণগুলির মধ্যে কোন একটি লক্ষণ বর্ত্তমান যুগের কোন দম্পতীর মধ্যে দেখাইতে পারেন কি? যদি না পারেন, তবে বৃথা প্রেম প্রেম বলিয়া চীৎকার করেন কেন? প্রাচীনকালের দম্পতিযুগল পরস্পর উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ-স্থাপনের অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর উভয়ে একতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিবার জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর-মুহূর্ত্ত হইতেই আমরণকাল পর্য্যন্ত কঠোর সাধনায় রত থাকিতেন এবং তাঁহারা ত্যাগের এক একটি জ্বলন্তমূর্ত্তি-স্বরূপ ছিলেন। পিতৃ-আদেশে বনগমনোদ্যত রামসহগামিনী ও শেষজীবনে মিথ্যাপবাদে রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বনবাসিনী জনককুমারী আদর্শ-রমণী সীতা, পিত্রালয়ে পিতৃমুখে স্বামিনিন্দা শ্রবণমাত্রে আত্মবিসর্জ্জনকারিণী, দক্ষরাজনন্দিনী হরগেহিনী সতী, কালকবল হইতে মৃত স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত-কারিণী সত্যবানুগতপ্রাণা, সতীকুল-শিরোমণি সাবিত্রী, কলিকোপগ্রস্তনলানুগামিনী, বিদর্ভরাজকন্যা আদর্শ-সতী দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীগণ ও সীতা বিহনে ব্যাকুলিত চিত্ত, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল এবং স্বর্ণ-সীতা-সৃজনকারী আদর্শ-পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র, মৃত সতীদেহ দর্শনে উন্মাদভাবে স্কন্ধোপরে সতীশব লইয়া সমগ্র পৃথিবী-ভ্রমণকারী, বিষ্ণুচক্রে সেই শব নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়ার পর পুনরায় সতীপ্রাপ্তির আশায় হিমালয়ের নির্জ্জন প্রান্তে কঠোর তপশ্চরণ-রত এবং সেই তপোবিঘ্নকারী কামকে ভস্মীভূত ও হিমালয়তনয়া বালিকা উমার সংশ্রবত্যাগকারী আদর্শ-যোগী দিগম্বর শঙ্কর প্রভৃতি পুরুষগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দম্পতিযুগল উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ-স্থাপনের, উভয়ে জন্মজন্মান্তর একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিবার জন্য সচেষ্ট অর্থাৎ কঠোর সাধনারত হওয়া ত দূরের কথা, কেবল এই জীবনেই কেহ কেহ বা যতদিন পর্য্যন্ত সম্ভোগসুখলাভ সম্ভব, ততদিন পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে মাত্র দৈহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে বা রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট বোধ করেন; ইহাই বর্ত্তমান যুগের দাম্পত্য-প্রেম। এ প্রেম কেবল কামাভিনয়, ইহাতে প্রেমের নামগন্ধ পর্য্যন্তও নাই। কাম ও প্রেম দুটি বিপরীত বস্তু, ইহা প্রমাণসিদ্ধ কথা। আর এই হেতুই যেখানে প্রেম, সেখানে কাম এবং যেখানে কাম, সেখানে প্রেম থাকা অসম্ভব। আর্য্য-ঋষিদের মতে দম্পতিযুগল উভয়ে পূর্ণ

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্পর প্রেমশৃঙ্খলে অর্থাৎ একতাসূত্রে আবদ্ধ না হইলে, উভয়ের মধ্যে প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেমের সঞ্চার হয় না। দম্পতিযুগলের মধ্যে যদি কাহারও মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসুখ-সম্ভোগেচ্ছা বলবতী থাকে, তবে তাহাকে প্রেমনামে পরিচিত করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের মতে অতুলনীয় ত্যাগী কামরিপু (কামের শত্রু) নীলকণ্ঠ শম্ভু ও পূর্ণ সংযতেন্দ্রিয়া আদর্শ-যোগিনী হিমালয়রাজদুহিতা তপস্বিনী উমার মধ্যে যে সুনির্ম্মল কামগন্ধহীন দাম্পত্য-প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই ইহার উজ্জ্বল বা সর্ব্বোচ্চ উদাহরণ। জগৎসংহারকর্ত্তা, সৃষ্টি-স্থিত-প্রলয়কারী, দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বেশ্বর হইয়াও দিগম্বর, ছাই-ভূষিত ও শ্মশানবিহারী; আর জগজ্জননী, সর্ব্বশক্তিময়ী, মূলপ্রকৃতি উমা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী হইয়াও দিগম্বরীবেশে শ্মশানবাসিনী; ইঁহাদের মিলনেই প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেমের বিকাশ। ইঁহাদের মধ্যে কামের লেশমাত্রও নাই—কেবল প্রেম! প্রেম! এ মিলনের বহুপূর্ব্বে কামরিপু ভস্মীভূত। মানব-দম্পতীর মধ্যে যদি কোথাও প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাকেই প্রেম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কোথাও কোথাও অশীতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধার মধ্যে এরূপ প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যুবক-যুবতীর মধ্যে ইহা অতীব বিরল। অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত সম্ভাবাসন্ন। কিন্তু যদি যুবক-যুবতীর মধ্যে এরূপ কামগন্ধহীন সম্মিলন না ঘটে, তবে ত তাহাকে দাম্প্রত্য-প্রেম বলা যাইতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত না সমগ্র মানবসমাজ এই হরপার্ব্বতীর আদর্শে দাম্পত্য-প্রেম-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইহা কাম নামে পরিচিত হইবে ও মানব-সমাজের প্রকৃত উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত হইয়া থাকিবে। দাম্পত্য-প্রেমের উৎকর্ষাপকর্ষের উপরেই মানব-সমাজের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। ইহাই মানব-সমাজের মূলভিত্তি। এই ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় থাকিলে, সমাজের বিন্দুমাত্র অবনতির সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান কালে এই ভিত্তিভূমি চূর্ণ-বিচূর্ণ বা জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মানব-সমাজের, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের ঘোর অবনতি উপস্থিত হইয়াছে; ইহা বিবেকবান্ ব্যক্তিমাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। ইহা, এই ভিত্তিভূমি প্রাচীন আদর্শে পুনর্দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত বা জীর্ণ-সংস্কৃত করিবার

জন্ত মানবমাত্রেরই পরস্পর বদ্ধপরিকর ও প্রাণপণ সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য নহে কি? যদি উচিত বিবেচিত হয়, তবে উঠ, জাগ এবং পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাচীন দাম্পত্য-প্রেম পুনঃসংস্থাপিত করিবার জন্ত প্রাণপণ কর। কুপ্রবৃত্তি শনৈঃ শনৈঃ বেগে যেরূপ ভাবে মানব-সমাজকে আত্ম-কবলস্থ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, যদি আর কিছু দিন এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইয়া যায়, তবে মানব-দম্পতীর মধ্যে পুনঃ দাম্পত্য-প্রেম-সুপ্রতিষ্ঠা হওয়াও একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িবে; তা ছাড়া সমগ্র জনস্থান নিতান্ত নির্বীর্য্য মানব-সন্তান-সন্ততি-সমূহ দ্বারা পূর্ণ ও মনুষ্য-সমাজ পশুসমাজে পরিণত হইয়া যাইবে। মানব কাম-কবলস্থ হইলে, কেবল যে সমাজের ঘোর অবনতি ও দাম্পত্য-প্রেম-বিকাশের বিঘ্ন ঘটে, তাহা নহে, তদ্দ্বারা নিজ শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার অবনতি সংসাধিত এবং আত্মোন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। ঐ কামরিপুর অনিষ্টকারিতার বিষয় বোধ হয় কাহাকেও এরূপ বিশদভাবে নানাদিক্ দিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না; কারণ, বর্ত্তমানে ইহা প্রত্যেকেরই নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রাচীনকালে সর্ব্বসাধারণের নিকট এই মহদনিষ্ট-কারী কামকে দগ্ধীভূত করাই, হৃদয়ের নিকট আসিতে না দেওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান কালের সাধু মহাত্মাদের নিকটও ঠিক সেইরূপ ভাবে বিবেচিত হইতেছে এবং সর্ব্বসাধারণেও প্রমাণাদির দ্বারা অনিষ্টকারিতার বিষয় নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাই বলি, আর উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। এ স্থলে কেহ যেন না বুঝেন যে, যদি কামরিপু দগ্ধীভূত হয়, তবে প্রজাসৃষ্টি বন্ধ হইয়া মনুষ্য-সমাজ একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। দম্পতিযুগল অটুট ব্রহ্মচর্য্য-পালন দ্বারা পূর্ণ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থাৎ কামগন্ধহীন নির্ম্মল চরিত্র গঠন করতঃ শাস্ত্রবিহিত উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত স্বামি-স্ত্রীতে নির্ব্বিকার-চিত্তে একত্রে মিলিত থাকিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যদি বিমলানন্দে ও পবিত্র-চিত্তে (কামের মাদকতাকে হৃদয়ের নিকটে আসিতে না দিয়া) কেবল ভগবদাদেশ জ্ঞানে প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তব্য মস্তকে গ্রহণ করতঃ সমাজ-মুখোজ্জ্বলকারী অশেষগুণালঙ্কৃত বীর্য্যবন্ত ধর্ম্মপুত্র লাভ পর্য্যন্ত অসুর-হস্ত হইতে ত্রিলোক-রক্ষার জন্ত হরপার্ব্বতীর মিলনের ন্যায় যথানিয়মে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ স্থাপিত

করেন, তবে তাহাকে কাম না বলিয়া প্রেম বলিতে হইবে এবং তাহাই নির্ম্মল দাম্পত্য-প্রেম-প্রতিষ্ঠার অন্তরায় এবং সমাজ ও আত্মাবনতির হেতু না হইয়া উন্নতির প্রকৃষ্ট সহায় হইবে। এ স্থানের কাম দগ্ধীভূত ও প্রেমরূপে পরিণত। আর যদি এইরূপ কামগন্ধহীন কোন দম্পতি-যুগল প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তব্যাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের কর্ত্তব্য অর্থাৎ ভগবৎসাধনরত থাকা হেতু অথবা ভগবৎসাধন-পথানুসরণ-মানসে পূর্ণ নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া চিরকুমার চিরকুমারীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে দৃঢ়-নিশ্চিত হয়েন, তবে তাহাও নিজ দাম্পত্য-প্রেম-প্রতিষ্ঠার, সমাজ ও আত্মোন্নতির কোনরূপ অন্তরায় ত হইবে না এবং তাহা বাদেও শাস্ত্রাদি-বিরুদ্ধ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এ স্থলে যদি কেহ আশঙ্কা করেন, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট প্রজাসৃষ্টি কর্ত্তব্য মস্তকে গ্রহণ না করিলে, ভগবদাদেশ অবমাননারূপ মহাপাপ জন্য আত্মোন্নতির ও সৃষ্টির অন্তরায় হেতু সমাজ-লোপের সম্ভাবনা, তবে তাঁহাকে বলিবার এই—শাস্ত্রাদির অনেক স্থলে ত স্পষ্টই লেখা আছে, "যদি কেহ ভগবৎসাধন জন্য পূর্ণ নিবৃত্তি-পথাবলম্বী হইয়া জগৎ-চক্রের সাহায্য না করেন, তবে তাহাতে তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটে না" অর্থাৎ কোনরূপ পাপ বা দোষ স্পর্শে না। ইহা ত এক প্রকার ভগবদাদেশ। আর এইরূপ পূর্ণ নিবৃত্তি-পথাবলম্বী বহুব্যক্তি বা এক সম্প্রদায় লোক অনাদি-কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমাজের বক্ষে অতি সম্মানের সহিত স্থান পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু কৈ, তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের আদর্শে কোন এক সময়ে বা আজ মানব-সমাজ লোপ পাইতে বসিয়াছিল বা বসিয়াছে, ইহা শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে বৃথা এরূপ অলীক আশঙ্কার কারণ কি? সন্দেহ-নিরাসের পক্ষে এই উত্তর পর্য্যাপ্ত হয় নাই কি? উপসংহারে জিজ্ঞাস্য, উপরি-উক্ত মতগুলি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় কি? *

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

---

* গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিলেই সন্তানের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ- ব্রহ্মচারী চিরকুমার থাকিতে পারেন; কন্যা-একালে কুমারী থাকিতে পারে না।

জ্ঞান ও ভক্তি।

অন্নপূর্ণা মা আমার ! আজিকে বিদায়,
জননি গো, লহ তব কেয়ূর, কুণ্ডল,
মণিহার। এ সন্তান আজি মুক্তি চায়,
তুলে লও দেহ হ'তে অঞ্চল কোমল।
পেয়েছি পিতার ডাক সব তুচ্ছ গণি,
সোনার সংসারে তব স্বর্ণ-সুখজাল,
মিটাতে প্রাণের ক্ষুধা পারে না জননি !
করিয়া রেখেছে তাই আদুরে দুলাল।
পুত্র লবে পিতৃমন্ত্র পিতার চরণে,
তার শিক্ষা, সিদ্ধি, মুক্তি। মাতৃ-অন্তঃপুরে
চিরকাল মায়াজালে রহিবে কেমনে
ভোগে চিরমগ্ন হয়ে, যোগ হ'তে দূরে ?
তোমার সংসার লয়ে রহ স্নেহময়ী,
চলিনু শ্মশানে যথা পিতা সর্ব্বজয়ী।
উহু কি ভীষণ মা গো এ যে গো শ্মশান,
চারিদিকে নাচে প্রেত, মৃতের কঙ্কাল,
অট্টহাসি, বাজে শুধু মরণ-বিষাণ,
পিতৃ-অনুচরগণ ভীষণ ভয়াল।
এই কি সিদ্ধির স্থান ? হবে না সাধনা,
লও মা ডাকিয়া আজি চরণে তোমার,
তব স্বর্ণ-থালি হ'তে ল'য়ে স্নেহকণা
বিলাব দুখীরে, ফিরে দাও কার্য্যভার।

তাপিতে ধরিব বুকে, বল দিব ক্ষীণে,
আতুর সন্তানদলে; রব নিত্য কাজে,
রব চির পদপ্রান্তে, কোল দিব হীনে,
লভিব মঙ্গল-মুক্তি শতবন্ধ-মাঝে।
তব পুণ্য-গৃহতলে ডাক স্নেহময়ী,
চাহিনে শ্মশানে গিয়ে হ'তে সর্ব্বজয়ী।

শ্রীকালিদাস রায়।

পৃথ্বীরাজ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুল্‌তানে ও চৌহানে।

পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ তর তর বেগে সাগরে মিলিতে ছুটিয়াছে; তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার সলিলরাশি নাচিয়া উঠিতেছে; নীল আকাশের সহিত নীল সলিল মিশিয়া অপূর্ব্ব নীলিমায় চারিদিক্ ছাইয়া ফেলিয়াছে; দূরে দিগন্তের কোলে পর্ব্বতশ্রেণীও নীলিমা ঢালিয়া দিতেছে; উভয় তীরের বৃক্ষলতার শ্যামলতাও দূর হইতে নীলিম বলিয়াই বোধ হইতেছে। সহসা পশ্চিমতীরের নীলিমার মধ্যে শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বিভিন্নবর্ণ ফুটিয়া উঠিল; নিমেষমধ্যে তীরভূমি যেন শুভ্র তুষারখণ্ডে ছাইয়া গেল।

ঐ তুষারখণ্ড আর কিছুই নহে; গজনীর বাদশাহ সাহাবুদ্দীনের শ্বেত শিবিরগুলিই দূর হইতে তুষারখণ্ডের ন্যায় দেখাইতেছিল এবং তাঁহার হস্তী,

অশ্ব, পদাতি, পতাকা প্রভৃতি সিন্ধুতীরের নীলিমার মধ্যে বিভিন্ন বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুল্‌তান চৌহানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য চতুরঙ্গসেনা লইয়া হিন্দুস্থানের দিকে আসিতেছেন। প্রথমে তিনি সিন্ধুতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, অগ্রে এ সংবাদ মীর হুসেনের নিকট পঁহুছিল। তাহার পর পৃথ্বীরাজও জানিতে পারিলেন। তখন কৈমাস, চামুণ্ডরায়, চাঁদপুণ্ডীর, কাকা কণ্ব সকলে আসিলেন ও শাহাবুদ্দীনের সিন্ধু পর্য্যন্ত আসার কথা শুনিলেন। সে সংবাদে আর কি তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন? অমনি সকলে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। রাজ-পুরোহিত গুরুরাম আসিয়া পৃথ্বীরাজের ললাটে তিলক পরাইয়া দিলেন; শাকম্ভরী ও আশাপূর্ণা মাতাকে স্মরণ করিয়া চৌহান যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মীর হুসেনও আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিলেন।

তখন সেই মিলিত বাহিনী অগ্রসর হইতে লাগিল; শাহাবুদ্দীনও সে সংবাদ পাইলেন। সে সময় তিনি সিন্ধু পার হইয়াছেন; সুল্‌তানও আপনার বিপুল বাহিনী লইয়া চৌহানের দিকে ধাবিত হইলেন; ক্রমে অচলপুরে আসিয়া তাঁহার শিবির পড়িল। মন্ত্রী কৈমাসের নিকট প্রথমে সে সংবাদ পঁহুছিল; তিনি রাজাকে তাহা জানাইয়া দিলেন। পৃথ্বীরাজ তখন কুলদেবতা স্মরণ এবং ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে ধনদান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন; হর হর ধ্বনিতে রাজপুতগণ চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিলেন। পরে মীর হুসেনের শিবিরে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। শাহাবুদ্দীনের নিকট এ সংবাদ পঁহুছিল, তিনি তখন অচলপুরের বামভাগে সেনা সাজাইতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ গজনীর বিরাট্ বাহিনী দেখিয়া মীর হুসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীর হুসেন আপনার সর্দ্দারগণের সহিত আসিয়া রাজাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"সুল্‌তানের সৈন্য দেখিয়া ভয় পাইতেছ না ত?"

মীর হুসেন উত্তর দিলেন,—"সুল্‌তানের সৈন্য আমার দেখা আছে; আপনি যখন আমাকে আশ্রয় ভিক্ষা দিয়াছেন, তখন আমার এ শির আপনারই; দেখুন, মীর হুসেন আশ্রয়দাতার জন্য কিরূপে যুদ্ধ করে।"

তখন আবার পৃথ্বীরাজ বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। দেখ, আজ তোমাকে গজনীর বাদশাহ করিতেছি।"

তাহার পর সৈন্যসজ্জার পরামর্শ আরম্ভ হইল। রাজা বলিলেন,—"কে কোন্ দিকে দাঁড়াইবে?"

মীর হুসেন।—আমি বাম তরফে।

রাজা।—বেশ, তোমার সহিত যাদব রায়, মণ্ডনীক, মোহন সিংহ আরও কোন সামন্ত থাকুন। দক্ষিণে কাহারা থাকিবে?

কৈমাস।—আমরাই রহিব;—আমি, চামুণ্ডরায়, চাঁদপুণ্ডীর আরও কেহ কেহ থাকিবেন।

রাজা।—আর সাম্‌নে?

গোবিন্দরায়।—আমি, কাকা কণ্‌, দেবরাজ, প্রসঙ্গ খীচী, আরও কেহ কেহ রহিবেন।

রাজা।—তাহা হইলে তোমরা আমাকে পিছনে দিতেছ?

কৈলাস।—তাহাই উচিত।

রাজা।—তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

তখন ঐরূপভাবে সজ্জিত হইয়া চৌহান অগ্রসর হইলেন; সুলতানও আগু বাড়িলেন; অমনি রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; নিমেষমধ্যে সুলতানে চৌহানে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

প্রথমে মীর হুসেনের সহিত তাতার খাঁর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হুসেন পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাতার খাঁই বা ছাড়িবেন কেন, তিনিও হুসেনকে যথাসাধ্য বাধা দিলেন। কিন্তু হুসেনের ফুৎকারে তাঁহার সৈন্যেরা তৃণের ন্যায় উড়িয়া গেল; তাতার খাঁ পিছাইয়া পড়িলেন। মীর হুসেনও সৈন্যস্রোতে ভাসিয়া যে কোথায় গেলেন, তাহার আর সন্ধান হইল না।

এ দিকে খোরাসান খাঁ আগু বাড়িলেন, চামুণ্ডরায় তাঁহাকে বাধা দিলেন। দুইপক্ষে বেশ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; দুজনেই পরস্পরের রণকৌশলের পরিচয় পাইলেন। অবশেষে খোরাসান খাঁকে পিছু হটিতে হইল; সৈন্যেরাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

দক্ষিণদিক্ হইতে কৈমাস সুল্‌তানকে আক্রমণ করিতেছিলেন; জয়ান রায় বামদিক্ হইতে তাঁহাকে ঘেরিলেন; পৃথ্বীরাজ সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। শাহাবুদ্দীন সঙ্কটেই পড়িলেন; কিন্তু তিনি ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না, উদ্যম সহকারে সুল্‌তান চৌহানকে বাধা দিতে লাগিলেন। এইবার সুল্‌তানে চৌহানে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল; পৃথ্বীরাজের সামন্ত-মণ্ডলীকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল। রাজপুতগণ ক্রমে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন; মুসল্‌মানগণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তরবারির ঝঞ্চনায়, ধনুকের টঙ্কারে, সৈন্যগণের কোলাহলে বিকট শব্দ উঠিতে লাগিল, রক্তের নদী বহিয়া গেল, নরশিরে ও দেহে রণস্থল ছাইয়া গেল।

ক্রমে শাহাবুদ্দীনের সৈন্যেরা পলায়ন আরম্ভ করিল; রাজপুতগণও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। শাহাবুদ্দীনকেও সৈন্যগণের অনুসরণ করিতে দেখিয়া, পৃথ্বীরাজের সামন্তগণ তাঁহার পিছু লইলেন; কিছুক্ষণ পরে সুল্‌তানের গতিরোধ হইল। তখন চামুণ্ডরায় ও চাঁদপুণ্ডীর দুই দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন; সুল্‌তান চৌহানের বন্দী হইলেন।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, অস্তের কিছু পূর্ব্বে তাহার অবসান হয়। রণক্ষেত্র শবদেহে শ্মশানের আকার ধারণ করিল। পৃথ্বীরাজ মীর হুসেনের শব বাহির করিবার জন্য অনুচরদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন; তাহারা আসিয়া দেখিল, সেই বিশাল রণক্ষেত্রে একটি সুন্দরী রমণী পাগলিনীর ন্যায় কাহার শব অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। এ রমণী আর কেহ নহে, সেই অভাগিনী চিত্ররেখা। সে বড় আশা করিয়াছিল যে, যুদ্ধের পর হুসেনের সহিত আবার মিলিত হইবে, কিন্তু তাহার সেই আশালতাটুকু একেবারেই ছিঁড়িয়া গেল। অনেক কষ্টে সে হুসেনের শব বাহির করিল, তাহার পর রাজানুচরদিগকে দিয়া রাজার নিকট শবটি চাহিয়া লইবার জন্য বলিয়া পাঠাইল; রাজা অনুমতি দিলেন। তখন সে হুসেনের মৃতদেহ বক্ষে করিয়া জীবন্ত অবস্থাতেই সমাধিমধ্যে প্রবেশ করিল; আশা করিয়াছিল, পরলোকে যদি তাঁহার সহিত মিলন হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুক্তিদান।

পাঁচদিন হইল যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এই পাঁচদিন রাজপুতগণ মহানন্দেই কাটাইয়াছেন; গজনীর বাদশাহ তাঁহাদের বন্দী, কাজেই তাঁহাদের আনন্দের সীমা ছিল না। আর শাহাবুদ্দীন, তাঁহার অখণ্ড গৌরব ধূলিতে মিশিয়া গেল। গজনী হইতে তিনি যে সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, দৈব তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন। হুসেন, চিত্ররেখা অথবা পৃথ্বীরাজ কাহাকেও তিনি গজনীতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বীরের ন্যায় হুসেন রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাই পালন করিলেন। তাঁহার শির পৃথ্বীরাজের জন্যই বলি পড়িল; চিত্ররেখাও তাঁহার সহগমন করিল। আর পৃথ্বীরাজ সুলতানকেই বন্দী করিয়া আনিলেন। দারুণ মনস্তাপে শাহাবুদ্দীন এ কয়দিন দগ্ধ হইতেছিলেন। তাহা ছাড়া পৃথ্বীরাজ তাঁহার কি করিবেন, ইহাও সুল্‌তানের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। তবে পৃথ্বীরাজ এ কয়দিন যে তাঁহার প্রতি আদর-আপ্যায়ন দেখাইয়াছেন, তাহাতে শাহাবুদ্দীনের চিত্ত একেবারে নিরাশায় ছাইয়া পড়ে নাই। বাস্তবিক, পৃথ্বীরাজ তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন; এক্ষণে শাহাবুদ্দীনের বিষয়ে কি করা উচিত, তাহারই জন্য দরবার বসিল।

সামন্তগণ একে একে সকলে দরবারে আসিলেন; অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের পরামর্শ চলিল; তাহার পর শাহাবুদ্দীনকে আনিবার আদেশ হইল। গজনীর সুল্‌তান আজ অপরাধীর ন্যায় পৃথ্বীরাজের দরবারে আসিলেন এবং নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সুল্‌তান, আর্য্যজাতির প্রতিজ্ঞা-রক্ষার পরিচয় পাইলেন ত?"

শাহাবুদ্দীন উত্তর দিলেন,—"হাঁ, পাইয়াছি বটে।"

রাজা। আমি আপনার সহিত শত্রুতা করি নাই, শরণাগতকেই রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শাহাবুদ্দীন। অবশ্য, আপনি তাহা বলিতে পারেন।

রাজা। তাহা হইলে আমি আপনার সহিত শক্রতা করিতে ইচ্ছা করি না।

শাহাবুদ্দীন। ভাল কথা।

রাজা। এক্ষণে আপনার সম্বন্ধে কি করিব, বলুন।

শাহাবুদ্দীন। আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, আমি যখন আপনার বন্দী, তখন ইচ্ছা করিলে আমার প্রাণদণ্ডেরও আদেশ দিতে পারেন। আমি তাহা লইতেও প্রস্তুত আছি। মুসলমান কখনও মরণে ভয় পায় না।

রাজা। অবশ্য, মরণে যে আপনার ভয় নাই, তাহা আমরা জানি; কিন্তু আমি যখন আপনার সহিত শক্রতা রাখিতে চাহি না, তখন আপনার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিব কেন?

শাহাবুদ্দীন। তাহা হইলে আপনি কি করিতে চান?

রাজা। আমি আপনার মুক্তিদানেরই ইচ্ছা করিতেছি।

শাহাবুদ্দীন। আপনার যাহা অভিরুচি।

রাজা। কিন্তু আপনাকে দুইটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

শাহাবুদ্দীন। কি বলুন, সাধ্য থাকিলে অবশ্য চেষ্টা করিব।

রাজা। তাহা এমন কিছুই নহে, আপনি ইচ্ছা করিলেই তাহা করিতে পারিবেন।

শাহাবুদ্দীন। তবে বলুন, শুনি।

রাজা। আমার প্রথম কথা এই, আপনি আর কখনও হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন না, তাহাই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

শাহাবুদ্দীন। আচ্ছা, দ্বিতীয়টি কি?

রাজা। আর হুসেনের পুত্র গাজীকে আশ্রয় দিবেন। তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিবেন না।

শাহাবুদ্দীন। ভাল, তাহাই হইবে।

রাজা তখন গাজীকে শাহাবুদ্দীনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শাহাবুদ্দীনও রাজাকে তিনবার সেলাম করিয়া প্রতিজ্ঞা-রক্ষার চিহ্ন দেখাইলেন; কিন্তু তাঁহার মন এ সকল কিছুই মানিল না, সে ক্রমাগত উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল; সুলতান সে ভাব গোপন করিয়া রাখিলেন।

কাকাকণ্ঠ বলিয়া উঠিলেন,—"সাহেব, এ সকল কথা যেন মনে থাকে, হিন্দুর পাছে আর লাগিও না।"

কৈমাস বলিলেন,—"গজনীর বাদশাহ কি এ সকল ভুলিয়া যাইবেন?"

গোবিন্দরায় কহিলেন,—"সুল্‌তান যদি একান্তই ভুলিয়া যান, আমরা আবার দেখিয়া লইব।"

পৃথ্বীরাজ বলিয়া উঠিলেন,—"ও কথায় তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নাই, গজনীর বাদশাহ কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না।"

তাহার পর তিনি শাহাবুদ্দীনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"সুল্‌তান, এক্ষণে আপনি বিদায় লইতে পারেন।"

শাহাবুদ্দীন আবার সেলাম করিয়া, গাজীকে লইয়া দরবার পরিত্যাগ করিলেন; পরে অবশিষ্ট লোকজনের সহিত গজনী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বাদশাহকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া গজনীবাসিগণের মন আনন্দ-পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাদশাহের অন্তঃপুরে ও দরবারে আর বিষাদের লেশ রহিল না। কিন্তু সুল্‌তানের হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া তাহাকে অবিরত দগ্ধ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

এক বৎসর অতীত হইয়াছে, শাহাবুদ্দীন পৃথ্বীরাজের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। গজনী আসিয়াই হুসেনের পুত্র গাজীকে বন্দী করিয়া রাখিলেন; গাজী কোনরূপে পলাইয়া পৃথ্বীরাজের নিকট আসিলেন; পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। তখন শাহাবুদ্দীন আবার পৃথ্বীরাজকে আক্রমণের জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানে তাঁহার এক চর ছিল, তাহার নাম নীতিরায়। নীতিরায় জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু সে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষা করে নাই; সে স্বজাতি-দ্রোহিতাই প্রকাশ করিয়াছিল। এই বিভীষণ বৃত্তির জন্যই ত হিন্দুস্থানের পতন, নতুবা সুদূর গজনীতে বসিয়া শাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী হিন্দুস্থানের সংবাদ পাইবেন কিরূপে? নীতিরায় পৃথ্বীরাজের সন্ধান লইতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ শীকার করিতে ভালবাসিতেন, বাল্যকাল হইতে মৃগয়া তাঁহার প্রিয় ছিল; তিনি আবার নাগরের নিকট খট্টুবনে শীকার করিতে আসিলেন; নীতিরায় এ সংবাদ শাহাবুদ্দীনের নিকট পাঠাইয়া দিল। শাহাবুদ্দীন তখন চুপে চুপে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণের অভিপ্রায় করিলেন; সর্দ্দারেরাও তাহাতে মত দিলেন। তখন শাহাবুদ্দীন তাতার খাঁ, কোরাসান খাঁ প্রভৃতি সর্দ্দারের সহিত চুপে চুপে হিন্দুস্থানে আসিয়া খট্টুবনে লুকাইয়া রহিলেন।

এ দিকে প্রভাত হইবামাত্র পৃথ্বীরাজ পদাতি, অশ্বারোহী, শীকারী কুকুর ও শীকারী পক্ষী লইয়া বনে বনে শীকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত কাকাকণ্ঠ, সলখপ্রমার, রঘুবংশ চৌহান ও কবিচন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন। সকলেই শীকারে ব্যস্ত; কিন্তু কবিচন্দ্রের মনে একটি সন্দেহের উদয় হইতেছিল। সে সন্দেহ আর কিছুই নহে, শাহাবুদ্দীনের আগমন। সন্দেহ দূর করিবার জন্য তিনি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিছু পরে তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিল; তিনি বনমধ্যে মুসল্‌মানগণকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ব্যস্তভাবে পৃথ্বীরাজের নিকট আসিলেন।

তাঁহাকে ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কবিচন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন?"

কবিচন্দ্র।—অমার মনে এক ঘোরতর সন্দেহ উঠিয়াছে।

পৃথ্বীরাজ।—কি সন্দেহ, শুনি।

কবিচন্দ্র।—আমার বোধ হয়, শাহাবুদ্দীন আসিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ।—তুমি নিতান্তই পাগল, তাহা হইলে আমরা কি কিছুই জানিতে পারিতাম না?

কবিচন্দ্র।—যদি তিনি চুপে চুপে আসিয়া থাকেন?

কাকাকণ্ঠ।—চুপে চুপে কি শীকার খেলিতে আসিবে? তাহার লোকজনের কি কোনই খবর থাকিবে না?

কবিচন্দ্র।—আমি মুসল্‌মানদিগকে বনের মধ্যে দেখিয়াছি।

সলখ।—কত সওদাগর হিন্দুস্থানে আসিয়া থাকে।

কবিচন্দ্র।—তাহারা পশু-পক্ষীর সওদা করিতে আসিবে নাকি? বনে আসার প্রয়োজন?

রঘুবংশ।—পথ ভুলিয়া আসিতে পারে।

কবিচন্দ্র।—তাহা হইলে গাছে উঠিত, পথ ভুলিয়া লোকে বনে আসে না, গাছেই উঠিয়া থাকে।

পৃথ্বীরাজ।—ও কথা থাক, এখন শীকার খেলা হ'ক, পরে দেখা যাইবে।

কবিচন্দ্র।—তাহা হইলে একটু সাবধান হইয়া চলাই উচিত।

পৃথ্বীরাজ।—বেশ, আমরা সতর্কই রহিলাম।

কাকাকণ্ব।—এবার তাহাকে পাইলে বেশ একচোট শিখাইয়া দিব।

তাহার পর তাঁহারা আবার শীকার খেলিতে লাগিলেন। এ দিকে শাহাবুদ্দীনও চুপে চুপে আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিলেন; কবিচন্দ্রের কথা সত্য বুঝিতে পারিয়া সামন্তগণের চমক ভাঙ্গিয়া গেল; তাঁহারা পৃথ্বীরাজকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কাকাকণ্ব অগ্রসর হইয়া মুসল্‌মান-সৈন্য মথিত করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজের কোন কোন সামন্ত প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তখন পৃথ্বীরাজ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; শরবিদ্ধ হইয়া মুসল্‌মান-সৈন্য একে একে ভূতলে পড়িতে লাগিল।

মুসল্‌মান সর্দ্দারেরা যখন অগ্রসর হইতে লাগিল, পৃথ্বীরাজ তখন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া তরবারি চালনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহিত পাঁচজনমাত্র সামন্ত ছিলেন; তাঁহাদেরও কেহ কেহ অগ্রেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের অসির আঘাতে মুসল্‌মান-সৈন্যগণের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে সংবাদ পাইয়া রাজার সৈন্যগণও আসিয়া জুটিল। তখন আর মুসল্‌মান-সৈন্যগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শাহাবুদ্দীন এবং তাঁহার সর্দ্দারগণও পলাইয়া গেলেন। এবারও শাহাবুদ্দীনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না, তিনি কোনরূপে গজনীতে গিয়া পঁহুছিলেন। শীকার খেলিতে খেলিতে পৃথ্বীরাজও আজমীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

(কাল)

(১)

সংসারেতে সব কালের অধীন
যা' কিছু সকলই কালেতে হয়,
ধন্য কাল তব মহিমা অপার
আবার তোমাতে হয় সব লয়।

(২)

আছে পুণ্যধাম সেই বৃন্দাবন,
আছে সে যমুনা সলিলেতে ভরি,
আছে সেই সব কিন্তু নাই কিছু
সকলি সৌন্দর্য্য লয়েছেন হরি।

(৩)

আছে সে তমাল, রমাল পিয়াল,
আছে বংশীবট, কদম্বের মূল,
শুনে বাঁশীরব যাইতে যেখানে
ব্রজের ললনা হইত ব্যাকুল।

(৪)

শুকশারী আদি আছে পাখিগণ
আর না তেমন কাকলী গায়,
আছে পিকরাজ বসিয়ে তমালে
আর না কুহরি শ্রবণ জুড়ায়।

(৫)

তেমন করিয়া তুলিয়া পেখম
ময়ুরীর সাথে শিখী নাহি নাচে,
ব্রজের সে সুখ ফুরায়েছে সব
ব্রজরাজ সঙ্গে সকলি গিয়াছে।

(৬)

আছে সে নিকুঞ্জ-কানন এখন
নাই শোভা বিনে নিকুঞ্জ-বিহারী,
ফুরায়েছে সব আছে মাত্র নাম
ধন্য কাল তোমা যাই বলি হারি।

(৭)

আছে সে অযোধ্যা বিখ্যাত ভারতে
আছে কি এখন সেই শোভা তার,
আছে শুধু নাম—সীতাপতি বিনে
হয়েছে এখন দিবসে আঁধার।

(৮)

কোথা রত্নাকর কবিকুলগুরু
তুলিয়া যেখানে সুমধুর তান,
বীণার ঝঙ্কারে রামায়ণ গানে
ভারতবাসীর মাতায়েছে প্রাণ।

(৯)

কোথা দশরথ নৃপ-চূড়ামণি,
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম,
কোথা সে ভার্গব ভুবনবিজয়ী
কাঁপে ক্ষত্রকুল শুনে যাঁর নাম।

(১০)

কনক-ভূষিতা কোথা লঙ্কাপুরী
নাম মাত্র তার নাহিক এখন,
যার পদভরে কম্পিতা ধরণী
দেবকুল-অরি কোথা দশানন।

(১১)

কোথা মেঘনাদ বাসব-বিজয়ী
ভুজবলে যার কাঁপিত অমর,
কোথায় গিয়াছে নাহি চিহ্ন তার
আছে সুধু নাম কাব্যের ভিতর।

(১২)

কোথা ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনানগর,
কোথা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার,
সসাগরা ধরা, নৃপতি-মণ্ডলী,
রাজসূয়কালে পদানত যার।

(১৩)

কোথা মহামানী রাজা দুর্য্যোধন
ধনমদে মত্ত থাকিতেন যিনি,
গিয়াছেন কোথা কর্ণ মহাবীর
যার পদভরে কাঁপিত মেদিনী।

[১৪]

কোথা উজ্জয়িনী, বিক্রম-আদিত্য
নব-রত্ন কোথা সভাসদ্ তাঁর,
কোথা কালিদাস সুমধুরভাষী
ঘোষিছে ভারতে যশোরাশি যাঁর।

[১৫]

কোথা পিতামহ ভীষ্ম মহারথী
সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কোথায় এখন,
স্বার্থত্যাগে যিনি অতুল জগতে
যাঁর ভুজবল বিখ্যাত ভুবন ॥

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত

লোকগণনায় হিন্দু।

গত সেন্‌সস্‌ রিপোর্টে প্রকাশ—১৯১১ সনের লোক-গণনায় সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২১ কোটি ৭৩ লক্ষ। ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার প্রায় দশ আনি হিন্দু, বাকি ছয় আনি মুসল্‌মান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য জাতি। ব্রাহ্ম ও "আর্য্য"দিগকে হিন্দুর মধ্যে ধরিলে, মোট সংখ্যা আরও ৩ লক্ষ বাড়িবে।

তবে এই হিন্দু বলিতে সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মী বিশুদ্ধ আচার-সম্পন্ন জাতি, এরূপ মনে করিবেন না। সেন্‌সসের সংজ্ঞা অনুসারে যাহারা মুসল্‌মান নয়, খৃষ্টান নয়, বৌদ্ধ নয়, জৈন নয়, শিখ নয়, ভূতোপাসক (animist) নয়, তাহারাই হিন্দু। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুচি, মেথর, ডোম পর্য্যন্ত সকলেই পড়িয়াছে। এমন কি, অনেক অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিও আপনাদিগকে হিন্দু নামে পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোন দোষ নাই। এই বিরাট্ হিন্দুসমাজে সকল শ্রেণীর লোকেরই স্থান আছে, তাহাদের সকলকেই এক মাপকাঠি দিয়া মাপিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই।

কোনও জাতি বিশুদ্ধ হিন্দু কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সেন্‌সস্‌ কমিশনার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আদেশ করিয়াছিলেন, কোনও

বিশেষ জাতি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলে, তাহাদিগকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে :—

(১) তোমরা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার কর কি না?

(২) তোমরা ব্রাহ্মণ কি অন্য সাম্প্রদায়িক গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ কর কি না?

(৩) তোমরা বেদের প্রভুত্ব স্বীকার কর কি না?

(৪) তোমরা হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা কর কি না?

(৫) বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তোমাদের পৌরোহিত্য করেন কি না?

(৬) তোমাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে কি না?

(৭) হিন্দুর দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশাধিকার আছে কি না?

(৮) তোমাদের স্পর্শ করিলে দোষ হয় কি না? তোমরা কিছু দূরে দাঁড়াইলেও স্পর্শদোষ হয় কি না?

(৯) তোমাদের মৃত ব্যক্তিদিগকে কবর দেওয়া হয় কি না?

(১০) তোমরা গোমাংস ভক্ষণ কর, না গরুর পূজা কর?

এই দশটি প্রশ্ন বেশ বুঝিয়া সুঝিয়া করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের যে সকল উত্তর পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে নানাপ্রকার গোল বাধিল। মধ্য-প্রদেশে যত লোক হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহার প্রায় সিকি লোক বেদ ও ব্রাহ্মণ মানে না; তাহাদের আট আনি লোক হিন্দু গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে না; চারি আনি লোক হিন্দুর প্রধান দেবতাদিগকে মানে না এবং ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের যাজন করেন না; এক-তৃতীয়াংশ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না; সিকি লোক অস্পৃশ্য; সাত ভাগের এক ভাগ তাহাদের মৃতব্যক্তিদিগকে কবর দেয়; পাঁচ ভাগের দুই ভাগ গোমাংস ভক্ষণ করে।

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার জাতিদিগের মধ্যে ৫৯টি জাতি ঐ দশটি পরীক্ষার কোন কোনটিতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; তাহাদের মধ্যে ৭টি জাতির সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক হইবে। আর ১৪টি জাতি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাহারা গোখাদক, দেবমন্দিরে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গোলযোগ উপস্থিত হইল।

এই সকল গোলযোগের নিরাকরণ জন্ম হিন্দুর সংজ্ঞা উল্লিখিতরূপ ধার্য্য করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, বৌদ্ধ নয়, জৈন নয়, শিখ নয়, ভূতোপাসক (animist) নয়, সেই হিন্দু। মোট কথা, যে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, সেই-ই হিন্দু।

সার আলফ্রেড্ লায়াল্ (Sir Alfred Lyall) হিন্দুত্বের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই তিনটি বিষয় থাকা একান্ত আবশ্যক।

(১) দেশ।

(২) বংশ।

(৩) ধর্ম্ম।

তাঁহার মতে, যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই, সে হিন্দু নহে; যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই, সে হিন্দু নহে; যাহার হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, সে হিন্দু নহে। অর্থাৎ যে ভারতবর্ষে ও হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করে, তাহাকেই হিন্দু বলা যায়। সেন্‌সস্ কমিশনার গেট্ সাহেব (Mr, Gait) ইহার উপর আরও একটি পরীক্ষা বাহির করেন; সেটা হইতেছে জাতিভেদ। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে জাতিভেদ না মানে, সে হিন্দু হইতে পারে না। গেট্ সাহেব এই কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াও সকলের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল উত্তর পাইলেন, তাহাতে গোল আরও বাড়িয়া উঠিল, কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না।

তবে এ কথা নিশ্চয়, যে সকল লোক হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই উল্লিখিত চারিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। সুতরাং লোক-গণনায় ভারতবর্ষে যে ২১ কোটি ৭৩ লক্ষ হিন্দু পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে আসল হিন্দুর সংখ্যা অনেক কম হইবে।

এবারকার গণনায় ১৯০১ হইতে ১৯১১ এই ১০ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা অতি অল্প বাড়িয়াছে। মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৭, শিখের সংখ্যা শতকরা ৩৭, বৌদ্ধের সংখ্যা শতকরা ১৩, আর হিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা মাত্র ৫ জন। শিখের সংখ্যা এত অধিক বাড়ার কারণ—পূর্ব্ব-গণনায় যে সকল শিখ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এবার তাহাদের অনেকে হিন্দু নাম কাটাইয়া শিখ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

হিন্দুদিগের এই অল্পবৃদ্ধির নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ দেওয়া হইয়াছে,—

(১) হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহ আছে ও বিধবা-বিবাহ নাই। মুসলমানদিগের তুলনায় এই জন্য হিন্দুর বাড়তি কম।

(২) যে সব অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, সে সব স্থানে এই দশ বৎসরে প্লেগ, ম্যালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষে অনেক লোকক্ষয় হইয়াছে।

(৩) হিন্দুদের মধ্য হইতে অনেক লোক মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

হিন্দুসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী কেহ কেহ হিন্দুর সংখ্যা এইরূপ কমিয়া যাওয়াতে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাদের আশঙ্কা—ক্রমশঃ এইরূপ কমিতে থাকিলে, কালে হয় ত হিন্দুজাতি একেবারে লুপ্ত হইবে।

এই সকল হিন্দুহিতৈষীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল রাজনৈতিক, অন্য দল সামাজিক। রাজনৈতিক দল বলেন, গবর্ণমেণ্ট জনসংখ্যা দ্বারা অনেক সময়ে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেন; সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা কমিলে, হিন্দুজাতি রাজনৈতিক হিসাবে অন্যান্য জাতির বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। আর দেশের বাহ্য সম্পদ্ও (matireal prosperity) অনেকটা লোকবলের উপর নির্ভর করে। হিন্দুর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকিলে, এই জাতি জীবনসংগ্রামে কিছুতেই টিকিতে পারিবে না।

হিন্দুর জনসংখ্যা বাড়াইবার জন্য এই সকল সংস্কারক বলেন,—হিন্দু সমাজের গণ্ডী বিস্তৃত কর, যাহাদিগকে নীচ জাতি বলিয়া দূরে রাখিয়াছ, তাহাদিগকে সমাজে স্থান দাও, তাহাদিগের সহিত পানাহার ও বিবাহে আদান-প্রদান কর, বাল্যবিবাহ তুলিয়া দাও, বিধবা-বিবাহ চালাও ইত্যাদি।

যাঁহারা সমাজের দিক্ দিয়া হিন্দুজাতির উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইলেও, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যৌবন-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে বলেন। কারণ, এই দুইটির জন্য মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে অনেক বাড়িতেছে। জাতিভেদটা সম্পূর্ণ তুলিয়া দিতে না চাহিলেও ইঁহারা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে সমাজে তুলিয়া নিতে বলেন; যেমন নমঃশূদ্র জাতির জলগ্রহণ করাটা ইঁহারা ততটা দূষণীয় মনে করেন না। কারণ, মুসলমানের ছোঁয়া দুগ্ধ ও খেজুরের রস অবাধে চলিয়া গিয়াছে। আর

সোডা-লেমনেডের ত কথাই নাই। এই দশ বৎসরে যে সকল হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নমঃশূদ্রের সংখ্যা কম নহে; ইহার কারণ হিন্দুসমাজে ইহারা অস্পৃশ্য হইয়া আছে।

যাঁহারা ধর্ম্মের দিক্ দিয়া হিন্দুজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা এই রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকগণের সহিত একমত হইতে পারেন না। তাঁহারা সংখ্যাবাহুল্যের উপর বেশী গুরুত্বস্থাপন না করিয়া জন্মগত, আচারগত ও অনুষ্ঠানগত বিশুদ্ধতার উপরে অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহাদের মতে যে ২১ কোটি ৭৩ লক্ষ লোক হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যদি সার আলফ্রেড্ লায়ালের পরীক্ষা-প্রণালী দ্বারা অর্দ্ধেকও কমিয়া যায়, তবে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যখন সমগ্রদেশ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে প্লাবিত হইয়াছিল, তখন মাত্র একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহার নাম ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য। মুসল্মানধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া আবার হিন্দুসমাজের যখন অশেষ দুর্গতি হইয়াছিল, তখন আর একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের দ্বারা সমাজে প্রেমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল। চৈতন্য মহাপ্রভুর কঠোর বৈরাগ্যসাধনা ও বিশ্বপ্রেমের তরঙ্গে নদীয়া শান্তিপুর ভাসিয়া গিয়া সুদূর পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও বৃন্দাবনধাম পর্য্যন্ত টলমল হইয়াছিল। তার পর ইংরেজজাতির সংস্পর্শে আসিয়া ইংরেজী শিক্ষার গুণে যখন হিন্দুসমাজ খ্রীষ্টানীভাব ও নাস্তিকতার বিষে জর্জ্জরিত হইল, তখন আর একজন ব্রাহ্মণের কঠোর সাধননিষ্ঠায় ও সরল উপদেশে আবার হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইল। রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের মাহাত্ম্যে অনেক ইংরেজীশিক্ষাবিষ-জর্জ্জরিত চিত্ত আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

তুমি রাজনৈতিক, তুমি ভোটগণনায় অভ্যস্ত, সুতরাং তোমার নিকট সংখ্যার আদর খুব বেশী। একজন শঙ্করাচার্য্য, একজন শ্রীগৌরাঙ্গ, একজন রামকৃষ্ণপরমহংস কত কাজ করিতে পারেন, তাহা তুমি হয় ত বুঝিবে না। তুমি ভোগৈশ্বর্য্যকামী দেশহিতৈষী, তুমি হিন্দুজাতির ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির জন্য হয় ত লোকসংখ্যাও বাড়াইতে চাও। কিন্তু ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন ভোগৈশ্বর্য্যের পরিণাম যে কি ভীষণ, তাহা ইয়ুরোপীয় সমরানলে কি প্রত্যক্ষ করিতেছ না?

আসল কথা এই, ধর্ম্মই হইতেছে হিন্দুজাতির বিশেষত্ব। সেই ধর্ম্ম

জাতিভেদমূলক, বিশুদ্ধ আচারানুষ্ঠান-সাপেক্ষ। সর্ব্বোপরি শুক্রশোণিতের বিশুদ্ধতা একান্ত আবশ্যক। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইলে, ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন হয়, এ কথা গীতা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"সঙ্করো নরকায়ৈব।"

অর্থাৎ বর্ণসঙ্করের দ্বারা নরকের পথ পরিষ্কার হয়। ভগবান্ গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩।২৪

আমি সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া যদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম না করি, তবে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কেহই পালন করিবে না; তাহাতে লোক সকল উৎসন্ন যাইবে, বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি হইবে এবং ক্রমে আমা দ্বারাই প্রজাগণের বিনাশসাধন হইবে।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ না থাকিলে, কিরূপ বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে, তাহাও আমরা চোখের উপরই দেখিতেছি। ইহার মধ্যে সংবাদপত্রে পাড়িলাম—

"Irish Susil Devi. Acquaintance leads to Marriage Sari replaces gown"

অর্থাৎ পাঞ্জাব ঝিলামের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ লালা দেওয়ানচাঁদ জীর পুত্র মিঃ জয়গোপাল শেঠী বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে মিস্ সিসিল ব্লেক নাম্নী একটি সুশিক্ষিতা আইরিশ রমণীর আলাপ হয়। সেই আলাপে প্রণয়সঞ্চার এবং তাহার ফলে আর্য্য-সমাজের রীতি অনুসারে উভয়ের বিবাহ হইয়াছে। মিস্ ব্লেক এখন সুশীলা দেবী নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং গাউন ছাড়িয়া সাড়ী পরিয়াছেন।

তিনি গাউন ছাড়িয়া সাড়ী পরুন অথবা অসি ছাড়িয়া বাঁশী ধরুন, তাহাতে হিন্দুসমাজের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু যাঁহারা এখনও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে এইরূপ বর্ণসঙ্কর আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই বড় বিপদের কথা। শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জেলার জজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ডাক্তারি শিখিতে বিলাতে গেলেন; সেখানে গিয়া এক ইংরেজ-মহিলার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়

অবশ্যই কোন প্রাচীন ঋষির বংশধর। এখনও তাঁহার কন্যার বিবাহের সময় সেই সকল গোত্রপ্রবরকর্ত্তা ঋষিগণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্রের দ্বারা তাঁহার সেই গৌরব রক্ষা হইল কি?

এই সকল বিবাহ দ্বারা যে মিশ্রজাতির উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদিগকেও কি হিন্দু বলিতে হইবে?

অতএব সংস্কারকগণ হিন্দুর সংখ্যা বাড়াইতে গিয়া জাতিভেদ তুলিয়া দিতে বলিতেছেন; কিন্তু তাহার পরিণামে কোন্ জাতির উৎপত্তি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত; বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিয়া যৌবন-বিবাহ চালাইলে, তাহার ফলে অবাধ প্রেম চলিবে, তাহার ফলেও সেই বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে। বিধবা-বিবাহ তুলিয়া দিলেও লোকসংখ্যা যে বেশী বাড়িবে, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, তাহা হইলে কুমারীর সংখ্যা আবার সেই পরিমাণে বাড়িবে। তাহাতেও সমাজে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে। মুসল্‌মান-সমাজে অনেক স্থলে বাল্যবিবাহ নাই, বহু-বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ আছে; ইহার ফলে মুসল্‌মানদের সংখ্যাই বা কত বেশী বাড়িয়াছে? এই দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৫, আর মুসল্‌মানের সংখ্যাবৃদ্ধি শতকরা ৬-৭ জন।

এই যৎসামান্য সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য হিন্দুর জাতি, ধর্ম্ম ও আচারানুষ্ঠান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহারা হিন্দুকে আত্মঘাতী হইতে বলেন, মহাকবি কালিদাসের কথায় তাঁহাদিগকে বলিতে হয়—

"অল্পস্য হেতোর্ব্বহু হাতুমিচ্ছন্,
বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

গণাই চটী হইতে পর্ব্বতগুলি একটু দূরে দূরে অবস্থিত। একটা বিস্তৃত প্রান্তরের ন্যায় অনেকখানি জায়গা লইয়া সমতল। বাজারের সংলগ্ন ও নদীর তটবর্ত্তী অধিবাসিগণের বাসস্থানগুলি দেখিতে সুন্দর। রামগঙ্গা নামক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী ভীষণ বেগে কল কল তান তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্র-দর্শন হিমালয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এই স্থান হইতে অতি সামান্যই উপভোগ করা যায়। ইহার পরে নিম্নাভিমুখে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই হিমালয়ের সেই অভ্রভেদী শৃঙ্গ সকল ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। পর্ব্বতের রাজত্ব ছাড়িয়া যাইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে। ইহার পরেও আমাদিগকে অনেক পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু দেখিয়া মনে হইয়াছে, সেগুলি যেন বিশাল-কায় হিমালয়ের শিশু সন্তান। শ্রীকেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে হিমালয়ের যে পরমাদ্ভুত জীবন্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, চির-শুভ্র তুষাররাশিতে পূর্ণ এবং স্থির-গম্ভীর নগ্নমূর্ত্তি—এখানে তাহার নিতান্ত অভাব। শ্যামল তৃণ, লতা এবং স্থানে স্থানে পল্লবান্বিত বৃক্ষ সমূহে এখানকার পর্ব্বত-অঙ্গ ভরিয়া রহিয়াছে। এ দৃশ্যও বড় সুন্দর। এ অভিনব দৃশ্যাবলীতেও হৃদয়-মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু হায়, এ হেন সুন্দর স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে।

গণাই চটী হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া আমরা সেই বৃষ্টির মধ্যেই গণাই চটী হইতে বহির্গত হইলাম। বেশ সমতল রাস্তায় আমরা তিন জন নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে চলিয়াছি। কত কথাই হইতেছে; কত সুখ-দুঃখ, রঙ্গ-তামাসা, হাসি-বিদ্রূপের কথা চলিতেছে। বোধ হয়, তিন জনের পেটে তখন এমন কথা ছিল না—যাহা পরস্পরের কর্ণগত না হইয়াছে। বিশেষতঃ এখন সমতল রাস্তা পাইয়া হাসি-গল্পের মাত্রাটা কিছু অধিক হইয়াছে। এখন রাস্তার ধারে ধারে প্রায়ই দোকান দেখা যাইতেছে। আর অধিবাসিগণের ঘর-বাড়ীগুলিও খুব

কাছে কাছে। মাঝে মাঝে দুই একটি আম্রবৃক্ষও দেখা গিয়াছে। এইরূপ সুন্দর সমতল রাস্তায় আমরা আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং ৫ মাইল চলিয়া একটি দোকানে বিশ্রাম-লাভার্থ উপবেশন করিলাম। স্থির হইল, এখানে কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় চলিতে হইবে এবং সন্ধ্যাকালে কোন চটীতে উপস্থিত হইয়া আহারাদির ব্যবস্থা করা হইবে। দোকানে জিলিপি ভাজা হইতেছে; কিছু ক্রয় করিয়া তিন জনে উদরসাৎ করিলাম এবং অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রামানন্তর তথা হইতে রওনা হইলাম। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন; কিন্তু অনুমান বেলা ৩ টার পর হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমরা যখন সেই অজ্ঞাতনামা চটী হইতে রওনা হইয়াছিলাম, তখন বেশ পরিষ্কার ছিল; কিন্তু অল্পদূর আসিতেই প্রবল বেগে বৃষ্টি চাপিয়া ধরিল। তখন নিরুপায় অবস্থায় বৃষ্টির জল মাথায় করিয়াই চলিতে হইল। ভিজিতে ভিজিতে রাস্তার নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ীতে আশ্রয়-লাভার্থ উঠিয়া পড়িলাম। বাড়ীর লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। আমরাও সেখান হইতে রওনা হইলাম। এই রাস্তায় সামান্য চড়াই উৎরাই করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা গণাই চটী হইতে ১১ মাইল চলিয়া আসিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বুড়াকেদার উপস্থিত হইলাম। রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বে দুইখানি মাত্র দোকান। তাহারই ভাল ঘরখানিতে আমরা তিন জনে আশ্রয় লইলাম। সম্মুখে রামগঙ্গা নদী বহিয়া যাইতেছে। এ পারে চটী, আর ও পারে মন্দির এবং পাণ্ডাদের বাড়ী। আমরা দোকানদারকে বুড়াকেদার দর্শনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাদিগকে আশ্বস্ত করতঃ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া "নারদ মুনি হো" বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিল; অনেক ডাকাডাকির পর একজন জবাব দিল। দোকানদার আসিয়া আমাদিগকে বলিল,—'আপনারা প্রস্তুত হউন, পাণ্ডা আসিতেছে।' আমরা দোকানদারের জিম্মায় তল্পী-তল্পা রাখিয়া বাহির হইতেই দেখি, ছিন্ন মলিন বসন-পরিহিত যণ্ডামার্কের ন্যায় দুই জন লোক (পাণ্ডা?) 'আইয়ে' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। আমরা ত পাণ্ডাজীর চেহারা দেখিয়াই অবাক্। যাহা হউক, আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই পাণ্ডাদের সহিত বুড়াকেদার-দর্শনার্থে বাহির হইলাম। রামগঙ্গা নদী হাঁটিয়া পার হইয়া ও পারে মন্দিরে যাইতে হইবে।

ধীরে ধীরে নদীর ধারে উপস্থিত হইয়া দেখি, ভয়ঙ্কর স্রোত। গণাই চটীতে একবার এই নদী পার হইবার সময়ে ভয়ঙ্কর স্রোতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, আজও তদ্রূপ দশা। পাণ্ডা দুজন সঙ্গিদ্বয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক পার করিয়া লইয়া গেল। আমি একাই লাঠী ধরিয়া পার হইলাম। সামান্য উচ্চ ভূমিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মন্দির পাওয়া গেল। ক্ষুদ্র অন্ধকারময় মন্দির-মধ্যে একটি বৃহদাকার শিলারূপে বুড়াকেদার বিরাজ করিতেছেন। আমরা ভক্তিভরে প্রণামাদি করিয়া বাহিরে আসিলাম। পাণ্ডাগণ বলিল যে, বুড়া-কেদার দর্শন করিলে কেদারনাথ দর্শনের সমস্ত ফল পাওয়া যায়।

সঙ্গিদ্বয় যথাসাধ্য ভেট চড়াইলেন। পাণ্ডাপল্লীর ভিতর দিয়া নদীর তীরে ফিরিয়া আসিলাম। এবার নদী পার হইবার সময়ে আমাকে পাণ্ডার হাত ধরিতে হইয়াছিল। চটীতে আসিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, রাত্রি ৯টার সময়ে আমরা নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম। বেশ সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইল। মেহলচোরী হইতে বুড়াকেদার ১৯ মাইল। রাস্তা বেশ ভাল পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই আমরা এতটা রাস্তা একদিনে আসিতে পারিয়াছিলাম। এখান হইতে ১০ মাইল গেলে গরুর গাড়ীর রাস্তা পাওয়া যাইবে। পরদিন ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে বুড়াকেদার হইতে আমরা রওনা হইলাম। রাস্তা প্রায় সোজা, মাঝে মাঝে সামান্য উচু-নীচু। স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল জমিয়া কাদা হইয়াছে। এইরূপ রাস্তা ৪ মাইল অতিক্রম পূর্ব্বক লালাচটী পাইলাম। তথায় অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম এবং ৩ মাইল চলিয়া বেলা প্রায় ১২ টার সময়ে ভিথিয়াদৈন নামক একটা জনবহুল চটীতে উপস্থিত হইলাম। এখানে রামগঙ্গা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গম হইয়াছে। চটীর একটা দোকানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম পূর্ব্বক সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় সেখান হইতে যাত্রা করিলাম। নদী পার হইয়া সম্মুখের উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে হইবে। নদীতে জল সামান্য, স্রোতও তেমন নাই। অল্পক্ষণেই আমরা নদী পার হইয়া উচ্চ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলাম। ক্রমাগত ৩ মাইল চড়াই করিয়া বেলা অনুমান ২ টার সময়ে শ্রীকোট নামক স্থানে গাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। একটা দোকান মনোনীত করিয়া আহারাদির

ব্যবস্থা করা হইল। এখান হইতে রামনগর রেলষ্টেশন ৪২ মাইল। এই রাস্তাতে গরুর গাড়ীতে যাইবার সুবিধা আছে। অনেকগুলি গরুর গাড়ী এই চটীতে দেখিতে পাইলাম। সঙ্গিদ্বয়ের প্রস্তাবানুসারে গাড়ীতে যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। বিশেষতঃ বৃদ্ধ শ্যামা...দাদার আগ্রহাতিশয্যে আর কোন আপত্তি করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি ভাবিলাম, এই পর্ব্বতের চড়াই উৎরাই রাস্তা গরুর গাড়ীতে কি করিয়া যাওয়া হইবে? একে পর্ব্বতের গায়ে অতি সঙ্কীর্ণ পথ, অন্য দিকে বহু নিম্নে বিষম খাদ; তাহার উপর বিপরীত দিক্ হইতে অন্য একখানা গাড়ী আসিলে, এ গাড়ী তখন কোথায় দাঁড়াইবে? নানারূপ চিন্তা করিয়া আমি গাড়ীতে যাইতে অসম্মত হইলাম। সঙ্গিদ্বয় ছাড়িলেন না, বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সহিত গাড়ীতে উঠিতে হইল। বেলা অনুমান ২টার সময়ে আমরা গোশকটারোহণে শ্রীকোট পর্ব্বত হইতে রওনা হইলাম। বৃহৎকায় দুইটি বলদ এবং চক্রসমন্বিত গাড়ীখানি সামান্য চড়াই পথে ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। দুই টাকা চারি আনা করিয়া প্রত্যেকের ভাড়া স্থির হইল। চাকচিক্যময় দুইটি রজত-মুদ্রার পরিবর্ত্তে আমি পরিশ্রান্ত চরণ দুখানিকে একটু আরাম দিতে সমর্থ হইলাম। নগ্ন পাহাড়ের গা বহিয়া গাড়ীখানি চলিতে লাগিল। প্রায় ৭।৮ মাইল এইরূপে গাড়ীতে চলিয়া সিমি নামক একটা ক্ষুদ্র চটীতে রাত্রিযাপনের জন্য গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। চটীতে আসিবার পূর্ব্বেই রাস্তাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। গাড়ী হইতে অবতরণমাত্রেই প্রবল বেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমরা একটি দোকানে আশ্রয় লইলাম। অল্পক্ষণ পরে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া নিদ্রা দেওয়া গেল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইয়াছিল। কম্বল মুড়ী দিয়া কোনরূপে রাত্রিটা অতিবাহিত করিলাম। পরদিন ৩১শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গোশকটে সিমি চটী হইতে রওনা হইলাম। ধীর-মন্থর গমনে গাড়ীখানি পার্ব্বত্য রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। বদরিকাশ্রমপ্রত্যাগত বিভিন্ন দেশের বহুতর যাত্রী রামনগর ষ্টেশনাভিমুখে দ্রুত চলিয়াছে। মাঝে রাস্তায় একটি সুন্দর সরকারী ডাক্তারখানা দেখিতে পাইলাম। রাস্তার বামপার্শ্বে প্রস্তর-নির্ম্মিত বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি দ্বিতল গৃহ।

তখন ডাক্তারখানা বন্ধ ছিল। শকট-চালককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ইহা একটি সরকারী দাওয়াইখানা। বহু দূর-দূরান্তরে দু একখানা গৃহস্থের বাড়ী ব্যতীত তেমন কোন গ্রাম দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, যাত্রিবর্গের সুবিধার নিমিত্তই এরূপ স্থানে সরকার বাহাদুর দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। স্থানটি বড়ই সুন্দর। ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দূরে দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার নিম্নদেশে নানাবিধ শস্যক্ষেত্র। পাহাড়গুলিতে বৃক্ষাদির বড়ই অভাব, কিন্তু পক্ষিকুলের অভাব নাই। সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী কোন জঙ্গলে তাহাদের বাসস্থান। সমস্ত দিন এই সমস্ত পাহাড়ে, শস্যক্ষেত্রে প্রফুল্লচিত্তে নির্ভয়ে আহার-বিহার করিয়া সন্ধ্যাসমাগমে তাহারা স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সুমধুর হর্ষ-কাকলীতে উপত্যকা-ভূমি মুখরিত করিয়া কি আনন্দেই তাহারা বিচরণ করিতেছে। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়! নিষ্ঠুর ব্যাধের আক্রমণভয়ে তাহারা কোন দিন ভীত নহে। জন্মাবধি তাহারা এইরূপ স্বাধীন-ভাবেই বিচরণ করিতেছে। এই সমস্ত স্বচ্ছন্দচিত্ত পক্ষিকুল এবং নানাবিধ নয়নমনোরঞ্জন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা গোশকটে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনুমান ৪।৫ মাইল চলিয়া মধ্যাহ্নকালে অরণ্য-বেষ্টিত একটা পরিষ্কার চটীতে উপস্থিত হইলাম। চটীতে মাত্র দুইখানি দোকান; কিন্তু বড়ই নোংরা। আর ঘর দুইখানি যাত্রীতে একেবারে পরিপূর্ণ! শকট-চালক এই চটীতেই আহারাদি করিবে, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকেও এইখানে নামিতে হইল। যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে শকট-চালক আহারাদি করিয়া আসিলে, আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম; পার্ব্বত্য জঙ্গল-পথে আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। এইরূপ জঙ্গল রাস্তায় কয়েক মাইল গাড়ীতে চলিবার পরে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শ্রীমৎপুর নামক একটি ক্ষুদ্র চটীতে উপস্থিত হইলাম। চটীতে যদিও ৩.৪ খানার বেশী দোকান নাই, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নিকটেই একটি প্রস্রবণ। আমরা একটি দোকান মনোনীত করিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিনের পরে উত্তমরূপে খিচুড়ী ভক্ষণ করা হইল। আহার্য্য দ্রব্যাদি এখানে অপেক্ষাকৃত সস্তা পাওয়া গিয়াছিল। আরও কয়েকখানি গড়ী এই চটীতে আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রিতে আহারাদির পর তিন জনে নানা প্রসঙ্গ

আলোচনা করিতে করিতে শয়ন করিলাম। সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন ১লা আষাঢ়, রাত্রি থাকিতে থাকিতেই শকটচালক আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিল। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। অতি প্রত্যুষেই আমাদের গাড়ী শ্রীমৎপুর চটী পরিত্যাগ করিয়া চলিল। দোকানদারটি বড় ভালমানুষ। চটী হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে সে গাড়ীর নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে জানাইল যে, আমরা তাহার দোকানে আশ্রয় লইয়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছি, সে অত্যন্ত গরীব, অর্থাভাবে কিছু করিয়া উঠিতে পারে না, তবে আমাদের মত "শেঠজীদিগের" (?) দয়া থাকিলে সে অল্পদিনেই অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। আর আগামী বৎসর যাত্রিসংখ্যা এইরূপ থাকিলে, সে অবশ্যই দোকানের উন্নতি করিবে। পাহাড় দেশে যৎসামান্য আয়, অনেকগুলি পোষ্য, কোনরূপে ভগবানের দয়ায় দিন গুজরাণ করিতেছে ইত্যাদি। আমারা তাহার অকপট সরলতায় প্রীত হইলাম। সুকঠিন পর্ব্বতের মধ্যেও এমন কুসুম-কোমল হৃদয় আছে!! ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আমরা তাহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইয়া পড়িলাম। তখনও রাত্রির অন্ধকার অপসারিত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

৩য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩২২ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামনি, শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী এম, এ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট হইতে মহাকবি ভাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যজগতে এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থাপিত করিয়াছে, আমরা ভাসের নাটকাবলী কথাকারে অনূদিত করিবার জন্য ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে অনুমতিপত্রের নকল প্রদত্ত হইল। কবিকথার মালতী-মাধব শেষ হইলেই ভাসের নাটকাবলী কবিকথাকারে প্রকাশিত হইবে।

No. 220.

Office of the Curator for the publication of Sanskrit
Mss. Trivandrum
6th, April 1915

Dear Sir,

In reply to your kind letter dated 5. 3. 15, I have great pleasure to inform you that the Government have permitted you to translate into Bengali the works of Bhasa in the form of a tale. You may also consult with advantage the Pratimânâtaka one of the best works of Bhasa and also an improved second edition of Svapnavâsavadatta, both will be published in a month.

I am Dear Sir,
Yours truly
Sd T. Ganapati Sastri
Curator.

To Nikhil Nath Ray esq.

আলোচনা।

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়।

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আইন পাশ হইয়া গেল; গবর্ণমেণ্টও সাহায্য করিবেন স্থির হইয়াছে। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইংরেজী শিক্ষার সহিত হিন্দু-ধর্ম্মের আলোচনা কিরূপ ভাবে মিশ খাইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তবে কর্ত্তৃপক্ষেরা যখন ইহাকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তখন আমরা তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। তাঁহাদের পর্ব্বত-প্রমাণ উদ্যোগের ফল শেষে মুষিকপ্রসবে পরিণত না হইলে বাঁচি। বাস্তবিক তাঁহারা যদি ছাত্রদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত হিন্দু করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাহাদুরী বলিতে হইবে। কিন্তু হায়, এই বর্ত্তমান যুগে তাহা কি সম্পন্ন হইয়া উঠিবে? এত অর্থ ব্যয় করিয়া যদি আমাদের ছাত্রগণকে যথা পূর্ব্বং তথা পরং করা হয়, তবে তাহাতে লাভ কি? দেখা যাউক, কর্ত্তৃপক্ষেরা কিরূপ ভাবে ছাত্রজীবন গঠিত করিয়া তুলেন।

সাহিত্য-সম্মিলন।

এবার যশোহর নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক বসিবে। অনেকে হয় ত মনে করিবেন, ইহা প্রতাপাদিত্যের যশোর; কিন্তু তাহা নহে। প্রতাপাদিত্যের যশোর এক্ষণে সুন্দরবনে রহিয়াছে। তবে তাহারই নাম লইয়া এ যশোরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ যশোর বর্ত্তমানে যশোর জেলার সদর। সম্মিলনের এবারকার অধিবেশনে সাধারণ সভার ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইয়াছেন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রথমে বর্দ্ধমানাধিপতির হওয়ার

কথা ছিল। তিনি বিনয়নম্রতা সহকারে তাহার প্রত্যাখ্যান করায়, শাস্ত্রী মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। তাহা ভালই হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় একজন প্রাচীন সাহিত্যিক; তাঁহার নির্ব্বাচনে আমরা সুখী। দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। আর বিজ্ঞান-শাখায় হইয়াছেন—মিষ্টার পি, এন, বসু। ইঁহারা উভয়েই উপযুক্ত ব্যক্তি। তাহার পর ইতিহাস-বিভাগের কথা, ইতিহাস-বিভাগে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব। তাঁহার নির্ব্বাচনে নাকি কিছু গোল বাধিয়াছিল। তাহার কারণ নাকি নগেন্দ্রবাবু কুলশাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইতিহাস লিখিয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি সভাপতি হইবার যোগ্য নহেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইহা একটি বিস্ময়ের কথা বলিতে হইবে। মতভেদ সকল দেশেই আছে। মতভেদের জন্য যদি উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্যে অরাজতা উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। স্বাধীন মতের আলোচনায় যদি কাহাকে বাধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা যে জবরদস্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নগেন্দ্র বাবুকে সভাপতি না করিলে, তিনি কি তাঁহার মত পরিত্যাগ করিবেন, না এমন কাহার সাধ্য আছে যে, তাঁহাকে তাঁহার মত পরিত্যাগ করাইবে? তাঁহার মতের অসারতা থাকে ত তাহার প্রতিবাদ কর ও আপনাদের মতের সারবত্তা-প্রদর্শনের চেষ্টা করিতে থাক; কিন্তু তাই বলিয়া যিনি উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁহার সম্মানের লাঘব করিতে চেষ্টা করা কি ভদ্রতা-সঙ্গত? নগেন্দ্র বাবু যে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তিনি কি কেবল কুল-শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইতিহাস লিখিয়া থাকেন? অন্য কোন বিষয়ের আশ্রয় লন না? সে যাহা হউক, আমরা নগেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে এখানে অধিক বলিতে চাহি না। বঙ্গবাসীমাত্রেই তাঁহার বিষয় বিশেষরূপেই অবগত আছেন। তাঁহাকে ইতিহাস-শাখার সভাপতির পদে বৃত হইতে দেখিয়া আমরা যার-পর-নাই সুখী হইয়াছি। এক্ষণে আমরা সম্মিলনীর সাফল্যের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, এই শাখাবিভাগে সম্মিলনের কার্য্যের সুবিধা ঘটে না, শাখায় শাখায় ভ্রমণ সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ সে বিষয়ে আদৌ মনোযোগ দিতেছেন না।

নব্য-শিক্ষিতের ধৃষ্টতা।

আজকালকার নব্য-শিক্ষিত-গণ এরূপ ধৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রাচীনের সম্মান রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক নহেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকরণে তাঁহারা সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসকে গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাই আমাদের দেশের যাহা কিছু প্রাচীন, তাহা তাঁহাদের নিকট অশ্রদ্ধেয়। আমাদের সাহিত্য, আমাদের দর্শন, আমাদের ইতিহাস কিছুই তাঁহাদের নিকট রুচিকর নহে। তাঁহারা আমাদের ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, বেদ-উপনিষদ্‌কে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন, পুরাণ-ইতিহাসকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। কেন করেন, তাহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, উহা অন্ধকারময়, আর পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস আলোকময়। আমরা বলি, তাহা নহে, তোমাদের মস্তিষ্কের এমন শক্তি নাই যে, তোমরা সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার পর আলোক দেখিতে পাও। সমুদ্রের অতল জল হইতে রত্ন উদ্ধার করিতে হইলে, শক্তির প্রয়োজন; উপরে ভাসিয়া বেড়াইলে তাহা হয় না। তোমরা কেবল উপরে ভাসিয়াই বেড়াও, গভীরতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা তোমাদের কোথায়? আর ভাল মন্দ বিচারের শক্তি তোমাদের কি আছে? তোমরা চিরদিনই আবর্জ্জনা ঘাঁটিবে, রত্ন পাইলে ফেলিয়া দিবে। তোমাদের গলায় কেহ মুক্তার মালা দিলে তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ফলতঃ কথা এই যে, তোমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার চিন্তা-প্রণালী একরূপ, প্রাচ্য-শিক্ষার চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ। তোমরা যতই কেন পাশ্চাত্য শাস্ত্রে পণ্ডিত হও না, কখনও প্রাচ্য শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে ধৃষ্ট হইয়া তোমরা প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজনদিগের প্রতি অশ্রদ্ধেয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক।

কালিকাতত্ত্ব।

গতবারে কালিকাতত্ত্ব বিষয়ে চণ্ডীর প্রথম অধ্যায় হইতে ব্রহ্মার উক্তি উদ্ধৃত করিতে গিয়া "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা। সুধা ত্বং" এইটুকু মাত্রের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এবার তাহার পর হইতে চলিবে। পাঠকগণ গতবারের খাশ্বতীখানি সম্মুখে রাখিয়া সেই বাক্যগুলি ধরিয়া ধরিয়া বুঝিয়া লইবেন।

ব্রহ্মা জগন্মাতা কালিকার বাহ্য উপাসনা বিষয়ে অসামর্থ্য বুঝিতে পারিয়া তা মাকে আবেদন করিয়াছেন। এবার বাহ্যপূজার পরবর্ত্তী জপ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয়ে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ভাবিলেন, মায়ের বাহিরের আরাধনা না হয় নাই হইবে, আমি অন্তরে অন্তরে জপ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারাই মাকে পরিতুষ্ট করিব। মানবগণই বাহ্যপূজার দ্বারা সংস্কৃত-হৃদয় হইয়া জপ-যজ্ঞে অধিকার লাভ করে। পরে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে ধ্যানধারণা এবং তাহাতে সুশিক্ষিত হইলে অবশেষে মানস পূজায় সমর্থ হয়। কিন্তু আমি ত মানব নহি—বাহ্য, অন্তর সর্ব্বত্রই আমার সমান অধিকার; আমি এক্ষণে বহীরাজ্যের ফলাভিলাষ করিতেছি বলিয়াই বাহ্য আরাধনার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যখন সম্ভবপর নহে, তখন জপযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। জপযজ্ঞ বাহ্য আরাধনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বটে, এই মনে করিয়া জপযজ্ঞের অনুষ্ঠানের প্রতি পিতামহ মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, তাহাও বাহ্য পূজার সমক্ষেত্রে নিপতিত; তাহাও তাঁহার স্বাধীন ক্ষমতার অতীত; কাজেই জপযজ্ঞের আরাধনাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিতেছে না। এজন্য "অক্ষরে নিত্যে" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা জপযজ্ঞেও অসামর্থ্য বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। জপযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রণবাদি মহামন্ত্রের জপ করাই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বিষয়। মহামন্ত্র জপের দ্বারা তাহার অলৌকিক মহাশক্তি আবির্ভূত হইয়া উপাসককে উপাস্যের সহিত মিলিত করিয়া ফেলে। কাজেই উপাস্যে আত্মসমর্পণ হয়। এইরূপ জপ-যজ্ঞ উপাসনারূপে পরিগণিত। সেই মন্ত্র-সমূহের মধ্যে কেবল বৈদিক শাসনের ওঁকারটিই প্রথম।

দ্বিতীয় গায়ত্রী, তৃতীয়, চতুর্থ অন্যান্য মন্ত্র। তাই হিরণ্যগর্ভের প্রথমে সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতীকরূপ প্রণব মহামন্ত্রের উপরেই লক্ষ্য পড়িল। লক্ষ্যমাত্রেই দেখিতে পাইলেন, প্রণবরূপ মন্ত্র-শরীরে যে অ, উ, ম এই তিনটি মাত্রা আছে আর তাহার পরভাগে নাদবিন্দু নামক বিশেষরূপে উচ্চারণের অযোগ্য যে অর্দ্ধমাত্রা নিহিত, তাহাদের প্রত্যেকের শক্তিই তাঁহার আরাধ্য দেবতা কালিকা দেবীর অনন্ত শক্তিময় শরীর হইতে সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের মত ফুটিয়া উঠিতেছে। এই দেখিয়া যেন বিস্মিতবৎ ভাবে 'অক্ষরে নিত্যে' ইত্যাদি উক্তি করিতে লাগিলেন। ইহার ভাবার্থ এই—"মা গো, আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার দ্বারা তোমার বাহ্য-পূজা না হয় নাই হইবে, তাহার পরবর্ত্তী জপযজ্ঞে ত আমি অধিকারী; অতএব তাহাই করিয়া তোমার প্রসন্নতারূপ ফললাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহাও তোমারই ক্ষমতার অধীন। তদ্বিষয়ে আমার কোনও স্বাধীন প্রভুত্ব নাই। জপযজ্ঞের মুখ্য উপকরণ মন্ত্র, তার মধ্যে প্রণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। কিন্তু মা, আমি দেখিতেছি, ওঁকাররূপ সেই নিত্য অক্ষরটির মধ্যে অ, উ, ম এই যে তিনটি মাত্রা আছে, তাহারা যে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ত্রিগুণজনিত এই ত্রিশক্তির প্রকাশ করে আর তদ্দ্বারা যথানিয়মে অন্তরাত্মাকে তোমার নিকটে উপস্থিত করিয়া দেয়, ঐ শক্তিত্রয় সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় তোমা হইতেই ফুটিয়া উঠিতেছে। এ কারণে ঐ তিন মাত্রা তোমারই শক্তি বা রূপবিশেষ। ঐ তিন মাত্রা যথাক্রমে তোমার বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন মূর্ত্তির সহিত অভিন্ন। আবার, তাহার পর যে নাদবিন্দুরূপ অর্দ্ধমাত্রা প্রকাশ পাইতেছে, যাহা বিশেষরূপ উচ্চারণের অযোগ্য, যাহা কেবল অ, উ, ম এই অক্ষরত্রয়ের সংযোগে উচ্চারণ হইলে, তাহার পরভাগে দীর্ঘঘণ্টানিনাদের অবসানের মত কিঞ্চিন্মাত্র উচ্চারিত হয়, যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার প্রজ্ঞান-ঘনরূপ আনন্দময় মূর্ত্তির সহিত উপাসককে মিলাইয়া দেয়, তাহাও তোমারই শক্তির দ্বারা পরিস্ফুরিত এবং তোমার আনন্দময় মূর্ত্তির সহিত অভিন্ন; অতএব অর্দ্ধমাত্রার সহিত এই সার্দ্ধত্রিমাত্র ওঁকাররূপ প্রণব যদি তোমা হইতে শক্তিসম্পন্ন হইয়া তোমার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়, তবেই তোমায় জপ-যজ্ঞরূপ উপাসনা হয়, তদ্ব্যতীত তাহা অসম্ভব; তাহা হইলে তোমার দ্বারাই ত তোমার উপাসনা হইবে, আমার বা আমার প্রযত্ন সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পঙ্গু। তবে তোমার দ্বারা তোমাকে

উপাসনা করিয়া আমি তাহার ফলের আশা করিব কিরূপে? আর আমি নিজেই বা জপযজ্ঞের দ্বারা তোমার আরাধনা করিলাম, ইহা ভাবিয়া কিরূপে সন্তুষ্ট হইতে পারি? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে, সঙ্গতও নহে; অতএব প্রণবের দ্বারা জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অমার অসাধ্য।

তাহার পর দ্বিতীয় মন্ত্র গায়ত্রী। এই গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্রজপের দ্বারাও জপ-যজ্ঞ সম্পন্ন করা আশা করা যাইত। কিন্তু মা, আমি জাজ্বল্যমান দেখিতেছি, সেই সাবিত্রীর প্রতিপাদ্য দেবতাও তুমি, সাবিত্রীর মন্ত্রটিও তুমি; আবার সাবিত্রীর মন্ত্রমধ্যেও যে শক্তি দেখিতেছি, যদ্দ্বারা সাবিত্রী-জপকারী সাধককে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারে, সেই শক্তির তরঙ্গ তোমা হইতে প্রস্ফুটিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি বেদের মধ্যে (ছান্দোগ্য) "গায়ত্রী হ বা ইদং সর্ব্বং * *" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা তুমি গায়ত্রীস্বরূপ, এ বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছি; অতএব গায়ত্রী আমার নিজস্ব সামগ্রী নহে। আরাধনা-সম্পাদক তাহার শক্তিও আমার কিছু নহে, সমস্তই তুমি বা তোমার। তাহা হইলে গায়ত্রী-জপ উপকরণে আরাধনা করিলে তোমার উপকরণেই তোমার আরাধনা করা হইল। তবে সে বিষয়ে আমি কি করিলাম?

গায়ত্রী-মন্ত্রে প্রতিপাদ্য অনন্ত জগৎপ্রসূতি মহাশক্তিসম্পন্ন চিৎ সমুদ্র; এক কথায় বলিলে জগৎপ্রসবিত্রী বা পরাজননী। আবার, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার এই ত্রিশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণীও গায়ত্রীমন্ত্র-প্রতিপাদ্য-মধ্যে পরিগণিত। সংক্ষেপে বলিলে ওঁকাররূপ প্রণবের অর্থও যাহা, গায়ত্রীর অর্থও তাহাই। ইহাও আমি সেই বেদে গায়ত্রী প্রকরণে স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু মা, সেই পরাজননী ত তুমিই; আর তুমিই সেই ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী। লৌকিক মা যেমন শিশু সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখে, তুমি তেমন এই অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগুলিকে নিজের বক্ষে ধারণ করিয়া আছ। আপনার প্রসবশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি দ্বারা তুমি এই জগৎটাকে প্রসব করিয়াছ। ইহার অবস্থিতি বা পালনও তোমা হইতে হইতেছে। আবার শেষে যে সকলেরই সংহার হইতেছে দেখা যায়, তাহাতেও মনোনিবেশ করিয়া দেখিতেছি, তুমি সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছ। এই জন্য তোমার নাম 'অদিতি'। আবার সর্ব্বদেবজননী বলিয়া 'দিতি'। ইহা আমিই কঠ, বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে

ও মন্ত্রজাপে বারংবার বলিয়া আসিয়াছি। * সৃষ্টিকালে তুমিই সৃষ্টিশক্তিরূপে, আর অবস্থিতিকালে স্থিতিশক্তি এবং এই জগতের সংহারকালে সংহৃতি-শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছ। এই ভাবে তুমি জগন্ময়ী; অতএব সাবিত্রীমন্ত্রের জপযজ্ঞও স্বাধীনভাবে আমা হইতে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।" এই হইল "জগত্তোহস্য জগন্ময়ে" উক্তি-সমূহের ভাবার্থ। এই ভাবে চতুরানন কালিকা দেবীকে জপযজ্ঞের অসামার্থ্য নিবেদন করিয়া সেই প্রবৃত্তির প্রত্যাহার করিলেন।

অতঃপর স্বয়ম্ভুর ধ্যানধারণারূপ তৃতীয় সোপানের আরাধনায় প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তিনি লোকেশ, সকল সোপানেই তাঁহার সমান অধিকার, কেবল মধু-কৈটভের নিধনরূপ বাহ্যফলকামী হইয়াছেন বলিয়াই,—অধম হইলেও প্রথম বাহ্য উপাসনা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন, এবং যথাক্রমে উচ্চ উচ্চ উপাসনায় তাঁহার লক্ষ্য পড়িতেছে। কিন্তু এক্ষণে এই তৃতীয় আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়াও ব্রহ্মা আশান্বিত হইতে পারিলেন না। দেখিলেন, ইহাও সেই পূর্ব্ব-কল্পিত উপাসনাদ্বয়ের অবিশেষ। তাহাও যেমন ব্রহ্মার নিজস্ব ক্ষমতার অতীত, এই ধ্যান-ধারণাও ঠিক সেইরূপ; এ কারণে ইহাও পারিলেন না; তাহাই মাকে মহাবিদ্যা ইত্যাদি উক্তিদ্বারা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন।

বাহ্য বা আন্তরিক যে কোন বস্তুর ধ্যান করা যায়, অন্য জ্ঞানের অনন্তরিত কেবল সেই বিষয়টারই মানসিক প্রত্যক্ষ চিন্তাপ্রবাহ ধারাবাহিকক্রমে চলিলে চিত্তের সেই অবস্থাকে ধ্যান বলে—"অপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"—পাঃ দঃ। তবেই বুঝিতে হইবে যে, অন্তরের বস্তু হইলে সুখদুঃখাদির ন্যায় হৃদয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে তাহার উপলব্ধি, তাহার ধ্যান। আর বাহ্যবস্তু হইলে, স্মৃতিরূপে পূর্ব্বজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই তাহার ধ্যান। জগন্মাতা কালিকা সকলের অন্তরেও সর্ব্বতোভাবে বিরাজমানা, বাহিরেও কুত্রাপি তাঁহার অবস্থিতির অসদ্-ভাব নাই। জগতের সত্তারূপ ত তিনিই। তথাপি ব্রহ্মা যখন তাঁহাকে ধ্যান করিতে বসিবেন, তখন হৃদয়মধ্যে তাঁহার সত্তা দেখিতে পাইবেন। কাজেই বাহিরের স্মৃতির অবকাশ থাকিবে না। অতএব অন্তরে অন্তরে অবিচ্ছিন্নভাবে

* সেই শ্রুতিগুলি পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

ধারাবাহিকক্রমে জগন্মাতার তত্ত্ব উপলব্ধিই তাঁহার ধ্যান হইবে। সেই কালিকা-দেবীর প্রকৃত রূপ সর্ব্বশক্তির সামান্যাবস্থায় অন্তরালে উদ্ভাসমান চৈতন্য-সমুদ্র। অতএব অবিদ্যার কলঙ্ককলা থাকা পর্য্যন্ত সে রূপটি অন্তরে দেখিতে পাওয়া যায় না। তমঃ আর রজোগুণবিশেষে লুকাইয়া গেলে, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় যখন পরিপূর্ণ সত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন সেই আলোকই সেই দুর্লক্ষ্য তত্ত্বের সাক্ষ্যদান করিতে পারে। সত্ত্বের তাদৃশ পরিপূর্ণ ভাবকে শাস্ত্রে 'সত্ত্বপুরুষান্বিতা খ্যাতি' এবং 'বিদ্যা মহাবিদ্যা' ইত্যাদি নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন। এখন ব্রহ্মা যদি সেই অবস্থায় উঠিতে পারেন, তবেই কালিকাদেবীর ধ্যান করা হয়। আর ধৈর্য্যবশে যদি ব্রহ্মরন্ধ্র বা হৃদয়াদিস্থানে স্থির থাকা যায়, তবেই তাঁহার ধারণা করা হইল। এই ভাবে এই দুইটির সমাবেশ হইলেই জগদম্বা বিষয়ে ব্রহ্মার ধ্যান-ধারণারূপ আরাধনা সম্পন্ন হয়। কিন্তু তিনি দেখিতেছেন, তাহা তাঁহার আয়ত্ত নহে। উহা সেই কালিকামাতারই ক্রোড়ের দ্রব্য। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা বলিয়া 'মহাবিদ্যা' নামে খ্যাত। তাই ব্রহ্মা বলিলেন, "মা গো! আমি যে মহাবিদ্যা আর ধৈর্য্যশক্তির দ্বারা তোমার ধ্যানধারণারূপ আরাধনা করিব, তাহাও তোমারই মূর্ত্তি। তুমি মহাবিদ্যা; আবার যে অবিদ্যার অপনোদন না করিতে পারিলে তোমাকে দেখা যায় না, সেই 'মায়া'-নাম্নী অবিদ্যা তোমা হইতেই ফুটিতেছে; মহতী মেধাশক্তি, মহতী স্মৃতিশক্তিও তুমিই। ইহা তোমা হইতেই ফুটিয়া উঠিতেছে, সুতরাং তুমি যদি মহাবিদ্যারূপে হৃদয়ে আবির্ভূতা হও, আর তোমার দর্শনে প্রতিবন্ধক অবিদ্যার প্রতিসংহার কর এবং মেধা ও স্মৃতিশক্তিরূপে হৃদয়ে উদিত হও, তবেই তোমার ধ্যানধারণারূপ উপাসনা হইতে পারে। আমার নিজস্ব কোনও শক্তির দ্বারা তাহা সাধিত হইতে পারে না। কাজেই তোমারই আনুকূল্যে তোমারই প্রযত্নবিশেষে তোমারই ধ্যানধারণা করা হয়। তাহাতে আমার কি করা হইল! অতএব তোমার ধানধারণারূপ উপাসনা করাও আমার ক্ষমতার অতীত। এখন কি উপায়ে আমি তোমার প্রসন্নতালাভ করিব? কোন্ উপায়েই বা বিষ্ণু জাগ্রত হইবেন? কেমন করিয়াই বা মধুকৈটভরূপ এই দারুণ রিপুদ্বয়ের নিধন হইবে?"

এবার এই পর্য্যন্ত রহিল।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

বিশ্বমাতা।

সুপ্ত শিশুর শিয়র পরে
অনিদ্রাতে রাত্রি জাগি',
জননী যে ব্যজন করে
স্বেদ অপনোদন লাগি।
কৃতাঞ্জলি এলোকেশে
দেব-দুয়ারে প্রণাম করি',
শিশুর শুভ যাচে যে সে
উপবাসের ব্রত ধরি।
শিশু যদি বুঝে না তা'
জেনেও যদি বুঝে না রে,
তাই ব'লে কি বৎসলা মা
ভুলে কভু থাক্‌তে পারে?
কাহার পুণ্য শুভ আশা
কাহার আশীর্ব্বাদের বাণী,
সুখের দিনে ক'রে তুলে
মোহন মধুর ভুবনখানি?
জীবন রস কে যোগাবে
ভিন্ন মায়ের স্তন্য-সুধা,
মা ছাড়া কে বুঝ্‌তে পারে
অসহায়ের তৃষ্ণা ক্ষুধা।
বিপদ দিনে দেখনি কি
তার ভ্রূকুটী-রাঙা আঁখি,

রুক্ষশাসন কল্যাণেরি
দুঃখ ব্যথা দেয় যে আঁকি।
পাপের দিনে দ্বিধার রূপে
পিছু হ'তে তোমায় টানে,
কার ভ্রূকুটী মাত্রার রিনে
অনুতাপের তপ্ত প্রাণে।
তোমার ক্ষতি করছ তুমি
লোকে শাসন করবে কেন?
তবু যে সে শাসন লভ'
সে শুধু সেই মায়ের জেনো।
প্রতি পদক্ষেপে সে যে
সাথে সাথেই থাকিয়াছে,
পথের কাঁটা দেয় সরায়ে
পায়ে তোমার বিঁধে পাছে।
যাহা কিছু বিবেক ব্যথা
যাহা রাঙা আঁখির জল,
যাহা কিছু সুখের কথা
শুধু সে মার স্নেহের ফল।

শ্রীকালিদাস রায়।

লক্ষ্মীর দৃষ্টি।

স্থান শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী ব্রহ্মপুর গ্রাম। শ্রীযুক্ত অভয়ানাথ ন্যায়ালঙ্কার আপন চতুষ্পাঠী-গৃহে উপবিষ্ট—পার্শ্বে সেই শ্রীযুক্ত হরিচরণ দেব বি, এ, * সমাসীন। তিনি একটা কার্য্যোপলক্ষে বিদায় লইয়া বাড়ী গিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে আলাপ হইতেছিল—বন্যায় সমগ্র দেশ ভাসাইয়া নিয়াছে—মাঠে শস্য নাই, আবার গোগ্রাস অভাবে গবাদি পশুও অনাহারে থাকিতেছে। গৃহস্থ সাধারণ মাথায় হাত দিয়া ভীষণ মন্বন্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে; ভগবান্ অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন, বুঝি বা মহালক্ষ্মীর লীলানিকেতন শ্রীহট্ট-ভূমি উৎসন্ন হইয়া যায়।

এমন সময়ে এক মুসলমান ফকির আসিয়া ভিক্ষার্থী হইল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন,—"ফকির সাহেব, তোমার সেই ছড়াটি গাও।"

"ঠাকুর মহাশয়, কোন্ ছড়াটি?"

"কেন, সে দিন যেটি গাইয়াছিলে—সেই "লক্ষ্মী বলে,—ইত্যাদি।"

ফকির সাহেব গাইতে লাগিল;—

"সকাল বেলা ঝাড়ু দেয় সন্ধ্যাবেলা বাতি।
লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি॥
বেলোদানে † ঝাড়ু দেয় সন্ধ্যা গেলে বাতি।
লক্ষ্মী মাতা তারে ছাড়ে মুখে মারি লাথি॥
গোময় ফেলিতে যেবা ঘৃণা ভাবে মনে।
লক্ষ্মী বলে কভু না যাই তাহার সদনে॥
নাইয়া ধুইয়া ‡ যেবা নারী মুখে দেয় রে পান।
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান॥

* পাক্ষতী আশ্বিন ১৩২১ দ্রষ্টব্য।

† বেলা হইয়া গেলে।

‡ স্নানাদি করিয়া।

রান্ধ্যা বাড়্যা যেবা নারী পুরুষের আগে খায়।
ভরা না কলসীর জল তরাসে শুকায়॥ *
নাইয়া ধুইয়া যেবা নারী উল্টা বান্ধে কেশ।
ছয় মাসের মধ্যে তার পতি হয় শেষ॥
পায়ের উপর পাও থুইয়া যেবা নারী বসে।
ছয় মাসের মধ্যে তার শাঁখা সিন্দুর খসে॥
ঢুমঢুমাইয়া হাঁটে নারী চোখ্ পাকাইয়া চায়।
ছয় মাসের মধ্যে তার পতিটিরে খায়॥
সতী নারীর পতি যেমন দেউলের চূড়া।
অসতীর পতি যেমন ভাঙ্গা নাওয়ের গোড়া॥ †
লক্ষ্মী বলে আরে কাফের আর কব কি।
শুনিয়া তরিয়া যাও ভজ মোকসিদ্ধি॥ ‡

ছড়া শেষ করিয়া ফকির সাহেব ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল। হরিচরণ বাবু ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। যেন কিছু প্রশ্ন করিবেন—তার ভাষা খুঁজিতেছিলেন।

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন,—"হরিচরণ, শুনিলে? এ দেশের মুসলমানেরাও এইরূপ লক্ষ্মীচরিত্র গাইয়া বেড়ায়; এটা দেখিতেছি, হিন্দুর কাছ হইতে শিখিয়াছে; কিন্তু আমাদের হিন্দুদেরই মধ্যে আজকাল এই সকল সদাচার দেখা যায় কি? আর নিষিদ্ধ আচরণগুলিই যেন আজকালকার রমণীগণের মধ্যে চলিতেছে দেখা যায়। ইহাতে লক্ষ্মীর সুদৃষ্টি আমাদের উপর থাকিবে কিরূপে? দেশে যে এই দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখিতেছ, কমলার কৃপাদৃষ্টির অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, আমরা সকলেই লক্ষ্মীর সানুগ্রহ দৃষ্টিলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, তাই এই দুরবস্থা।"

হরিচরণ। মহাশয়, আপনার বাক্যের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। আপনি

* অর্থাৎ পূর্ণ ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যায়—কেননা, লক্ষ্মী তাহার প্রতি বিমুখ হন।
† কোন্ সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার স্থিরতা নাই।
‡ এইটা বোধ হয় ফকির সাহেবের নাম। লক্ষ্মীটি ও সহান ফকির সাহেব সধর্ম্মা হইলেন, তাই 'কাফের' সম্বোধন।

ধলেন, তাই আমারও বিশ্বাস হয় যে, "লক্ষ্মীর দৃষ্টি" হারাইয়া আমাদের দেশের লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে। তবে এই মুসলমান ফকিরের ছড়া ছাড়া আপনার কাছ হইতে শাস্ত্রের বিধান কিছু শুনিতে চাই, নচেৎ তৃপ্তি হইতেছে না।

ন্যায়ালঙ্কার। সাধু, হরিচরণ সাধু। কিন্তু শাস্ত্রের কথা কি খাস সংস্কৃতে শুনিতে চাও, না বঙ্গভাষায় তরজমা করিয়া বলিব?

হরিচরণ। আমি সংস্কৃত ভাল জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকায় মাত্র 'অস্তি ভাগীরথীতীরে' কিছু পাঠ করিয়াছিলাম—তাও এখন বোধ হয় 'নরঃ নরৌ নরাঃ' পর্য্যন্ত মনে নাই। তথাপি আমার সংস্কৃত বাক্যগুলি শুনিতে বড় ভাল লাগে। বিশেষতঃ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের কৃপায় বাঙ্গালা ভাষাটি এমন সুন্দর হইয়া গঠিত হইয়াছে যে, মাতৃভাষায় সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে সংস্কৃত সহজ শ্লোকগুলি বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ শাস্ত্রগ্রন্থগুলির শ্লোক অতি সরল; সামান্য অনুস্বার বিসর্গ বাদ দিলেই বাঙ্গালা ভাষার মত সহজবোধ্য হইয়া থাকে।

ন্যায়ালঙ্কার। ঠিক বলিয়াছ। ব্যাসদেবের লেখা অতি সহজ—কঠিনতা ভাগবত গ্রন্থেই দেখা যায়। আর আধুনিক মাঘ, ভারবি প্রভৃতিতেও জটিলতা বহুতর। বাস্তবিক বাঙ্গালাভাষাভাষীদের পক্ষে পুরাণ-মহাভারতের শ্লোক পাঠমাত্র পোনের আনা আন্দাজ বোধগম্য হইয়া থাকে। এ হেন ভাষাটিকে নাকি তোমাদের কেহ কেহ বিকৃতাকার প্রদান করিতে চান। একদিন পালি-প্রাকৃতের যুগে এইরূপ ঘটিয়াছিল—তখন লোকের জিহ্বার জড়তা এরূপ ছিল যে, 'ধর্ম্ম' উচ্চারণ করিতে পারিত না; বলিত 'ধম্ম'। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতে কেবল আর্য্যধর্ম্মের—আর্য্য দর্শনের প্রচার করিয়া যান নাই—আর্য্য সংস্কৃতভাষারও সুষ্ঠু প্রসার বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতেই দেশজ ভাষাগুলিতে সংস্কৃত বহুল পরিমাণে ঢুকিতে থাকে; তাই আজ বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে এইরূপ বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন যদি বিকৃতি সাধিত হয়—উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস হয়, তবে ভাষার সর্ব্বনাশ হইবে; পুনশ্চ, পালি-প্রাকৃতের ন্যায় অসংস্কৃত অপকৃষ্ট আকার ধারণ করিবে। যাউক, বৃদ্ধ বয়সের দোষই এই যে, এক কথা বলিতে গিয়া বাজে কথা আনিয়া ফেলে। এখন লক্ষ্মীচরিত্র তোমাকে বলিতেছি।

হরিচরণ। সংস্কৃত শ্লোকগুলি বলিবেন বটে, কিন্তু দয়া করিয়া কঠিন শব্দ বা বাক্যগুলির মধ্যে মধ্যে অর্থ বলিলে বড় ভাল হয়।

ন্যায়ালঙ্কার। আচ্ছা, তাহাই হইবে। * শুন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে স্বয়ং মহালক্ষ্মী তদারাধনাকারী ব্রাহ্মণদিগকে বলিতেছেন,—

* * * *

যেষাং গৃহং ন গচ্ছামি শৃণুধ্বং তায়তেষু চ।

* * * *

যং যং রুষ্টো গুরুর্দেবো মাতা তাতশ্চ বান্ধবাঃ।
অতিথিঃ পিতৃলোকশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরম্॥
মিথ্যাবাদী চ যঃ শশ্বন্ (১) নাস্তীতি বাচকঃ সদা।
সত্ত্বহীনশ্চ দুঃশীলো ন গেহং তস্য যাম্যহম্॥
সত্যহীনঃ স্থাপ্যহারী মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ।
বিশ্বাসঘ্নঃ কৃতঘ্নো যো ন যামি তস্য মন্দিরম্॥
চিন্তাগ্রস্তো ভয়গ্রস্তঃ শত্রুগ্রস্তোঽতিপাতকী।
ঋণগ্রস্তোঽতিকৃপণো ন গেহং যামি পাপিনাম্॥
দীক্ষাহীনশ্চ শোকার্ত্তো মন্দধীঃ স্ত্রীজিতঃ (২) সদা।
পুংশ্চলীপতিপুত্রো (৩) যো তদ্গেহং নৈব যাম্যহম্॥
যো দুর্ব্বাক্ কলহাবিষ্টঃ কলিঃ (৪) শশ্বদ্ যদালয়ে।
স্ত্রী প্রধানা গৃহে যস্য ন যামি তস্য মন্দিরম্॥
যত্র নাস্তি হরেঃ পূজা তদীয়গুণকীর্ত্তনম্।
নোৎসুকস্তৎপ্রশংসায়াং (৫) ন যামি তস্য মন্দিরম্॥

* পাদটীকায় ঐ সকল অর্থও দেওয়া হইল।

(১) শশ্বৎ—সর্ব্বদা।

(২) স্ত্রীর বশীভূত।

(৩) যাহার স্ত্রী এবং মাতা কুলটা।

(৪) কলিঃ—হিংসাদ্বেষাদি।

(৫) হরির স্তবে বিমুখ।

কন্যাত্মবেদবিক্রেতা (১) নরঘাতী চ হিংসকঃ।
নরকাগারসদৃশং ন যামি তস্য মন্দিরম্॥
মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুং সুতম্।
অনাথাং ভগিনীং কন্যাম্ অনন্যাশ্রয়বান্ধবান্ (২)॥
কার্পণ্যাদ্যো ন পুষ্ণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা (৩)।
তদ্গেহান্ নরকাগারান্ ন যামি তান্ মুনীশ্বরাঃ (৪)॥
দশনং বসনং যস্য সমলং রুক্ষমস্তকম্।
বিকৃতৌ গ্রাসহাসৌ (৫) চ ন যামি তস্য মন্দিরম্॥
মূত্রং পুরীষমুৎসৃজ্য যস্তৎ পশ্যতি মন্দধীঃ (৬)।
যঃ শেতে স্নিগ্ধপাদেন (৭) ন যামি তস্য মন্দিরম্॥
অধৌতপাদশায়ী (৮) যো নগ্নঃ শেতেঽতিনিদ্রিতঃ।
সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী ন যামি তস্য মন্দিরম্॥
মূর্দ্ধ্নি তৈলং পুরো দত্ত্বা যোঽন্যদঙ্গমুপস্পৃশেৎ।
দদাতি পশ্চাদ্গাত্রে (৯) বা ন যামি তস্য মন্দিরম্॥
দত্ত্বা তৈলং মূর্দ্ধ্নি গাত্রে বিণ্মূত্রং যঃ সমুৎসৃজেৎ (১০)।
প্রণমেদাহরেৎ পুষ্পং ন যামি তস্য মন্দিরম্॥

(১) কন্যার পণগ্রাহী, নিজকে বিক্রয়কারী (যেমন টাকা নিয়া বিবাহকারী), অর্থগ্রহণে বেদাধ্যাপনকারক। "আত্ম" স্থলে "অন্ন" পাঠও আছে। অর্থ স্পষ্ট।

(২) যে সকল আত্মীয়-কুটুম্বের আর আশ্রয় নাই।

(৩) কৃপণতা হেতু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগকে পোষণ না করিয়া যে সদাই কেবল টাকা জমাইতে থাকে।

(৪) লক্ষ্মী এই সকল কথা মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে বলিতেছেন।

(৫) অতি বড় গ্রাসে খায়, অত্যুচ্চ হাস্য করিয়া থাকে।

(৬) যে নির্বোধ বাহ্যে প্রস্রাব করিয়া তাহা দেখে।

(৭) আর্দ্র-পদে যে শয়ন করে।

(৮) শয়নের সময়ে যে পাদ প্রক্ষালন না করে (কিন্তু তাহা ভাল করিয়া মুছিতে হইবে)।

(৯) মাথায় তৈল দিয়া যে অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করে বা শরীরে তৈল দেয়।

(১০) বাহ্যে প্রস্রাব করে।

তৃণং ছিনত্তি নখরৈর্নখরৈর্বিলিখেন্মহীম্ (১)
গাত্রে পাদে মলং যস্য ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং সুরস্য চ।
যো হরেৎ জ্ঞানশীলশ্চ (২) ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥
যঃ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং কুরুতে মন্দধীঃ শঠঃ।
স পাপী পুণ্যহীনশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥
মন্ত্রবিদ্যোপজীবী (৩) চ গ্রামযাজী (৪) চিকিৎসকঃ।
সূপকৃদ্দেবলশ্চৈব (৫) ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥
বিবাহকর্ম্ম কার্য্যং (৬) বা যো নিহন্তি চ কোপতঃ।
দিবা মৈথুনকারী যো ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥
(বঙ্গবাসী সংস্করণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ ২৪৬ পৃষ্ঠা)

হরিচরণ। যাহাতে লক্ষ্মী বিরক্ত হন, আপনি সবিশেষ তাহাই বলিলেন। এখন কিসে সন্তুষ্ট হন, তাহাও কিঞ্চিৎ শুনিতে চাই।

ন্যায়ালঙ্কার। যাহাতে অসন্তুষ্ট হন, তাহা না করিলেই সন্তুষ্ট হন। তথাপি কেবল নিষেধাত্মক উপদেশ ছাড়া তুমি বিধিবাক্যেরও প্রার্থনা কর। আচ্ছা, তাহাও বলিতেছি। একদিন নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবি, কি উপায়ে তুমি লোকের প্রতি স্থিরানুগ্রহা হইয়া থাক?'' তখন দেবী বলিলেন,—(স্কন্দপুরাণের কথা)।

শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র চোজ্জ্বলা।
অকলহা বসতির্যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্ ॥

(১) নখ দিয়া যে মাটী আঁচড়ায়।

(২) ব্রাহ্মণের বা দেবতার বৃত্তি স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক, যে জানিয়া শুনিয়া হরণ করে। "জ্ঞানশীলঃ" স্থলে অপর পাঠ "দানহীনঃ"।

(৩) মারণ-উচ্চাটনাদি মন্ত্র দ্বারা যে জীবিকার্জ্জন করে।

(৪) গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের যে পৌরোহিত্য করে।

(৫) পাচক ও ঠাকুরপূজারি (ব্রাহ্মণ)।

(৬) ইহার অপর পাঠ "বিবাহং ধর্ম্মকার্য্যং বা"।

ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলং রজতোপমম্।
অন্নঞ্চৈবাতুষং (১) যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্॥
যঃ সংবিভাগী (২) প্রিয়বাক্যভাষী বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ।
অল্পপ্রলাপী ন চ দীর্ঘসূত্রী (৩) তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি॥
যো ধর্ম্মশীলো বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী।
অগর্ব্বিতো যশ্চ জনানুরাগী (৪) তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি॥
চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌ক্তে (৫) পুষ্পং প্রাপ্য ন জিঘ্রতি।
যো ন পশ্যেৎ স্ত্রিয়ং নগ্নাং নিয়তং স চ মে প্রিয়ঃ॥
ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ (৬) যত্র এতে মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ॥
সর্ব্বলক্ষণমধ্যে তু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে।
দেশে কালে চ পাত্রে (৭) চ স চ ত্যাগঃ প্রশস্যতে॥
নিত্যমামলকে (৮) লক্ষ্মীর্নিত্যং বসতি গোময়ে।
নিত্যং শঙ্খে চ পদ্মে চ নিত্যং শ্রীঃ শুক্লবাসসি॥
বসামি পদ্মোৎপলশঙ্খমধ্যে বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ।
নারায়ণে চৈব বসুন্ধরায়াং বসামি নিত্যোৎসবমন্দিরেষু (১০)॥
যথোপদিষ্টা গুণভক্তিযুক্তা (১১) পত্যুর্বচো নাক্রমতে চ নিত্যম্।
নিত্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে পতিভুক্তশেষং (১২) তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি॥

(১) ভাতে তুষ পাওয়া যায় না।
(২) যাহা উপার্জ্জন করে, বিভাগ করিয়া দেয়—অর্থাৎ স্বার্থপর নহে।
(৩) বিলম্বে কার্য্যকারী।
(৪) লোকের অনুরাগভাজন।
(৫) দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান (এবং আহ্নিক) করে; কিন্তু আহার সত্বর করে।
(৬) দান, সত্যভাষণ এবং (অন্তরে বাহিরে) শুচিত্ব।
(৭) ইহাই গীতায় সাত্বিক দান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
(৮) আমলকীফল; পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা ভূরিশঃ ইহার ব্যবহার করিত।
(৯) শুক্লবস্ত্রে, শাদা পরিষ্কার কাপড়ে।
(১০) যে সকল গৃহে সর্ব্বদা উৎসব হইয়া থাকে।
(১১) 'গুরুভক্তিযুক্তা' এই পাঠও দেখা যায়। যে স্ত্রী গুণযুক্তা ও ভক্তিযুক্তা এবং যথাবিহিত উপদেশ লাভ করিয়া স্বামীর বাক্য কদাপি লঙ্ঘন করে না।
(১২) যে স্ত্রী পতির পাতের প্রসাদ সর্ব্বদা ভক্ষণ করে।

তুষ্টা চ ধীরা প্রিয়বাদিনী চ সৌভাগ্যযুক্তা চ সুশোভনা চ।
লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা পতিব্রতা যা চ বসামি তাসু ॥
শ্যামা (১) মৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগা সুভ্রূঃ সুকেশী সুগতিঃ সুশীলা।
গভীরনাভিঃ সমদন্তপংক্তিস্তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥
যা পাপরক্তা পিশুনস্বভাবা স্বাধীনকান্তঃ পরিভূয়তে চ। (২)
অমর্ষকামা (৩) কুচরিত্রশীলা তামঙ্গনাং প্রেতমুখীং (৪) ত্যজামি ॥

পুষ্পং পর্য্যুষিতং পূতিং (৫) শয়নং বহুভিঃ সহ।
ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
চিতাঙ্গারকমস্থীনি (৬) বহ্নিং ভস্ম দ্বিজঞ্চ গাম্।
ন পাদেন স্পৃশেৎ পাদং কার্পাসাস্থি (৭) তুষং গুরুম্ ॥
নখকেশোদকঞ্চৈব মৈথুনং পর্ব্বসন্ধ্যয়োঃ। (৮)
বর্জ্জয়েন্নগ্নশায়িত্বমেকাকী মিষ্টভোজনম্ ॥
সম্মার্জ্জনীরজোবাতং নির্গুণ্ডীং লকুচং (৯) তথা।
রাত্রৌ বিল্বপলাশঞ্চ কপিত্থং (১০) বর্জ্জয়েদ্দধি।
স্বগাত্রাসনয়োর্বাদ্যমপূজা মূর্দ্ধপাদয়োঃ। (১১)
উচ্ছিষ্টস্পর্শনং মূর্দ্ধ্নি স্নানাভ্যঙ্গঞ্চ (১২) বর্জ্জয়েৎ ॥

(১) "তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা"—কৃষ্ণবর্ণা নহে।

(২) যে পাপে অনুরক্ত এবং খলপ্রকৃতি; যৎকর্তৃক আত্মানুগত স্বামী পরাভব প্রাপ্ত হয়।

(৩) ক্রোধাসক্তা।

(৪) তাদৃশী পিশাচ-শ্রেষ্ঠা নারীকে।

(৫) বাসি এবং দুর্গন্ধ ফুল।

(৬) শ্মশানের অঙ্গার ও অস্থি।

(৭) কার্পাসের আঁঠি (বীজ)।

(৮) পর্ব্বদিনে অর্থাৎ অমাবস্যা-পূর্ণিমাদিতে; এবং প্রাতঃ সায়ং প্রভৃতি কালে।

(৯) নির্গুণ্ডী—নিসিন্দা; লকুচ—ডেওয়া ফল (ডহু)।

(১০) বিল্বপত্র ও কৎ-বেল।

(১১) মস্তক এবং পদের অপরিষ্কৃততা।

(১২) অভ্যঙ্গ অর্থাৎ সর্ব্বগাত্রে তৈলমর্দ্দন। (স্নানের পূর্ব্বে তাহা করিতে হয়, পরে তাহা নিষিদ্ধ)।

শয়নঞ্চান্ধকারে চ রাত্রিবাসো দিনে তথা।
ম্লানাম্বরং কুবেশঞ্চ বর্জ্জয়েৎ শুষ্কভোজনম্ (১)॥
পরেণোদ্বর্ত্তিতং (২) বক্ষঃ স্বয়ং মাল্যাপকর্ষণম্।
আলস্যমবসাদঞ্চ ন কুর্য্যাল্লোষ্ট্রমর্দ্দনম্ (৩)॥
শুক্রবারে চ ষৈত্তৈলং শিলাপিষ্টঞ্চ দর্শকে (৪)।
স্বয়ং বামেন মূর্দ্ধানং পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ॥
তারকাঃ পুষ্পবন্তৌ (৫) চ ন পশ্যেদশুচিঃ পুমান্।
নেক্ষেদ্‌গুহ্যং পরস্ত্রীণাং নাস্তং যান্তং দিবাকরম্॥
কুর্য্যান্নান্যধনাকাঙ্ক্ষাং পরস্ত্রীণাং তথৈব চ।
পরেষাং প্রতিকূলঞ্চ উদিতার্কে প্রবোধনম্॥
নখকণ্টকরক্তৈশ্চ মৃত্তিকাঙ্গারবারিভিঃ।
বৃথা বিলেখনং (৬) ভূমৌ ন কুর্য্যান্মম কাঙ্ক্ষয়া॥
স্বয়ং দোহং (৭) স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনম্।
নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্॥
ন নিন্দাং গণকে বিপ্রে পাদয়োর্নর্ত্তনং (৮) তথা।
প্রতিকূলং চরেৎ স্ত্রীণাং ভুক্ত্বা চ দন্তধাবনম্॥
অঘৃতং মাংসসূপঞ্চ (৯) নগ্নাঞ্চৈব স্ত্রিয়ং তথা।
ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্॥

(১) অন্নাদি বাসী হইয়া শুকাইয়া গেলে তাহা খাইবে না।

(২) উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গন্ধাদি দ্বারা বিলেপন, অথবা ঘর্ষণ, তন্নিমিত্ত অপরের দ্বারা বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ নিষিদ্ধ।

(৩) মাটীর ঢেলা মাড়ান।

(৪) অর্থাৎ অমাবস্যা তিথিতে।

(৫) চন্দ্র ও সূর্য্য।

(৬) মাটীতে নিরর্থক আঁচড়ান।

(৭) দোহ "সাধ" অর্থে সম্ভবতঃ এ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। দুগ্ধ অর্থেও হইতে পারে; অপরে না দিলে নিজের গরজে উপভোগ করিবে না।

(৮) পা-নাচান।

(৯) সূপ অর্থাৎ ডাইল।

মন্ত্রৈরযুক্তঃ পরদারসেবী আচারহীনঃ পরসেবকশ্চ।
সঙ্কীর্ণচারী পরিবাদশীল-(১) স্তং নিষ্ঠুরং দস্তময়ং ত্যজামি ॥
শয়নঞ্চাদ্র্ৰপাদেন রাত্রিবাসো দিনে তথা।
নোত্তরীয়মধঃ কুর্য্যাৎ (২) শুষ্কপাদেন (৩) ভোজনম্ ॥
অশুচিং ম্লানবস্ত্রাঞ্চ দুর্গন্ধামসুখাবহাম্।
অভূষণামপুষ্পাঞ্চ ন কুর্য্যাদাত্মনস্তনুম্ ॥ (৪)
কর্ণে চ বদনে ঘ্রাণে তথা করতলেঽপি চ।
পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন কুর্য্যাদনুলেপনম্ ॥
গন্ধং পুষ্পং তথা তোয়ং রত্নঞ্চৈব মহোদধিম্।
গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং বর্জ্জয়েন্ন কদাচন ॥
অজরজঃ খররজস্তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ (৫)।
স্ত্রীণাং পাদরজো রাজন্ (৬) শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্।
এবং যঃ কুরুতে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশব।
তুষ্টা ভবামি তস্যাহং স্বযোষা নিশ্চলা যথা ॥

যদি আরও শুনিতে চাও, অন্যান্য পুরাণ হইতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারি।

হরিচরণ। যথেষ্ট হইয়াছে—পুরাণের কথা শুনিলাম। এখন ইতিহাস হইতে কিঞ্চিৎ উদাহৃত করুন।

ন্যায়ালঙ্কার। শ্রীমহাভারত আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রধান; তাহাতে এতদ্বিষয়ে বহু কথা আছে। সমস্ত বলা অসাধ্য; কেবল অনুশাসনপর্ব্ব * হইতে কিছু আবৃত্তি করিতেছি। সেখানেও স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রুক্মিণীকে বলিতেছেন—

(১) ভিড় ঠেলিয়া যে চলে এবং লোকের দোষ কীর্ত্তন করে।
(২) গায়ের চাদর ধুতির মত পরিধান করিবে না।
(৩) অর্থাৎ পা না ধুইয়া।
(৪) নিজের শরীরকে অলঙ্কারশূন্য, পুষ্পরহিত ইত্যাদি করিবে না।
(৫) ছাগলের ও গাধার এবং ঝাঁটার দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ধূলি।
(৬) রাজন্—হে প্রভো! (কেশবের সম্বোধন)।

* মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব একাদশ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোকাবধি (বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৮০১ পৃষ্ঠা)।

বসামি নিত্যং সুভগে (১) প্রগল্ভে (২) দক্ষে নরে কর্ম্মণি বর্ত্তমানে।
অক্রোধনে দেবপরে কৃতজ্ঞে জিতেন্দ্রিয়ে নিত্যমুদীর্ণসত্ত্বে (৩)॥
নাকর্ম্মশীলে পুরুষে বসামি ন নাস্তিকে সাঙ্করিকে (৪) কৃতঘ্নে।
ন ভিন্নবৃত্তে ন নৃশংসবর্ণে (৫) ন চাপি চৌরে ন গুরুষসূয়ে (৬)॥
যে চাল্পতেজোবলসত্ত্বমানাঃ ক্লিশ্যন্তি কুপ্যন্তি চ যত্র তত্র।
ন চৈব তিষ্ঠামি তথাবিধেষু নরেষু সংগুপ্তমনোরথেষু (৭)॥
যশ্চাত্মনি প্রার্থয়তে ন কিঞ্চিদ্‌যশ্চ স্বভাবোপহতান্তরাত্মা (৮)।
তেষল্পসন্তোষপরেষু নিত্যং নরেষু নাহং নিবসামি সম্যক্॥
স্বধর্ম্মশীলেষু চ ধর্ম্মবিৎসু বৃদ্ধোপসেবানিরতে চ দান্তে (৯)।
কৃতাত্মনি ক্ষান্তিপরে সমর্থে ক্ষান্তাসু দান্তাসু তথাবলাসু॥
সতীস্বভাবার্জ্জবসংযুতাসু (১০) বসামি দেবদ্বিজপূজিকাসু।
প্রকীর্ণভাণ্ডামনবেক্ষ্য কারিণীং (১১) সদা চ ভর্ত্তুঃ প্রতিকূলবাদিনীম্।
পরস্য বেশ্মাভিরতাম-(১২) লজ্জামেবংবিধাং স্ত্রীং পরিবর্জ্জয়ামি॥
পাপামচোক্ষামবলেহিনীঞ্চ (১৩) ব্যপেতধৈর্য্যাং কলহপ্রিয়াঞ্চ।
নিদ্রাভিভূতাং সততং শয়ানামেবংবিধাং তাং পরিবর্জ্জয়ামি॥
সত্যাসু নিত্যং প্রিয়দর্শনাসু সৌভাগ্যযুক্তাসু গুণান্বিতাসু।
বসামি নারীষু পতিব্রতাসু কল্যাণশীলাসু বিভূষিতাসু॥ (১৪)

(১) 'সুভগে'—রুক্মিণীর সম্বোধন।
(২) প্রগল্ভে অর্থাৎ বাগ্মিজনে।
(৩) যাহার প্রবল পরাক্রম আছে।
(৪) যে ব্যক্তি বর্ণসংকরকারক।
(৫) নিষ্ঠুরস্বভাবীতে।
(৬) গুরুজনের প্রতি অসূয়া (গুণে দোষারোপ)।
(৭) যাহারা এক বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিয়া লোকের নিকট অপর বিষয় প্রকাশ করে।
(৮) যাহার অন্তরাত্মা স্বাভাবিক মূঢ়তা দ্বারা উপহত।
(৯) মনঃস্থিরতাসম্পন্ন ব্যক্তিতে।
(১০) সতীধর্ম্মযুক্তা ও সরলতাবিশিষ্টা নারীসমূহে।
(১১) যাহার গৃহস্থালীর সামগ্রী ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে।
(১২) পরের ঘরে যাইবার জন্য উৎসুক।
(১৩) অচোক্ষা অর্থাৎ অপবিত্রা; অবলেহিনী অর্থাৎ যে সতত ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিয়া থাকে।
(১৪) যাহার চরিত্র ভাল এবং যে সর্ব্বদা অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত থাকে।

যানেষু কন্যাসু বিভূষণেষু যজ্ঞেষু মেঘেষু চ বৃষ্টিমৎসু।
বসামি ফুল্লাসু চ পদ্মিনীষু নক্ষত্রবীথীষু চ শারদীষু (১)॥
গজেষু গোষ্ঠেষু তথাসনেষু সরঃসু ফুল্লোৎপলপঙ্কজেষু।
নদীষু হংসস্বননাদিতাসু ক্রৌঞ্চাবঘুষ্টস্বরশোভিতাসু॥
বিকীর্ণকূলদ্রুমরাজিতাসু তপস্বিসিদ্ধদ্বিজসেবিতাসু।
বসামি নিত্যং সুবহূদকাসু সিংহৈর্গজৈশ্চাকুলিতোদকেষু।
মত্তে গজে গোবৃষভে নরেন্দ্রে সিংহাসনে সৎপুরুষে চ নিত্যম্॥
যস্মিন্ জনো হব্যভুজং জুহোতি (২) গোব্রাহ্মণং চার্চ্চতি দেবতাশ্চ।
কালে চ পুষ্পৈর্ব্বলয়ঃ ক্রিয়ন্তে (৩) তস্মিন্ গৃহে নিত্যমুপৈমি বাসম্॥
স্বাধ্যায়নিত্যেষু সদা দ্বিজেষু ক্ষত্রে য ধর্ম্মাভিরতে সদৈব।
বৈশ্যে চ কৃষ্যাভিরতে বসামি শূদ্রে শুশ্রূষণনিত্যযুক্তে॥ (৪)
নারায়ণে ত্বেকমনা বসামি সর্ব্বেণ ভাবেন শরীরভূতা।
তস্মিন্ হি ধর্ম্মঃ সুমহান্নিবিষ্টো ব্রহ্মণ্যতা চাত্র তথা প্রিয়ত্বম্॥
নাহং শরীরেণ বসামি দেবি নৈবং ময়া শক্যমিবাভিধাতুম (৫)
ভাবেন (৬) যস্মিন্নিবসামি পুংসি স বর্দ্ধতে ধর্ম্মযশোঽর্থকামৈঃ॥
এই গেল মহাভারতের কথা।

হরিচরণ। ঢের হইয়াছে, মহাশয়! আমি একটা বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি, আমাদের আর্য্য ঋষিগণ অতি সামান্য সামান্য সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র কথাও শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, এত খুঁটিনাটি ইংরেজী ভাষার গ্রন্থাবলীতে পাওয়া দুষ্কর।

ন্যায়ালঙ্কার। তুমি ত বাপু এই বল। কিন্তু সে দিন তোমাদের স্বগণ অনেক

(১) এই শ্লোকে এবং এতৎপরবর্ত্তী পাঁচটি পংক্তিতে লক্ষ্মী চেতনাচেতন উদ্ভিজ্জ যে যে স্থলে অবস্থান করেন, তাহাও প্রসঙ্গতঃ উক্ত হইয়াছে।

(২) যে গৃহে লোকে হোম করিয়া থাকে।

(৩) যথাকালে যেখানে পুষ্পাদি দ্বারা দেবপূজা হইয়া থাকে।

(৪) অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি স্বস্ব কর্ত্তব্য বেদপাঠ ইত্যাদি করিলে উঁহারা লক্ষ্মীবান্ হন।

(৫) নারায়ণে আমি (লক্ষ্মী) দেহধারিণী হইয়া সর্ব্বতোভাবে বাস করি; অন্যত্র যে সশরীরে বাস করি না, এ কথা বলিতে পারি না।

(৬) অর্থাৎ আদরের সহিত।

বাবুর একটি নিবন্ধে দেখিলাম যে, আর্য্য ঋষিগণ আমাদের জন্য এত আট-ঘাট বাঁধিয়া গিয়াছেন যে, আমরা সেই বন্ধনে নিপীড়িত হইয়া স্বাধীন চিন্তার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি, ইত্যাদি। ফলতঃ একই জিনিস "স্রজমেকে ভুজগং তথাপরে" দেখিয়া থাকে; বিধাতার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের এটাও এক রহস্য।

হরিচরণ। ভগবৎকৃপায় আজকাল ঐরূপ বাবুর দল অনেকটা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। সর্প যেমন বেদিয়ার ভেপুঁর সম্মোহন ধ্বনি শুনিয়া নিরাপত্তিতে পেঁটরার ভিতরে স্থান লাভ করে, ইংরেজী শিক্ষিতের দলও সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদির কতকগুলি মোহনমন্ত্র শুনিয়া মূঢ়ের ন্যায় পাশ্চাত্যভাব-গণ্ডীতে বিশ্রব্ধভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—কিন্তু অধুনা অনেকেই এই যে বীর্য্যশূন্যতার অবস্থা, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

ন্যায়ালঙ্কার। সন্তোষের কথা বটে; কিন্তু ভাঙ্গা যত সহজ, গড়া তেমন সোজা নয়। পাশ্চাত্যভাবস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ইঁহারা এতদূর চলিয়া গিয়াছেন যে, উজাইয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে পৌঁছা অসম্ভব। তবু "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি"; প্রবল প্রযত্ন দেখিলে যদি জগদম্বা দয়া করিয়া অভীপ্সিতসাধনে সহায় হন।

যাহা হউক, কথায় কথায় আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এই যে দেশ "লক্ষ্মীছাড়া" হইতে বসিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারিলে তো?

হরিচরণ। পারিলাম। কিন্তু লক্ষ্মীর উপদেশমতে কাজ করিয়া আমরা যে পুনশ্চ তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিব, সে ভরসা কই?

ন্যায়ালঙ্কার। ভরসা নারায়ণ—ধর্ম্ম স্বয়ং। লোকের ধর্ম্মে মতি হউক, নারায়ণের আবির্ভাব হউক, নারায়ণী শক্তি লক্ষ্মী অবশ্যই আসিবেন, আবার এই দেশের উপর লক্ষ্মীর সুদৃষ্টি পড়িবে।

হরিচরণ। আহা, ব্রহ্মবাক্য সফল হউক। এখন তবে আসি—প্রণাম।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

কবিকথা।

ভাস।

প্রতিজ্ঞা—যৌগন্ধরায়ণ।

(৪)

এইবার উদয়ন ও বাসবদত্তাকে উজ্জয়িনী হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। নলাগিরির সহিত অন্যান্য হস্তীদিগের বিবাদ আরম্ভ হইল; বৎসরাজ তজ্জন্য কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া ঘোষবতীর সাহায্যে নলাগিরিকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বাসবদত্তাকে লইয়া ভদ্রাবতী করিণীতে আরোহণ করিয়া উজ্জয়িনী হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার লোকজনের সহিত অবন্তিরাজের সৈন্যগণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল; যৌগন্ধ-রায়ণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অবশেষে ধৃত হইলেন।

রাজার পলায়নের পূর্ব্বে বাসবদত্তার একজন পরিচারক ভদ্রাবতীর চালককে আহ্বান করিতেছিল; বাসবদত্তা ভদ্রাবতীতে আরোহণ করিয়া উদক-ক্রীড়ায় যাইবেন বলিয়া সে তাহাকে ডাকিতে আসে। বালকটির নাম গাত্র-সেবক। গাত্রসেবক যৌগন্ধরায়ণের চার পুরুষ। শুণ্ডিকালয় হইতে সুরাপান করিয়া হাসিতে হাসিতে—টলিতে টলিতে জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণলোচনে সে আসিতেছিল। পরিচারক তাহাকে দেখিয়া ভয়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। গাত্রসেবক তখন মাংসখণ্ডাদি চাট চিবাইতে চিবাইতে সুরার প্রশংসা করিতেছিল; তাহার মতে যাহারা সুরায় মত্ত হয়, গাত্রে সুরা লেপন ও সুরায় স্নান করে এবং সুরাতে মরিয়াও যায়, তাহারাই ধন্য।

পরিচারক ভদ্রাবতীকে না আনিয়া, সে কেন মত্ত হইয়া উঠিতেছে বলিলে, গাত্রসেবক উত্তর দিল যে, সে একা মত্ত নহে, রাজকন্যাও মত্ত, পুরুষোত্তমও মত্ত ও সে পরিচারকও মত্ত; সকলেই মত্তের মত হইয়া উঠিয়াছে। পরিচারক তাহাকে বারংবার ভদ্রাবতীকে আনিতে বলিলে, সে বলিতে লাগিল, তাহার অঙ্কুশ, ক্ষুরপ্র ও ঘণ্টা প্রভৃতি ফেলিয়া আসিয়াছে। পরিচারক নিরীহ ভদ্রাবতীর

জন্য সে সকলের প্রয়োজন নাই বলিলে, সে অবশেষে বলিয়া উঠিল যে, ভদ্রাবতীকেই ফেলিয়া আসিয়াছে। পরে আবার বলিল যে, শুণ্ডিকালয় ভেদ করিয়া ভদ্রাবতী পলায়ন করিল।

সেই সময়ে লোকে বলিতে লাগিল যে, বৎসরাজ বাসবদত্তাকে লইয়া নির্গত হইয়া গেলেন শুনিয়া গাত্রসেবক বলিয়া উঠিল,—"স্বামীর অবিঘ্ন হউক।"

পরিচারক তাহাকে 'এখনও তুমি মত্ততা দেখাইতেছ' বলিলে, গাত্রসেবক উত্তর করিল,—'কে মত্ত? আর কাহারই বা মদ? আমরা সকলেই চার পুরুষ, আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ আমাদিগকে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন; আমি সুহৃদ্দিগকে জানাইয়া দিতেছি, এই যে তাঁহারা নিরোধমুক্ত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় চারিদিকে ধাবিত হইতেছেন।"

তাহার পর সে কৌশাম্বীর লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল,—"ওহে সুহৃদ্গণ, ভর্ত্তৃপিণ্ডে পুষ্ট হইয়া যে তাহার জন্য যুদ্ধ না করে, মৃত্যুর পর সলিলে পূর্ণ সুসংস্কৃত কুশে আচ্ছাদিত নূতন শরাব তাহার ভোগে যেন না ঘটে, এবং সে যেন নরকে গমন করে।"

সেই সময় যৌগন্ধরায়ণ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। তিনি তখন উন্মত্তবেশ সংহার করিয়াছেন; শাণিত উজ্জ্বল তরবারি তাঁহার দক্ষিণহস্তে ও স্বর্ণখচিত ঢাল বামহস্তে শোভা পাইতেছিল; নানা পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষে তিনি তখন ভূষিত হইয়াছেন; তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যুন্ময় ও চন্দ্রকলা-যুক্ত জলদের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

যৌগন্ধরায়ণ পরাক্রম সহকারে হস্তী, অশ্ব, আরোহী ও বীরগণকে বিনাশ করিয়া, অক্ষৌহিণী দলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিজয়সুন্দর হস্তীর দন্তে তাঁহার হস্ত আহত হওয়ায়, তাঁহার অসি ভগ্ন ও বিচ্যুত হইয়া পড়িল। তথাপি তিনি অরিসৈন্যদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু নিরস্ত্র হইয়া কতক্ষণ আর যুদ্ধ করিতে পারেন? অবশেষে ধৃত হইলেন; গাত্রসেবক তাহা দেখিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য চলিল। পরিচারকও মন্ত্রীকে সমস্ত সংবাদ জানাইবার জন্য তথা হইতে যাইতে লাগিল।

যৌগন্ধরায়ণকে লইয়া রক্ষিপুরুষেরা আসিতেছিল; তাহারা সকলকে সরিয়া যাইতে বলিল; কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিতেছিল না। তাহারা

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেও বাসবদত্তার অপনয়নে উদ্ভ্রান্ত লোকসকল তাহাতে মনোযোগ প্রদানই করে নাই। কেহ কেহ সরিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা যৌগন্ধরায়ণের ধৃত হওয়ার কথা বলিল। কিন্তু সে সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল যে, প্রাচীর ও তোরণ ব্যতীত সকল স্থানই যেন কৌশাম্বীর লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা সকলকে সাবধান করিতে লাগিল।

যৌগন্ধরায়ণের বাহুবন্ধন করিয়া কাষ্ঠফলকে তুলিয়া তাহারা আনিতেছিল। তাঁহাকে ফলক হইতে নামিতে বলিলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে আমি নামিতেছি। রিপুগত বৎসরাজকে অপসারিত করিয়া, স্বশস্ত্রদোষে বদ্ধ হইয়া, স্বামীর দুঃখ দূর করিবার জন্য জয়লাভ করিয়াই এক্ষণে রাজভবনে প্রবেশ করিতেছি। ভার্য্যাহীন লোকদিগের কান্তারপ্রবেশই সুখ, আর প্রাপ্তমনোরথদিগের বিনাশ তাহা অপেক্ষা রমণীয়; আবার সঞ্চিতধর্ম্মদিগের মৃত্যু পশ্চাত্তাপের কারণ হয় না। আমি শত্রুতা, ভয়, পরিভব যুগপৎ পরিত্যাগ, নীতি, বিনয় ও শরে কর্ত্তব্যসাধন এবং শত্রুর শ্রী ও সুহৃদের অযশ হরণ করিয়া বিজয়, বৎসরাজ ও মহাখ্যাতি লাভ করিলাম।"

রক্ষীরা লোকজনদিগকে সরাইতে আরম্ভ করিলে, যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"যাহারা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও সরাইবার প্রয়োজন নাই; বলবান্ রাজপুরুষেরা আমাকে দেখুক, আমি রাজার প্রতি অনুরাগের জন্যই বিপন্ন হইয়াছি; যে মনে মনে অমাত্য শব্দের প্রার্থনা করে, তাহাদের অভিলাষ হয় স্থির হয়, না হয় বিনষ্ট হইয়া যায়।"

রক্ষীরা কিন্তু তথাপি লোকজনকে সরাইতে লাগিল ও বলিয়া উঠিল,—"আর্য্য যৌগন্ধরায়ণকে তোমরা কি পূর্ব্বে দেখ নাই?"

তাহার উত্তরে যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"পূর্ব্বে দেখিতে পারে, কিন্তু এ ভাবে নহে। প্রচ্ছন্ন উন্মত্ত-বেশে যে রাজপথে ধাবিত হইত, তাহার এই নিন্দিত রূপ ও কষ্ট এক্ষণে দেখিতেছে।"

সেই সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া কহিল,—"আর্য্য, একটি প্রিয়-সংবাদ দিতেছি, বৎসরাজ ধৃত হইয়াছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা হইতেই পারে না; অনেকক্ষণ হইল,

যিনি অরি-নগরে কারামুক্ত হইয়া ভদ্রাবতীর সাহায্যে বনে পঁহুছিয়াছেন, নিমেষমাত্রে যিনি যোজন পথ গমন করেন, তিনি ধৃত হইলেন বলা অসম্ভব।"

তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপে রাজা ধৃত হইয়াছেন শুনিলে?"

সে উত্তর দিল,—"নলাগিরি তাঁহাদের অনুসরণ করায়।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"বাহন-সামর্থ্যে তাহা ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু নলাগিরি ত চালকশূন্য ছিল, চালক-যুক্ত হইলে সুশিক্ষায় হস্তীর বেগ বাড়িতে পারে; কিন্তু বৎসরাজ তাহাকে ত্যাগ করায়, কে তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইবে?"

পরিচারক তখন যৌগন্ধরায়ণকে বলিল,—"আর্য্য, পুরুষরক্ষিত এই আয়ুধাগারে প্রবেশ করুন।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা হাসির কথা বটে, বৎস-রাজরূপ আগুন বাঁধিয়া যে সময়ে চারিদিক্ রক্ষা করা উচিত ছিল, সে সময়ে অমাত্যেরা ঘুমাইয়াই কাটাইয়া দিলেন! রত্ন নীত হইলে তাহার পাত্রাধার নিরোধে ফল কি?"

তাহার পর পরিচারক তাঁহাকে অয়ুধাগারে লইয়া গেল। আর একজন পরিচারক আসিয়া বলিল,—"অমাত্য ইঁহার বন্ধন মোচন করিতে বলিতেছেন।"

তাহা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"অবশ্য আমাকে অক্ষীণ করিয়া দাও; বুঝিতেছি, ভরতরোহক আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আমিও তাঁহাকে দেখিতে চাহি; আমার অসাবধান কথা শুনিয়া রোষে বিদীর্ণ-হৃদয়, আরব্ধ নীতিকৌশলে বিচলিত, তুল্যাধিকার হইতে ত্যক্ত, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সুবাক্যহীন, আমার বুদ্ধিবশে অধিকপরিমাণে বঞ্চিত, অপকার্য্য-নিহত, লজ্জায় অধোমুখ সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

সেই সময়ে অবন্তিরাজের মন্ত্রী ভরতরোহক আসিলেন। তিনি যৌগন্ধরায়ণ কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"যে নিজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে ও বঞ্চনাপ্রভাবে দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছে, স্বামীর জন্য বিপন্ন তাহার সহিত কিরূপে কথা বলিব? সে এখন অবনত-কন্ধর, প্রযুক্তমন্ত্র ভুজঙ্গের ন্যায় ধর্ষিত ও উন্নত হইয়াই আছে।"

পরিচারক, যৌগন্ধরায়ণ অস্ত্রাগারে আছেন বলিলে, ভরতরোহক সেই দিকে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—"নীলহস্তীর ছলে যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রিত্বে বঞ্চিত হইয়াছে ; সেই বৈর-প্রত্যাখ্যানের জন্য সে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে।"

পরিচারক ভরতরোহক যৌগন্ধরায়ণ কোথায় দেখাইয়া দিলে, তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ; যৌগন্ধরায়ণও উত্তর দিলেন ; তাঁহার স্বরের গম্ভীরতা শুনিয়া পরিচারক বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, উত্তরের একটি মাত্র অক্ষরে যেন দেশ পূর্ণ হইয়া গেল। ভরতরোহক তখন উপবেশন করিয়া যৌগন্ধরায়ণকে বলিলেন,—"যৌগন্ধরায়ণ—এই অশরীর বাক্য শুনিয়াছি বটে, ভাগ্যক্রমে আজ আপনাকে দেখিলাম।"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমাকে ভাল করিয়াই দেখুন ; এক্ষণে আমি রুধিরপ্লাবিত অঙ্গে বীরনিয়মে স্থিত হইয়া গুরুশত্রু-বিনাশের পর শান্ত দ্রৌণীর ন্যায় অবস্থান করিতেছি।"

শুনিয়া ভরতরোহক কহিলেন,—"ইহা দেখিতেছি ; ছলক্রমে যে গজ-ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই জন্য আত্মপ্রশংসা।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি ? সেটা ছল ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অনুচিত হয় নাই। যে বঞ্চনা-মল্লিকা শালবৃক্ষে বর্ধিত হইয়া নাগাশ্রিত হইয়াছিল, যাহার জন্য আমাদের নরপতি বাহুপধানে ক্ষিতিশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তিনিগ্রহের পরিচয় জন্য যে বীণাশ্রিতা বঞ্চনার অবতারণা হয়, তাহা আপনাদেরই পূর্ব্বপ্রস্তুত। আমি তাহার অনুসরণ মাত্র করিয়াছি, কাজেই আমার কোন অপরাধ নাই।"

শুনিয়া ভরতরোহক একটু বিরক্তিসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অগ্নি সাক্ষী করিয়া মহাসেনের কন্যাকে শিষ্যা বলিয়া স্বীকারের পর অদত্তা তাহাকে হরণরূপ তস্করবৃত্তি যুক্তিযুক্তই বটে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"ওরূপ কথা বলিবেন না। ইহা নিশ্চয়ই স্বামীর বিবাহ। ভরতবংশে জাত, বৎসকুলের বলবান্ পতি দারনির্দ্দেশ না করিয়া কখনও উপদেশ দিতে পারেন না।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"এখনও পর্য্যন্ত মহাসেন বৎসরাজের সৎকার করিয়াছেন। তাহা বিবেচনা করা হইল না কেন ?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"ও কথা বলিবেন না, নলাগিরি শিক্ষিতদিগের কথা শুনায় রাজার আজ্ঞা মানিবে বলিয়া তাহারই জন্য বৎসরাজকে বিমুক্ত করা হইয়াছিল। তাহার পর তিনি নিজ শরীর এবং সুহৃদ্‌গণের যশ ও জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"যদি নলাগিরির জন্য তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন, তবে আবার বদ্ধ হইলেন না কেন?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"লোকনিন্দার ভয়ে।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"প্রত্যক্ষ রাজব্যবহারে আপনি অভ্যস্ত। ভাল, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধজিত শত্রুর পক্ষে ব্যবস্থা কি?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"বধ।"

ভরতরোহক বলিয়া উঠিলেন,—"বৎসরাজ বধযোগ্য হইলে, তবে আমরা তাঁহার সৎকার করিলাম কেন?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপনারা তাঁহার দেহ নাশ করেন নাই।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"স্বামী কি এই সকল সম্ভাবনা করিয়াছিলেন?"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তাহাতে সন্দেহ নাই, রাজাকে হস্তে প্রাপ্ত হইয়া, তিনি যে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ—নাগেন্দ্রে আরোহণ না করিলে কখনও বৈজয়ন্তী পাতিত করা যায় না।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই যেন হইল; কিন্তু মহাসেনের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া কৌশাম্বীর প্রতি আপনি কি বুদ্ধি চালিত করিয়াছিলেন?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"ইহা হাসিরই কথা। যে আপনাদের আগে আগে যায়, তাহার শেষ কার্য্যের আবার কথা কি? বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলে, শাখা ছেদন করিতে কি অধিক পরিশ্রম হয়?"

সেই সময়ে কাঞ্চুকীয় আসিয়া ভরতরোহকের কানে কানে কি বলিলে, তিনি তাহাকে তাহা প্রকাশ্যে বলিতে কহিলেন। তখন কাঞ্চুকীয় যৌগন্ধরায়ণকে বলিতে লাগিলেন,—"রাজা বলিতেছেন, নানা যুক্তি-যুক্ত কারণে বুঝিতেছি, তুমি আমার কোন অপকার কর নাই, গুণে আমার দ্বেষ নাই, সুতরাং ভৃঙ্গার প্রতিগ্রহণ কর।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"হা ধিক্! আমার প্রজ্বালিত গৃহ এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, মন্ত্রীদিগের হৃদয়ও সেইরূপ, আমার ন্যায় দণ্ডধারী কৃতাপরাধ ব্যক্তির এরূপ সৎকার বধতুল্য।"

সহসা অন্তঃপুর হইতে হাহাকার শব্দ উঠিল। তাহা শুনিয়া ভরতরোহক বলিতে লাগিলেন,—"শ্যেন পক্ষীর আক্রমণে ত্রস্ত কুররীকুলের ধ্বনির ন্যায় প্রাসাদাগ্র হইতে ও কিসের শব্দ আসিতেছে?"

তাহার পর তিনি কাঞ্চুকীয়কে তাহা জানিতে বলিলে, তিনি চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন ও বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বাসবদত্তার অপহরণে মহিষী অঙ্গাররতী প্রাসাদ হইতে পতিত হইবার ইচ্ছা করায়, রাজা মহাসেন তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলেন যে, ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তোমার কন্যার বিবাহ অভিপ্রেত, এই হর্ষকালে দুঃখিত হইতেছ কেন? এক্ষণে চিত্রফলকে অঙ্কিত বৎসরাজ ও বাসবদত্তার বিবাহানুষ্ঠান কর, সেইজন্য স্ত্রীলোকেরা সহসা হর্ষব্যাকুলা হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে মঙ্গলময়ী কৌতুকক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"মহাসেন এইরূপ সম্বন্ধের ইচ্ছা করিতেছেন? তবে ভৃঙ্গার দাও।"

কাঞ্চুকীয় তখন তাঁহাকে ভৃঙ্গার প্রদান করিলে, ভরতরোহক বলিলেন,—"এক্ষণে মহাসেন আপনার আর কি উপকার করিবেন বলুন।"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"যদি মহাসেন প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি আর ইচ্ছা করিব? তথাপি গো সকল রজঃশূন্য হউক, পরচক্র শান্ত হইয়া উঠুক, আর রাজসিংহ এই সমগ্র মেদিনী শাসন করিতে থাকুন।"

প্রভুভক্ত ব্যক্তি প্রভুর মঙ্গলের জন্য বিপদ্‌কেও আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। প্রভুর অন্নে পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহারই মঙ্গলকামনা একমাত্র কর্ত্তব্য। উৎসাহী ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। সুমন্ত্রী থাকিলে বিপন্ন রাজার বিপদ দূরে যায়। প্রতিজ্ঞা—যৌগন্ধরায়ণের প্রধানতঃ এই সকলই উদ্দেশ্য।

———

গ্রামের শোক।

মণ্ডল আজ মারা গেছে, গ্রামে
সভা করে নাই লোকে,
হাতেতে কেহই কাল ফিতা বাঁধি
হয়নি অধীর শোকে।
গড়িতে তাহার তৈল-চিত্র
চাঁদাও তোলেনি কেহ,
বাঁশের দোলাতে গঙ্গায় দেছে
তার নশ্বর দেহ।
গ্রামের কেবল পিছাইয়া গেছে
বিয়া পৈতার দিন,
থামিয়া গিয়াছে ভোজ উৎসব,
গ্রাম বান্ধবহীন।
খাঁ খাঁ করিছে যেন চারিধার
গিয়াছে মোড়ল মারা,
চড়ে নাই হাঁড়ি আজ কারো বাড়ী,
শত চোখে আঁখিধারা।
গ্রামে কেহ আজ ধরে নাই 'হাল'
হাটে লোক নাই আজি,
ঠাকুরের পূজা হয়নি এখনো
পারে যায় নাই মাঝি।
মোড়ল ছিল না ধনী জমিদার
কবি কি নাট্যকার,

দানের কাহিনী উঠেনি গেজেটে
শুন পরিচয় তার।
ক্ষুদ্র গ্রামের কর্ত্তা সে ছিল
বিঘা ষাট ছিল জমি,
বাড়ীতে তাহার বহু পরিবার
খরচ ছিল না কমি।
দীন-দুখীজনে ছিল তার দয়া
সবাকার সনে প্রীতি,
দুয়ার তাহার অতিথির তরে
মুক্ত রহিত নিতি।
প্রথম ফসল না বিলায়ে সবে
তুলিত না সে যে ঘরে,
দিনে রাতে গৃহে তামাক পুড়িত
ভাত দিত অকাতরে।
ছিল না তাহার মধুর আদরে
বচনের পরিপাটী,
চিনি দেওয়া জলো দুধ নহে সে যে
টাট্‌কা সে দুধ খাঁটী।
শাসন তাহার কঠোর কোমল
অকপট ভালবাসা,
'সাধু ভাষা' নয় ছিল গো তাহার
সাধুতায় ভরা ভাষা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চূড়ামণি ও বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রাবণের 'নারায়ণে' পণ্ডিত-রাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "বঙ্কিম বাবুর পিতৃ-প্রসঙ্গ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৭ই ভাদ্র তারিখের 'হিতবাদী'তে "নারায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র" নাম দিয়া তাহার এক সুদীর্ঘ প্রতিবাদ করেন। পণ্ডিতরাজের সমগ্র প্রবন্ধ বা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ প্রতিবাদের আমরা আলোচনা করিব না। যে স্থলে উভয়ে পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিয়াছেন, আমরা সেই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

পণ্ডিত-রাজ তাঁহার প্রবন্ধে বলিতেছেন,—"পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও সংসর্গ-দোষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ব-জীবন কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হইলেও পরে তাহা সংশোধিত হইয়াছিল। যিনি সুকৃতিবলে সেইরূপ পুণ্যশ্লোক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ চিরদিনের জন্য কখনই থাকিতে পারে না; ভগবান্ স্বয়ং পা দিয়া ঘষিয়া তাঁহার চিত্তের ময়লা উঠাইবেন। সৌভাগ্যবশতঃ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সময়ে আলবার্ট হলে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার শ্রোতা ছিলেন— বঙ্কিমচন্দ্র, বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ, আজন্ম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ। ইহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপকার হয়। পিতৃ-পিতামহের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া উঠে।"

ইহার প্রতিবাদে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন,—"ইহা কতদূর অসঙ্গত, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই বক্তৃতা-সভায় দিন দুই যাইয়া বঙ্কিম বাবু আর যাইলেন না। তাহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তিনি গত বৈশাখ মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় বঙ্কিম-স্মৃতি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'দুই তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার পর আর তাঁহাকে (বঙ্কিম বাবুকে) দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামত তাঁহার সঙ্গে দেখা

করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা বলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কয়দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম, ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে ; কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, ফেঁাটা ও শিক্ষা রাখায় যে ধর্ম্ম টঁ্যাকে, আর, ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম্ম লোপ পায়, সে ধর্ম্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যগ্র নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তিনি এখন বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়। কি হইলে এ দেশের সমাজ-ধর্ম্ম এখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই ; তাই যা খুসী তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।'

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া কি বুঝা যায় যে, চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বঙ্কিম বাবুর উপকার হইয়াছিল ও পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছিল ?

আসল কথা এই যে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিম বাবুর সাহায্য চান। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে, যেন তিনি "নবজীবনে" ও "প্রচারে" হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ-সভা বসে। তাহাতে অনেক সাহিত্যিক ও স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। Albert Hall বক্তৃতার স্থান স্থির হইল। প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল শ্রোতা ছিলেন, এমত নহে ; তিনি সভাপতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়াছিলেন। তার পর দুই এক দিন মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম এক্ষণে এই দেশের উপযোগী নহে।"

এক্ষণে আমরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথার আলোচনা করিতেছি। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চণ্ডী বাবুর যে কথা উদ্ধৃত করিয়া পণ্ডিত-রাজের উক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত করিতেছি। রবি বাবু তাঁহার ডাইরিতে লিখিয়াছেন,—"একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বঙ্কিম

বাবু বলিলেন, 'রবি বাবু, আপনি (বঙ্কিম বাবু বরাবর আমাকে আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন) শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিয়াছেন ?' আমি বলিলাম, 'না'। তিনি বলিলেন, 'শুনিবেন। তাহাতে জিনিস আছে। আপনি আমার বাড়ীতে আসিবেন, এই কালেই তাঁহার কথাবর্ত্তা শুনিবার সুবিধা আপনার হইতে পারিবে।' কিন্তু শীঘ্রই এইখানে দেখিতে পাইলাম যে, বঙ্কিম বাবুর Admiration বড় বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কৃষ্ণচরিত্র-রচয়িতার সহিত তর্কচূড়ামণির মিলন স্থায়ী হইতে পারে না।" (মানসী ১৩১৯, ৩২ পৃষ্ঠা) চণ্ডী বাবুকে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোক নাচিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না।" আবার তিনি রবি বাবুকে বলিলেন, "শুনিবেন, তাহাতে জিনিস আছে।' এক্ষণে আমরা কাহার কথা মানিব ? বঙ্কিম বাবু যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানিতেন, গৌরদাস বাবাজীর 'ভিক্ষার ঝুলী' ও 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বৈশাখ মাসের শাশ্বতীতে চণ্ডী বাবুর এই সকল উক্তির বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তবে যে চূড়ামণি মহাশয়ের মতের সহিত বঙ্কিম বাবুর মতের পার্থক্য ঘটিয়াছিল, তাহাও যথার্থ। কি কারণে তাহা ঘটিয়াছিল, আমরা পরে তাহা বিবৃত করিব। কিন্তু চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার প্রতি বঙ্কিম বাবুর যে শ্রদ্ধা ছিল না, এ কথা প্রকৃত নহে। ক্রমে আমরা তাহাও দেখাইব। তাহার পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, চূড়ামণি মহাশয়ের বঙ্কিম বাবুর নিকট তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সাহায্য চাওয়ার কারণ, বঙ্কিম বাবু তখন নবজীবনে ও প্রচারে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহা প্রকৃত নহে। চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার পর নবজীবন ও প্রচার প্রকাশিত হয়। আমরা নবজীবন ও প্রচার হইতে বঙ্কিম বাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পূর্ণ বাবুর ভ্রম দেখাইয়া দিতেছি।

বঙ্কিম বাবু 'নবজীবনের' 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে বলিতেছেন,—"কেহ বা বলেন, 'দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্ম্মত্বং' এবং কেহ বলেন, ধর্ম্ম অদৃষ্টবিশেষ। এই সকল কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা তুমি সম্প্রতি শুনিয়াছ, এজন্য আমি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না।"

ধর্ম্ম অদৃষ্ট-বিশেষ, ইহা চূড়ামণি মহাশয়ের উক্তি, এবং তাহারই সবিস্তার

ব্যাখ্যার কথা বঙ্কিম বাবু এ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতভেদ হইলে, তিনি প্রচারের প্রথম সংখ্যায় 'হিন্দু-ধর্ম্ম' প্রবন্ধের টিপ্পনীতে স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন,—"পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিঁকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাঁহার কোন কথায় প্রতিবাদ করিলাম না।" ইহা হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে, নবজীবন ও প্রচার প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতে চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা আরম্ভ হয়। নবজীবন ১২৯১ সালের শ্রাবণের প্রথমে ও প্রচার ১৫ই শ্রাবণ প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বে চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছিল।

আমরা বাল্যকাল হইতে চূড়ামণি মহাশয়ের সেবক ও সহচর থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার ও বঙ্কিম বাবুর সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাহার উল্লেখ করিয়া বঙ্কিম বাবু ও চূড়ামণি মহাশয়ের মতের ঐক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, বঙ্কিম বাবুর সহিত চূড়ামণি মহাশয়ের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যায় বঙ্কিম বাবুর যৎকিঞ্চিৎ উপকারও হইয়াছিল। সুতরাং পণ্ডিতরাজের উক্তি যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন।

১২৮৩ সালের শ্রাবণ মাস হইতে মুঙ্গের, ভাগলপুর, বহরমপুর, বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচারের পর ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বীরভূমে প্রচারকার্য্য করিয়া বর্দ্ধমানে আইসেন। সেখানে ৺ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করেন। এই সময় কলিকাতায় বাঙ্গালায় বিশেষ পরিচিত, বিশেষ মান্যগণ্য ১৯৷২০ জন লোকের একটি দল ছিল। এই দলের সকলেরই সকল বিষয়ে যে ঐকমত্য ছিল, তাহা নহে; ইঁহাদের কেহই আনুষ্ঠানিক হিন্দু বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তথাপি ইঁহারা ব্রাহ্ম-খৃষ্টীয়ানদিগের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন; আর কোন বিরুদ্ধধর্ম্মী হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুর সামাজিক ব্যবহারাদির নিন্দা করিলে, এই দলের সকলেই তাহার যথোচিত প্রতিবাদ করিতেন। দেশীয় কোন বিষয়েরই পরের মুখের নিন্দা ইঁহারা সহ্য করিতে

পারিতেন না। নিজেদের হিন্দু নামে পরিচয় দেওয়াই গৌরব বোধ করিতেন। এইজন্ত সদাচারবিষয়ে ইঁহাদের কলঙ্ক থাকিলেও সমাজ তাহা মার্জ্জনা করিত। পরন্তু তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু-সমাজের প্রতি এইরূপ অনির্ব্বন্ধ পক্ষপাত ধর্ম্মপরায়ণতামূলক নহে; উহা স্বদেশের অনুরাগমূলক। এই সকল বিষয়ে ইঁহাদের সকলেরই একতা থাকায় ইঁহাদের একটি দল বলিয়াই অনেক লোকের বিদিত ছিল। কিন্তু ইঁহাদের নিজ নিজ আচরণ সম্বন্ধে সকল বিষয়েই সকলের একভাব ছিল না। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভাও সকলের সকল বিষয়ে সমান ছিল না। তাহা ধরিলে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ মত বলা যাইতে পারিত। তদনুসারে বাহিরের লোকের মধ্যেও কতকগুলি করিয়া লোক ইঁহাদের এক এক জনের প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিল। তাহা লইয়া ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই অনুগামিগণের এক একটি দল ছিল। বাঙ্গালায় ইংরেজী লেখাপড়া জানার মধ্যে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মভাবাপন্ন আর খৃষ্টীয়ান ব্যতীত প্রায় সকলেই ঐ সকল দলের মধ্যে কোন কোন এক দলভুক্ত ছিল। এই ভাবে ঐ মূল দলই প্রায় সমস্ত বঙ্গের কতকগুলি বিষয়ের কিয়ৎপরিমাণ নেতারূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই হইল এই দলের অবস্থা। ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৺ চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺ যোগেন্দ্রনাথ বসু, ৺ শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি ১৮।১৯ জন কলিকাতাবাসী প্রতিভা-সম্পন্ন লোক এই দলের অন্তর্গত। আর বর্দ্ধমানের ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই দলের একতম পুরুষ। তর্কচূড়মাণি মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এই দলের মধ্যে যদি সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা উৎপন্ন করা যায়, তবে এই দলের অনুগত দলগুলির মধ্যে ঐ শ্রদ্ধা সংক্রান্ত হইলে, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য শীঘ্রই কিছু ফলপ্রদ হইতে পারিবে। কিন্তু ইঁহারা স্বদেশানুরাগিতা নিবন্ধন মৌখিক তাহার প্রতিবাদ না করিলেও ইঁহাদের আচরণ প্রতিকূল থাকিলে তাহাও যথোচিত অন্তরায় হইবে, ইহা বুঝিয়া ইঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করা আবশ্যক, ইহা স্থির করিয়া বীরভূম হইতে কলিকাতা যাইবার পথে পূর্ব্বে ৺ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশানুরাগ বশতঃ বাক্যে ইঁহারা সকলেই হিন্দু—শাস্ত্র ও ধর্ম্মের পক্ষপাতী এবং ব্রাহ্ম প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহাদের নিন্দা করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত বিদ্বেষী। চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের বন্ধনগুলি পূর্ব্ব হইতেই ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছিল। শাস্ত্র ও ধর্ম্মের মহিমা ইহার দ্বারা ঘোষিত হইতেছিল; এই দুই অংশে ইনি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। আবার চূড়ামণি মহাশয় হিন্দু-শাস্ত্রের প্রত্যেক সিদ্ধান্তেরই চন্দ্র-সূর্য্যের মত সত্যতা-প্রতিপাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন, এরূপ একটা নূতন তত্ত্ব শুনিয়া তাহা জানিবার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কুতূহলও ছিল। বলা বাহুল্য যে, ইঁহাদের দলে প্রায় সকলেই ধর্ম্মাচরণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সন্তোষজনকরূপ বুঝিতে পারিলে, দুরভিমান বা দুর্নির্ব্বন্ধ বশতঃ তাহার অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে, বিদ্বজ্জনোচিত এই উৎকৃষ্ট গুণটিতে বঞ্চিত ছিলেন না। কাজেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্যেও চূড়ামণি মহাশয়কে যত্ন করিয়াছিলেন। পরে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, জাতিভেদ, আচারতত্ত্ব, পুনর্জ্জন্ম, খাদ্যাখাদ্যের ব্যবস্থা এবং বিধবার যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যাদির কর্ত্তব্যতা ইত্যাদি হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি লইয়া ন্যায়মতে বাদ-বিচার হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে তাহার এক একটি স্বীকার করিতে থাকেন। এই ভাবে সকল কয়েকটি সিদ্ধান্তই তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন এবং চূড়ামণি মহাশয়কে বর্দ্ধমানে সেই সত্যপ্রচারের জন্য অনুরোধ ও তাহার সহায়তা করেন। তদনুসারে চূড়ামণি মহাশয়ও বর্দ্ধমানে সাধারণ সভায় আহ্বান করিয়া ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয়ের গুরুত্ব ও সত্যতা-প্রতিপাদনের জন্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতেও প্রায় সর্ব্বদার জন্যই বহুতর বিশিষ্ট লোকের উপস্থিতি ও সদালোচনার দ্বারা অনেক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করা হইত। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও চূড়ামণি মহাশয়ের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যার ভাষ্যটিপ্পনীভাবে যে যেরূপে বুঝিতে পারেন, তাঁহাকে সেই ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সদাচার ও সন্ধ্যোপাসনাদির অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে দৃঢ়তর বিশ্বাসী হইলেন।

অন্যান্য বহুসংখ্যক বিশিষ্ট লোকও পূর্ব্বানুষ্ঠিত অপচারে অনুতপ্ত হইয়া ধর্ম্মসেবার কর্ত্তব্যতায় আগ্রহবান্ হইলেন। তখন বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম-সমাজের অত্যন্ত পরিপুষ্টি ছিল। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল পাল তখন বর্দ্ধমান কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তিনি এবং আরও অনেকগুলি ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম্মেরই পক্ষপাতী হইতে বাধ্য হইলেন। কাজেই বর্দ্ধমানে তখন ব্রাহ্ম-সমাজের নিতান্ত দুষ্পরিণাম উপস্থিত হইল। ইহাই চূড়ামণি মহাশয়ের বর্দ্ধমানের প্রচারকার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ইহার পর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চূড়ামণি মহাশয়কে বলেন, "আপনি কলিকাতা গেলেও কার্য্য বিস্তার করিতে পারিবেন, তাহা আমি এখন ভরসা করিতে পারিতেছি। কলিকাতায় যাঁহারা এক এক দলের মধ্যে মান্যগণ্য এবং বাহির সমাজেও যাঁহাদের কথাবার্ত্তা ও আচরণের অনেকটা সম্মান ও আদর আছে, তাঁহারা সকলেই আমার বিদিত, বন্ধুতারূপেও ঘনিষ্ঠ। তখন আমি বুঝিতেছি যে, তাঁহারাও আপনার মত ও ব্যাখ্যার অনুকূল না হইয়া পারিবেন না। তাহা হইলে আপনার কার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই বিস্তৃত হইতে পারিবে। আমি এইখানে তাঁহাদের কয়েক জনকে আনাইয়া আপনার সহিত পরিচয় করাইয়া দি, পরে তাঁহারা আপনার পক্ষ হইলে, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় গিয়া অবশিষ্ট কয়েক জনের সহিত বিশেষমত পরিচয়ের ব্যবস্থা করিব। তৎপর যেরূপ হয় হইবে।" এই বলিয়া ৺ যোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি চারিজনকে টেলিগ্রাম করিয়া বর্দ্ধমানের বাড়ীতে আনয়ন করেন। তাঁহাদিগকে বাধ্য করিতে চূড়ামণি মহাশয়কে বেশী কিছু বলিতে হয় নাই, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাগুলি নানাপ্রকারে বুঝাইয়া দেন। সে সকল নূতন ভাব, নূতন কথা, নূতন মর্ম্ম শুনিয়া ইঁহারা চারিজনে বিশেষ উৎসাহবান্ এবং চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন আর এই সকল গুরুতর বিষয় কলিকাতায় গিয়া আন্দোলন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন তাঁহাদের সহিত একত্র হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চূড়ামণি মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় যান। কলিকাতায় গিয়া কলেজষ্ট্রীটে ৺ রামতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চূড়ামণি মহাশয়কে

বলিলেন,—"আপনার এখন যে কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় বা বাক্য-যুদ্ধ করিতে হইবে, তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত দুরহঙ্কারবান্। সেজন্ত ইনি নিজের ভ্রম বুঝিলেও অনেক বিষয়ে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। অতএব প্রথম তাঁহার নিকটেই যাওয়া যাক।" এই বলিয়া চূড়ামণি মহাশয়কে লইয়া ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী যান এবং তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা ও চিন্তা-শক্ত্যাদি বিষয় আর বর্দ্ধমানের ঘটনা সমস্ত তাঁহাকে বিদিত করেন। বর্দ্ধমানের বাড়ীতে যে ভাবে চূড়ামণি মহাশয়ের তর্কবিতর্কাদি হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গেও সেই ভাবে কয়েক দিন বাদ-বিচার হইবার কথা বলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই ভাবে সম্মত ও উৎসুক হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আলোচনার সময় নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ৺ চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির ঐ সময় তাঁহার বাসায় উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে তাহার পর দিবস হইতেই তাঁহার বাসায় পূর্ব্বকথিত মুখ্যদলভুক্ত প্রায় সকলেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও থাকিলেন, এবং তাঁহার বাড়ীতে যে সকল বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তাহা লইয়াই বাদবিচার আরম্ভ হইল। বিচারের প্রণালী এবং ফলও সেইমত হইতে লাগিল। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা না করিলে দোষ কি,—পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার সাকারতার প্রমাণ কি, উপাসনা কাহাকে বলে, এবং তাহার আবশ্যকতাই বা কি, ব্রত উপবাস ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা কি হয়, দেবতা কাহাকে বলে, এবং তাহার সত্যতার প্রমাণ কি, জাতিভেদের সত্যতার প্রমাণ কি, সত্য হইলেও সকল বর্ণের পরস্পর আহার-ব্যবহারে দোষ কি, আহারাদির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক কি, পুনর্জ্জন্মের প্রমাণ কি ইত্যাদি প্রধান প্রধান অনেকগুলি বিষয়ে বাদবিতর্ক হইয়াছিল, এবং তর্কবিতর্কের পর তাঁহারা এক একটি স্বীকার করিয়া লইলে, আবার আর একটি উত্থাপিত হইত। এইভাবে চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত সকল বিষয়গুলিরই যথার্থতা এবং সপ্রমাণতা ইঁহারা আপত্তিশূন্য হইয়া অনুমোদন করিলেন এবং চূড়ামণি মহাশয়কে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মানাদি করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ, উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহার নিকট যেরূপ ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন, তাহা এই প্রথমে ইঁহাদের কর্ণগোচর হইল। আর এই সকল বিষয়ে যে এত গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে,

তাহাও এই প্রথম বিদিত হইলেন। ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বঙ্গভাষায় লোক' নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—'ইংরাজীতে দেখিতাম,ইংরাজের মুখে শুনিতাম, Reilgion কেবল ঈশ্বর লইয়া, আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম—তবে ঈশ্বর ছাড়া এই যে এত বহু ব্যাপার রহিয়াছে, ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের কোন ধর্ম্মমূলক সম্বন্ধ নাই? বঙ্কিম বাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এই সকল আলোচনা করিতাম। সেই সময় পূজনীয় শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্রনাথকে বলিয়া বঙ্কিম বাবু চূড়ামণি মহাশয়কে একদিন আপন বাসায় আনাইলেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মকথা কহিলেন। তিনি যেমন বলিলেন, ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম, অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল, বিশ্বের যাহা কিছু আছে, বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে, বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম। কারণ, বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে। যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই, তাহা পাইলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বে যখন দেব-দেবীতে বিশ্বাস ছিল না, ইংরেজীভাবাপন্ন ছিলাম, তখন আমাদের সবই মন্দ মনে হইত। ঠিক মনে নাই, বোধ হয়, ১৮৭৭ সালে Bethune Society নামক সভায় High education in India নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের জাতিভেদ-প্রণালীর নিন্দা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার পর শাস্ত্রের কথা শুনিয়া এবং সামাজিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ প্রণালীর যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলাম, বুঝিয়া অক্ষয়চন্দ্রের "নবজীবনে" 'জাতীয় চরিত্র এবং বর্ণভেদ-প্রণালী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; উহা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, 'আমিও জাতিভেদটিকে অতি জঘন্য জিনিস মনে করিতাম, কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মত উল্টাইয়া গিয়াছে।'

এত হইল বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শিশিরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন জাতিভেদ ও তদনুরূপ আহার-ব্যবহার ও সদাচারাদির সত্যতা ও আবশ্যকতা থাকিলেও, ইদানীং যখন অধিকাংশ লোকই তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, আর এ সময়ে যখন নানাবিধ অন্তরায়, তখন এই দিকে তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া পুনর্ব্বার সদাচারাদির দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত করা নিতান্তই অসম্ভব মনে করিতেন। কাজেই যথার্থ বিষয় হইলেও ঐ অংশে

কতকটা উপেক্ষা না করিলে, এখন এরূপ ধর্ম্মপ্রচার দাঁড়াইতে পারে না, এই অংশে এই ভাবের আপত্তি করিয়াছিলেন, তথাপি চূড়ামণি মহাশয়ের প্রচার-কার্য্যে সকলেই একত্র হইয়া উৎসাহবান্ হইলেন এবং তাহার জন্ম যথাযোগ্য আয়োজন-উদ্যোগাদি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ব্যাখ্যার জন্ম আলবার্ট হল প্রভৃতির ব্যবস্থাও ইঁহারাই করিলেন, এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত আলবার্ট হল আর যে যে হলের ভাড়া লাগিত, কি প্রচারকার্য্যে যে যে ব্যয় হইত, তৎসমুদয় ইঁহারাই দিতেন। বর্ণিত মতে আয়োজন-উদ্যোগ করিতে করিতে বৈশাখ মাস অতীত হইয়া জ্যৈষ্ঠেরও কয়েক দিন গেল। তাহার পর আলবার্ট হলে প্রথম চূড়ামণি মহাশয়ের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয়। ক্রমে ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত সেইখানেই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হয়, ব্যাখ্যার প্রত্যেক দিনই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বর্ণিত দলপতিগণ সম্মুখের আসন গ্রহণ করিতেন। কিন্তু অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ ব্যাখ্যা আরম্ভ হইবার ২।৩ দিন পর হইতেই সংখ্যায় এত অতিরিক্ত হইল যে, আলবার্ট হলে সংকুলান হইতে লাগিল না। শেষে শত শত বিশিষ্ট লোক উপস্থিত হইয়াও স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। আলবার্ট হলের কর্ত্তৃপক্ষও আলবার্ট হল আর দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাহার পর বেঙ্গল থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যালয়ে এবং স্যার রাধাকান্ত দেবের নাট-মন্দিরে ব্যাখ্যা হইতে লাগিল; ক্রমে তাহাতেও স্থানাভাব হইল। বীডেন গার্ডেনের খোলা মাঠে চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। এই ভাবে জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। এই ভাদ্র-মাসেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে হাওড়ার টাউন হলেও ৩।৪ দিন চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যা হইয়াছিল। হাওড়ার তদনীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কিছু শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও হাওড়ায় প্রধান ডেপুটী কালেক্টার ছিলেন। সে সম্পর্কে তিনি প্রত্যেক দিনই ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে ব্যাখ্যাকালে উপস্থিত করিতেন। এই ভাবে ভাদ্রমাস শেষ হইয়া গেল। তাহার পর পূজার বন্ধে কিছুদিনের মত বিশ্রাম করা হয়। ইহাই তাঁহার কলিকাতায় ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম বিবরণ।

তাঁহার এই ব্যাখ্যাগুলি আকাশে লীন হইয়া না যায়, এজন্ত জ্যৈষ্ঠ মাসের ২।৪ দিন ব্যাখ্যার পরই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করার জন্ত চূড়ামণি

মহাশয় অনুরুদ্ধ হন। তদনুসারে 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' নামকরণে চূড়ামণি মহাশয় তাহা পুস্তকাকারে লিখিতে প্রবৃত্ত হন, এবং জ্যৈষ্ঠমাসমধ্যেই তাহার ৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ১ম খণ্ড, তাহার পর শ্রাবণ মাসের মধ্যেই ২য় খণ্ড সম্পূর্ণ হয়। ধর্ম্মতত্ত্বাদি সম্বন্ধে তিনি মুখেও যাহা বলিয়াছিলেন, পুস্তকেও তাহাই প্রকাশিত হয়। এইভাবে চূড়ামণি মহাশয়ের 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' নামক পুস্তক লেখা হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চূড়ামণি মহাশয় যে জাতিভেদ অনুসারে ভোজনাদি ব্যবহারের পার্থক্য থাকা এবং খাদ্যাখাদ্যাদি বিচার ও সদাচারের আবশ্যকতা বিষয় সপ্রমাণ করেন, তাহা যথার্থ হইলেও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না, এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শিশির-কুমার ঘোষ প্রভৃতি এই অংশে চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে একমত হন নাই। কিন্তু চূড়ামণি মহাশয় কার্য্যক্ষেত্রে নির্ব্বন্ধের সহিত এই সকল বিষয়ের সমর্থন ও কর্ত্তব্যতার উপদেশ করেন। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধের কোন বিষয়েই কোন অংশের নিয়োগ-বিয়োগ বা পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। কিন্তু ইঁহারা খাদ্যাখাদ্য-বিচার, সদাচারাদি সম্বন্ধে সমাজের অপারগতা বিধায় কতকগুলি ব্যবহার অনাদর করিতে ইচ্ছা করেন। কাজেই চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাতে ধর্ম্মের অন্যান্য গুরুতর সিদ্ধান্তগুলি স্থির রাখিয়া উল্লিখিত অংশে তাঁহার মতের বিরুদ্ধ অথচ এখনকার সমাজের সন্তোষজনক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহা শ্রাবণ মাস হইতে প্রচারে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মাসেই প্রচার প্রথম প্রকাশিত হয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই প্রচারেই উল্লিখিত কারণে এই কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন,—"পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিঁকিবে না এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রতিবাদ করিলাম না' এই কথা বলিলেন ; কিন্তু কার্য্যে চূড়ামণি মহাশয়ের নাম করিয়া তাঁহার বাক্যগুলি উল্লেখ না করিলেও, ঐ 'প্রচারে' জাতিভেদ অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থার এবং খাদ্যাখাদ্যাদি বিচার বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়ের মতেরই প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মের লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য যে সকল গুরুতর তত্ত্ব চূড়ামণি মহাশয়

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন লেখাপড়া 'প্রচারে' বা 'নবজীবনে' দেখা যায় না। প্রত্যুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্মলক্ষণাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা চূড়ামণি মহাশয়ের কথারই অনুবাদ মাত্র; 'নবজীবনে' লেখাও সেইমতই।

তর্ক চূড়ামণি মহাশয় বলেন, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে কঠোর শাসন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমস্তই লোককে বিদিত করা আবশ্যক এবং সে শাসন যাহাতে আদৃত ও রক্ষিত হয়, তজ্জন্যও যথাবৎ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেই সমস্ত শাসনের মূল, সত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান সমাজ শাসনানুরূপ আচরণ করিতে পারিবে কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া শাসন প্রচার করা সঙ্গত নয়। তবে লোকের শক্তির হ্রাস বশতঃ সমাজ যেটুকু পালন করিতে অসমর্থ,সেটুকু পরাশরসংহিতাদি শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাও শাসনের মধ্যেই গণ্য এবং তদনুসারেই সমাজকে উপদেশ করিতে হইবে। কিন্তু মানুষের স্বেচ্ছাচার কখনই অনুমোদন করা যায় না। স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করা মানুষের শক্তির অতীতও নহে। আজকাল লোকে নানাপ্রকার নিষিদ্ধ ভোজনপানাদি করিয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করা লোকের শক্তির অতীত নহে; ইচ্ছা করিলে অক্লেশে তাহা না করিয়া পারে। পলাণ্ডু, লসুন, কুক্কুট, শূকর, গোমাংস ও যবনান্নাদি ভোজন বা সোডাওয়াটার, লেমনেড, বরফ প্রভৃতি পান বা মদ্যপান বর্জ্জন করা কাহারও শক্তির অতীত নহে। তাহা ইচ্ছা করিলেই পারে। আর ঐ সকল দ্রব্যের পানভোজনাদি করিলে যে মানুষ প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে অপরাগ হয়, ইহাও সত্য। অতএব আজকাল অধিক লোকই এইরূপ কদাচার করে বলিয়াই তাহা বর্জ্জন করা তাহাদের শক্তির অতীত, ইহা স্বীকার করিয়া, তাহা করিতে অনুমোদন করা সঙ্গত নহে। রোগী রোগবশে কত দ্রব্যই পান-ভোজন করিতে চায়, লোভবশে কুপথ্য সেবাও করিয়া থাকে, আবার সুপথ্য সেবা যে তাহার শক্তির অতীত, এরূপ আবদারও করে; তাই বলিয়া চিকিৎসক তাহা অনুমোদন করিতে পারেন না। দ্রব্যশক্তি চিকিৎসকের অধীন নহে, রোগীর ইচ্ছারও আয়ত্ত নহে। সে উপযুক্ত পথ্য, পাচন সেবন না করিলে, কোন মতেই রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। কুপথ্য

সেবায় প্রতিফলপ্রাপ্তিও অবশ্যম্ভাবী। তবে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক কেমন করিয়া তাঁহার রুচির অনুকূল উপদেশ করিবেন? কাজেই রোগের অবস্থাদি বিচারপূর্ব্বক তাঁহাকে পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধর্ম্মোপদেশ বিষয়েও সেইরূপই ব্যবস্থা। নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছাচারের পোষণ করিলে, তাহার শাস্ত্রত্ব বা শাসনত্ব থাকে না। শাসন বলিলেই বুঝিতে হয়, তাহা লোকের স্বেচ্ছাচারের বিরোধী। শাস্ত্র আর শাসন একার্থেরই দুটি কথা। অতএব স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করিয়াই শাস্ত্রার্থের প্রকাশ করা উচিত। তবে অবশ্যই পূর্ব্বকালেও পৃথিবীর সকল লোকই সকল বিষয়ে ধর্ম্মের শাসনানুসারে চলিতে পারিত না, চিত্তের দৌর্ব্বল্যবশতঃ এখন বরং তদপেক্ষা অধিক লোকই শাসনগণ্ডীর বহির্ভূত থাকিবে। কিন্তু তাহার প্রতিফল পূর্ব্বেও যেমন পাইত, এখনও তেমন পাইবে। শাসনগুলি পূর্ব্বেও যথাবৎ প্রচারিত হইত, এখনও তাহাই হইবে। দস্যু-চৌরাদিগণ প্রসহ্য বিত্তাহরণ ও স্তেয়াদি না করিয়া পারে না; কামপশুগণ বেশ্যাবৃত্তি বা বলাৎকার না করিয়া থাকে না; বিষয়লোলুপ পিশাচগণও কৃত্রিম লেখ্য বা মিথ্যা সাক্ষ্যাদি-সংগ্রহে বিরত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া রাজশাসন তাহাদের সেই কদাচারের অনুমোদন করিতে পারে না। উপদংশ বা যক্ষ্মাদি রোগ তাহাদিগকে করুণা করে না। সেইরূপ শাস্ত্রের আদেশ যথাবৎই প্রচার করিতে হইবে; তাহার আদরের জন্যও যথোচিত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তৎপর অনুষ্ঠানের সময় যাহার যেমন ভাগ্য, যাহার যেমন শক্তি, সেইরূপ ফলিবে। ইহাই চূড়ামণি মহাশয়ের মত। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতেও ঐ ভাবের কথা লিখিয়াছেন। শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পূর্ব্ব-বর্ণিত সেই দলের অন্তর্গত কয়েক জনে এই মতেরই সমর্থন করেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু ও শিশির বাবু প্রভৃতি কয়েক জন এই বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত একমত হন না। তাঁহারা বলেন, এরূপ কঠোর শাসন এখন টিকিবে না। এখন লোকের প্রবৃত্তির অনুমোদন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলেই তাহা ফলপ্রদ হইবে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'প্রচারে' ঐ কথাটুকু লিখিয়া গিয়াছেন এবং রূপান্তরে লোকের স্বেচ্ছাচারের অনুমোদন করিয়াছেন।

চূড়ামণি মহাশয় হইতে পৃথক্‌ভাবে তাঁহার 'প্রচার' পত্র এবং 'ধর্ম্ম-তত্ত্ব' প্রচারের ত ইহাই কারণ। তিনি প্রথম খণ্ড প্রচারে "হিন্দুধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে যাঁহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলেন, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত বিশেষরূপে দুটি চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তাহার দ্বিতীয় চিত্রে নিষিদ্ধ আচার ও আহারাদি-পরায়ণ এবং সুরাপানাদি বিষয়ে অকুণ্ঠিত লোকটিকে তিনি ধার্ম্মিকের আসনে স্থান দিয়াছেন। এ স্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তিনি, চূড়ামণি মহাশয়ই ঐ সকল স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে ভীষণ শাসন প্রচার করিতেছিলেন, তাহারই প্রতিবাদ করিতেছেন। অতএব তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের কোন অংশে প্রতিবাদ করেন নাই, তাহা নহে, প্রতিবাদই করিয়াছেন এবং সদাচারের তীক্ষ্ণ শাসন প্রতিবাদের নিমিত্তই তাঁহার 'প্রচার' ও 'ধর্ম্মতত্ত্বের' অবতারণা। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্র ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের লক্ষণাদি বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন,তৎসমস্তই চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যার অনুব্যাখ্যান মাত্র, ইহাও 'নবজীবন' প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ আর পরবর্ত্তী 'প্রচার' ও 'ধর্ম্ম-তত্ত্বাদি' গ্রন্থ পাঠ করিলে অবশ্যই বুঝা যায়।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় মৌখিক ব্যাখ্যা এবং লিপিদ্বারা প্রথমে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে এই নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করেন যে, 'আমাদিগের শাস্ত্র এবং ব্যবহার মতে, আমাদের ধর্ম্ম, মানব-জীবের প্রাণসর্ব্বস্ব বস্তু। উহা মানব-জীবের অস্তিত্বের মজ্জাস্বরূপ, ধর্ম্ম থাকিলেই মানব-জীবের প্রকৃতি, জীবত্ব এবং অস্তিত্ব পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে; উহা না থাকিলে কোনরূপেই মানবজীব আত্মলাভ করিতে পারে না। তাহার জীবত্ব ক্ষীণ হইয়া ক্রমে বিলুপ্ত হয়; অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। মানবজীব পশু-পতঙ্গাদির আত্মার ন্যায় একরূপ জড়-দ্রব্যে পরিণত হয়; উহা অচেতনপ্রায় হইয়া পড়ে। আবার অধর্ম্ম ঠিক ইহার বিপরীত বস্তু। উহা মানবের প্রাণনাশক, অস্তিত্বনাশক, এক কথায় বলিলে সর্ব্বনাশক বস্তু। উহার বৃদ্ধি হইলেই মানব-জীব আত্মলাভে সমর্থ হয় না। জীবত্ব ক্ষীণ হইয়া ক্রমে বিলুপ্ত হইতে পারে, জীবের অস্তিত্ব নষ্ট হইতে পারে, পশু-পক্ষ্যাদির আত্মার ন্যায় জীব একরূপ জড়দ্রব্যেও পরিণত হইতে পারে; অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম কাল্পনিক বস্তু নহে, উহা সত্য বস্তু।"

ধর্ম্মাধর্ম্ম শব্দের সাধারণ যোগার্থ হইতে এই অর্থই বুঝিতে পারা যায়।

ধৃ ধাতুর পরে 'মন্' প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম কথাটি সাধিত হয়, এবং তাহার পূর্ব্বে এক 'ন' বা 'অ' এর যোগ করিলেই অধর্ম্ম কথা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এখন দেখ, ইহা হইতে কি অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। ধৃ ধাতুর অর্থ অবস্থিতি, আর করণকারকবাচ্য মন্ প্রত্যয়ের অর্থ যাহার দ্বারা, তবেই উভয়ের যোগে এই অর্থ সম্পন্ন হইল যে, যাহার দ্বারা বস্তুর অবস্থিতি, যাহা না থাকিলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃত বা স্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, জলের ধর্ম্ম শৈত্য ইত্যাদি। তবেই মনুষ্যধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহাই জানা গেল যে, যাহার দ্বারা মনুষ্য-জাতির অবস্থিতি, যাহা আছে বলিয়া মনুষ্য মনুষ্য নামে অভিহিত হয়, যাহা না থাকিলে মনুষ্যভাব থাকিতে পারে না, যাহার ক্রমিক ক্ষয়ে মনুষ্যত্বের ক্রমিক ক্ষয় এবং ক্রমিক বৃদ্ধিতে ক্রমিক বৃদ্ধি, তাহাই মনুষ্যের 'ধর্ম্ম' আর যাহা মনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম্ম নহে,যাহা প্রেত পিশাচ-পশ্বাদি সর্ব্বপ্রাণিসাধারণের ধর্ম্ম, তাহাই 'অধর্ম্ম'। যাহা মনুষ্যধর্ম্ম, তাহাই বৈদিক ধর্ম্ম বা আর্য্য ধর্ম্ম; সুতরাং আমাদের ধর্ম্মও তাহাই। আর যাহাকে মনুষ্যের অধর্ম্ম বলা হইয়াছে, তাহাই শ্রৌত অধর্ম্ম এবং আর্য্যদিগের মতের অধর্ম্ম। সুতরাং আমাদেরও তাহাই অধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত আর্য্যদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য কোন অর্থ আমার বিদিত নাই। এই অর্থের ধর্ম্মই আমাদিগকে প্রেতপিশাচ-পশ্বাদি হইতে বিভিন্ন করার হেতু; এই অর্থের ধর্ম্মই আমাদের ঐহিক পারত্রিক যাবৎ কুশলের মূল; এই ধর্ম্মই আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যায়; এই ধর্ম্মই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পরমেশ্বরের সহিত আমাদিগকে মিশাইয়া ফেলিতে পারে এবং বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা হইলে,এই ধর্ম্মই আমাদিগকে নির্ব্বাণ-মুক্তি দান করিতে পারে। শাস্ত্রে যে যে স্থলে দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ যে,ধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, কৈলাস এবং মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, ইহকালে বা পুনর্জ্জন্মেও ইচ্ছানুরূপ বা নিয়মানুরূপ সুখ ভোগ করে, তাহা আমাদের এই অর্থেরই ধর্ম্ম; অতিরিক্ত আর কিছু নহে। আবার এই অর্থের অধর্ম্মই আমাদিগকে প্রেত-পিশাচাদি করিয়া গেলে, এই অধর্ম্মই চতুরশীতি কুণ্ডনরকে লইয়া যায়; এই অধর্ম্মই ইহকালে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়, পরজন্মেও শৃগাল, কুক্কুর এবং অন্ত্যজাদি যোনিতে নিক্ষিপ্ত করে। ইহাই আমাদের ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের সাধারণ অর্থ এবং সাধারণ পরিচয়। (ধর্ম্মব্যাখ্যা নূতন সংস্করণ)।

ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রথম সংস্করণে এইরূপ লিখিত আছে,—"ভারতীয় ধর্ম্ম এইরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়াই খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। আমাদের ধর্ম্ম, শাস্ত্রে কেবল ধর্ম্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্ম শব্দের সাধারণতঃ যে বৈয়াকরণ অর্থ বুঝি, আর্য্য-ধর্ম্মস্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে। "ধৃঙ্" অবস্থানে, এই ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মপদ সাধিত। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতিস্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মও সেইরূপ। যে গুণবিশেষে সূক্ষ্ম বীজভাবে থাকাতে আমরা মনুষ্য, যে সূক্ষ্ম গুণবিশেষের বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি, যে সূক্ষ্মগুণবিশিষ্ট না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই সূক্ষ্মগুণবিশেষ আমাদের ধর্ম্ম। সেই সূক্ষ্মগুণ-সম্ভূত গুণবিশেষ একই পদার্থ, কার্য্যকারণভেদে নানা প্রকারে পরিণত হয়। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই এক শক্তি হইতেই বিবিধ প্রকারে ধর্ম্ম বিকাশিত হইয়া আত্মাতে সঞ্চিত হয়। যজ্ঞ দ্বারা একরূপ ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, শ্রাদ্ধ দ্বারা একরূপ, ব্রত দ্বারা একরূপ, অতিথিসেবার দ্বারা একরূপ এবং উপাসনা দ্বারা একরূপ ধর্ম্ম বিকাশিত হইয়া সঞ্চিত হয়। বাস্তবিক সমস্ত ধর্ম্মেরই মূল বীজ—মূল প্রকৃতি একটিমাত্র শক্তিবিশেষ। অতএব উপাসনাদি-সাধ্য সমস্ত ধর্ম্মের মূল বীজ বলিয়া তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

প্রথম দেখা যাউক, সেই বীজভূত ধর্ম্মটি কি? আত্মার যে শক্তিবিশেষের দ্বারা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির চঞ্চলতা এবং বাহ্য বিষয়াভিমুখে গতি বা বাহ্য বিষয়ে পরিচালনা নিরুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাত-প্রদীপের ন্যায় উহাদের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্ম্মের বীজভূত ধর্ম্ম। এই শক্তিটির নাম 'নিরোধ-শক্তি।' জলসেচনাদি কারণ দ্বারা যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয় সেইরূপ যজ্ঞ-ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা এই নিরোধ-শক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম্ম বিকাশিত হয়; তাহাদের নাম কার্য্যধর্ম্ম।

নিরোধ-শক্তি হইতে সমুৎপন্ন ধর্ম্ম সমুহের মধ্যে এমত অসংখ্য প্রকার ধর্ম্ম আছে, যাহার বিশেষ বিশেষ নাম নাই। শাস্ত্রে কেবল সেইগুলিকে 'অপূর্ব্ব' মাত্রই বলিয়াছেন; সুতরাং তাহার এক একটি লইয়া কার্য্যপ্রণালী দেখান নিতান্ত সুকঠিন। এ নিমিত্ত যে ধর্ম্মগুলির বিশেষ বিশেষ নাম আছে, তাহাই

লইয়া আমরা বিশেষ আলোচনা করিব। ফলতঃ ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও দর্শিত হইবে। সেই ধর্ম্মগুলি এই,—

১ম, ধৃতি (ধারণা করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি)। ২ ক্ষমা, কেহ অপকার করিলে যে তাহার প্রত্যপকারে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তির দ্বারা নিরোধ করা যায়। ৩ দম, (শোকতাপাদি দ্বারা কোন প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে যে শক্তির দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়)। ৪ অস্তেয়, (অবিধি পূর্ব্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তির দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়)। ৫ শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নির্ম্মলভাব)। ৬ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়)। ৭ ধী, (শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্বনিশ্চয়-শক্তি ধীশক্তি। ৮ বিদ্যা, (যে শক্তির দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়; শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথক্‌রূপে জানা যায়, যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অভিমান প্রভৃতি অন্তরস্থ পদার্থ সকল আম্র ও কাঁঠালের রসাস্বাদের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জাজ্বল্যমান মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে)। ৯ সত্য, (কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা)। ১০ অক্রোধ, যে শক্তির দ্বারা ক্রোধকে নিরুদ্ধ করা যায়)। এই দশটি এবং বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ।

এতৎসমস্তের মধ্যে আত্মবোধের ক্ষমতাটিই সর্ব্বোচ্চ পরম ধর্ম্ম। কারণ, এই ধর্ম্মটির স্ফুরণ হইলেই মনুষ্যের উন্নতির চরমাবস্থা হয়; মনুষ্য কৃতকার্য্য হয়। এজন্য এইটিই মনুষ্যের সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ। উক্ত দশটি ধর্ম্ম হইতে ক্রমে বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত অনেক স্থানে এই দশটিরই গণনা দেখা যায়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, (৬ষ্ঠ অং ৯১-৯২-৯৩-৯৪ শ্লোক।)—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥
দশলক্ষণানি ধর্ম্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্য চানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাং গতিম্॥

দশলক্ষণকং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।

বেদান্তং বিধিবৎ শ্রুত্বা সংন্যসেদনৃণো দ্বিজঃ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনবাসী, ভিক্ষুক এই চারি আশ্রমী দ্বিজাতিরাই একান্ত যত্ন সহকারে দশবিধ ধর্ম্মের সতত সেবা করিবেন। যথা—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থভাব, অক্রোধ এই দশটিই ধর্ম্মের স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের এই দশটি স্বরূপ অবগত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হন, আত্মাকে লাভ করেন। এই দশস্বরূপ ধর্ম্মকে অতি সমাহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বিজগণ সন্ন্যাসী হইবেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে নিরোধ-শক্তিকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে. সেটি কেবল কারণ ধর্ম্ম মাত্র। আর এই যে দশবিধ ধর্ম্ম, ভক্তি বিরাগ সন্তোষাদি ধর্ম্ম এবং কেবল 'অপূর্ব্ব' নামক ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইল। ইহার কার্য্য ধর্ম্ম। এই কারণ ধর্ম্ম ও কার্য্যধর্ম্মের বীজ কেবল মনুষ্যেতেই থাকে আর কোন প্রাণীতে ইহার কিছুই নাই। এই গুণগুলি আছে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্ত প্রাণী অপেক্ষা পৃথক্; এই গুণ-সমষ্টি দ্বারাই মনুষ্য-শরীর মনুষ্যাকারে পরিণত; এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্ত প্রাণী অপেক্ষা পৃথক্; এই গুণগুলি না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না; এই গুণগুলির হ্রাস হইলেই মনুষ্যত্বের হ্রাস এবং ইহারই উন্নতি হইলে মনুষ্যত্বের উন্নতি; এ নিমিত্ত এই গুণগুলির নাম মনুষ্যের ধর্ম্ম।

উক্ত ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের দ্বিবিধ অবস্থা আছে; এক বিকাশিত অবস্থা আর এক লীন অবস্থা। যখন ইহাদের বিকাশিত অবস্থা হয়, তখন ইহাদের নাম প্রবৃত্তি বা 'বৃত্তি' আর যখন লীন অবস্থা হয়, তখন তাহার নাম 'সংস্কার'।

এতদুভয়ের বিশেষ এই—ধর্ম্মাধর্ম্মের বিকাশ অবস্থায় কার্য্য সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু সংস্কার অবস্থায় কার্য্য অতিশয় সূক্ষ্ম, এ নিমিত্ত সুস্পষ্ট বুঝা যায় না; হয়ত সময়ে সময়ে কিছুমাত্রই অনুভবে আসে না। (চূড়ামণি মহাশয়ের ১২৯১ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রথমখণ্ড)।

পাঠক এখন বুঝিতে পারিলেন, অগ্নির তাপ ও জলের শৈত্যাদির মত. মানবের মানবত্বসম্পাদক কেবল মানবজাতীয় নিজস্ব স্বভাবজাত গুণবিশেষ-কেই তর্কচূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। আর তাহার কার্য্য ও

কারণ এই দুই অবস্থা প্রদর্শন করিয়া ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় প্রভৃতি কতক-গুলি নৈতিক গুণ আর উপাসনা প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক তরঙ্গের ভূয়ো-নুষ্ঠানের দ্বারা আত্মাতে যে সংস্কাররূপ গুণবিশেষ জন্মে, তাহাকে 'অপূর্ব্ব' নাম দিয়া কার্য্যধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। এখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ধর্ম্মের লক্ষণ দেখুন।

"শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমতঃ রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে, Re-ligaire হইতে ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,—ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের ইহা মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিসে (বা মিমিরো) বলেন যে, ইহা Re-legere হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাচরণ, সংগ্রহ, চিন্তা এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে, শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফুরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাহাই বলুন।

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম্মশব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা Religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম্ম—ধৃ+মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্ম্মকে Religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।" (নবজীবন 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ১২৯১, শ্রাবণ, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব ক্রোড়পত্র 'খ'।) তাহার পর তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি কি লিখিতেছেন, দেখুন।

তৃতীয় অধ্যায়ে "ধর্ম্ম কি?" এই প্রবন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।—

"শিষ্য। ভাল, religion কি, তাহাই না হয় বুঝান?

গুরু। কি জন্য? religion পাশ্চাত্য শব্দ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন, কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না।

শিষ্য। কিন্তু রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু কিছু নাই—যাহা সকল রিলিজনে পাওয়া যায়?

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; তাহাকে ধর্ম্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না।

শিষ্য তাহা কি?

গুরু। সমস্ত মনুষ্যজাতি—কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম্ম।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়?

গুরু। মনুষ্যের ধর্ম্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়।

শিষ্য। তাহাই ত জিজ্ঞাস্য।

গুরু। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম।

শিষ্য। তাহার নাম কি?

গুরু। "মনুষ্যত্ব।"

এই মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যায় যাহাকে বৃত্তির নিরোধ বলিয়াছেন, বঙ্কিম বাবু ইংরাজি culture দ্বারায় তাহাকে উক্ত অনুশীলন ও সামঞ্জস্য বলিয়াছেন, এইমাত্র প্রভেদ। প্রকৃত প্রস্তাবে মূল মনুষ্যত্বই যে মানুষের ধর্ম্ম, ইহা চূড়ামণি মহাশয় ও বঙ্কিম বাবু উভয়েরই কথা। তবে এই কথাটির প্রবর্ত্তক চূড়ামণি মহাশয়। বঙ্কিম বাবু তাহা অনুমান করিয়াছেন। আর ধর্ম্ম-শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা যে চূড়ামণি মহাশয় প্রথমেই প্রকাশ করেন, তাহা চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ই হউক এবং যাঁহারা তাঁহার প্রথম বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং বঙ্কিম বাবু চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট যে কিছুমাত্র ঋণী নহেন, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? তবে যে যে বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ ছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

নবান্ন।

হেমন্তের অপরাহ্ন বেলা।

তেজোহীন রবিকর ধান্যক্ষেত্রে করিতেছে খেলা,
সুপক্ক ধান্যের শীর্ষ ঝলিতেছে সোনার মতন,
কৃষকের শুষ্ক প্রাণে চমকিছে আশার কিরণ।
জননীরূপিণী আজি বসুন্ধরা, করিছে আহ্বান
ক্ষুধার্ত্ত সন্তানগণে সমাদরে দিতে অন্নদান।
গৃহে গৃহে জাগিয়াছে নবান্নের আনন্দ-উৎসব,
নর নরী শিশু যুবা সকলে করিছে কলরব।
অন্নপূর্ণারূপে আজি পূজিতে সে জগৎ-মাতায়,
ভকতি-বিহ্বল নর পুষ্পাঞ্জলি দেয় দেবীপায়।
অন্নদা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি স্বর্ণ-পাত্রে অমৃতান্ন ভরি
হাসিয়া দিতেছে শিবে, শোভাময়ী রাজরাজেশ্বরী,
করিব কল্পনা ধন্য, মুগ্ধ মন, দেখ আঁখি মেলি,
জগৎ জুড়িয়া আজি অন্নপূর্ণা মূরতি উজলি।
জননীর গৃহে আজ নবান্নের শুভ নিমন্ত্রণ,
জগতের সবাকার, এস সবে ভক্তিপ্লুত মন।
প্রণমি মায়ের পদে, শুভাশীষ লইব মাগিয়া,
'নবান্ন' সার্থক হবে, জননীর চরণে চাহিয়া।

শ্রীমতী সরসীবালা বসু।

প্রবঞ্চনার পরিণাম।

(গল্প)

(১)

যে সময়ের কথা উত্থাপন করিতেছি, সে সময় মোহিনীমোহন বসু কলিকাতা-কলেজের বি, এ, শ্রেণীর ছাত্র। তাঁহার বাড়ী ভবানীপুর। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পিতা রামগোবিন্দ বসু ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। বাল্যাবস্থাতেই স্নেহময়ী জননীর কালপ্রাপ্তি হওয়ায়, মোহিনীমোহন জননীর স্নেহলাভে চিরবঞ্চিত হইয়াছেন। এখন উদারচেতা মহাপুরুষগণ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে রক্ষা করিবার ভান করিয়া, শিক্ষা-মাহাত্ম্যে পুত্র-পৌত্রাদি থাকা সত্ত্বেও যেমন কালকবলাগতাবস্থাতে দ্বিতীয় বা ততোধিক বার ষোড়শী নারী (?) গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না, পরলোকগত রামগোবিন্দ বসু সেরূপ ধরণের লোক ছিলেন না। অবস্থা ও বয়সের হিসাবে দ্বিতীয় বার পাণিগ্রহণ করিলেও কেহ রামগোবিন্দকে কোনরূপ দোষ দিতে পারিতেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি বর্ত্তমান কালের মহাপুরুষদের ন্যায় শিক্ষিত ও উদারচেতা ছিলেন না। নতুবা কয়েকজনই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু যাই হোক্, অনেক বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ সত্ত্বেও রামগোবিন্দ বসু দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়া, একমাত্র ঈশ্বরকে ভারার্পণ করিয়া মোহিনীমোহনকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছিলেন।

রামগোবিন্দ ও কৃষ্ণগোবিন্দ দুই সহোদর। অগ্রজের মৃত্যুর পর কৃষ্ণগোবিন্দই বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন। কৃষ্ণগোবিন্দের একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। রামগোবিন্দ বসু জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণগোবিন্দের পুত্র রমণীমোহন বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও প্রায় মোহিনীমোহনেরই সমসাময়িক। রামগোবিন্দ ও কৃষ্ণগোবিন্দ উভয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াও রমণীমোহনকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহারা রমণীমোহনের মুখরা জননীর আবদারে ও বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া,

দুষ্ট বালককে শাসন করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুতে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া, রমণীমোহন অসৎসঙ্গে মিশিয়া এক্ষণে নানারূপ উপদ্রব ও মাত্‌লামি শিক্ষা করিয়াছে। পত্নীর ভয়ে কৃষ্ণগোবিন্দও কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতে পারেন না।

পিতার মৃত্যুর পর মোহিনীমোহন কলেজে থাকিয়া বেশ অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কারণ, পিতা যেরূপ খরচের জন্য টাকা-কড়ি দিতেন, খুল্লতাত কৃষ্ণগোবিন্দ পত্নীর শাসনে ও কুপরামর্শে সেরূপ টাকা-কড়ি পাঠাইতে পারেন না। আর এক বৎসর পরে পরীক্ষা দিতে হইবে, সুতরাং খরচের অনাটনের জন্য কলেজ পরিত্যাগ না করিয়া, মোহিনীমোহন প্রাইভেট্ টিউশনের সাহায্যে খরচ চালাইতে লাগিলেন।

বিজয়কুমার মিত্র নামে স্বজাতীয় আইনজ্ঞ উকীলের গৃহে মোহিনীমোহন প্রাইভেটের যোগাড় করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে একটি বালক ও একটি বালিকাকে শিক্ষাদান করিতে হইত। বালক ও বালিকাটি উকীল মহাশয়েরই সন্তান। বালিকার বয়স ১৩ বৎসর, নাম অন্নপূর্ণা, এবং বালকের বয়স ১১ বৎসর, নাম জগদানন্দ। মোহিনীমোহনের অকপট বিনয়সৌজন্য ব্যবহারে বিজয় বাবু একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সময় সময় মনে করিতেন,—এ হেন গুণবান্ রত্নকে পরিত্যাগ করিয়া, আর কাহার হস্তে সাধের অন্নপূর্ণাকে সমর্পণ করিব? বলা বাহুল্য, বিজয় বাবু ইতিমধ্যেই মোহিনীমোহনের বাড়ীর অবস্থার পরিচয় লইয়াছিলেন।

একদিন মোহিনীমোহনকে নির্জ্জনে ডাকিয়া, বিজয়বাবু আপনার মনোভাব প্রকাশ করিলেন। অবনত-মস্তকে মোহিনীমোহন বলিলেন,—"আমি কিছু বলিতে পারি না, বাড়ীতে খুল্লতাত মহাশয় মালিক আছেন।"

গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হওয়ায় মোহিনীমোহন বাড়ী আগমন করিলেন, এবং বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর জনৈক বন্ধুর নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া, পশ্চিমে বায়ু সেবনার্থ যাত্রা করিলেন।

(২)

'মেয়েটি আর অবিবাহিত রাখা উচিত নয়' এই কথা ভাবিয়া, একদিন বিজয় বাবু নিজেই ভবানীপুরে মোহিনীমোহন দের বাড়ী গমন করিলেন, এবং

কৃষ্ণগোবিন্দের নিকট নিজের মেয়েটির সহিত মোহিনীমোহনের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ স্বীকৃত হইয়া তৎপরদিন বিজয় বাবুর সঙ্গেই পাত্রী দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। বিজয় বাবু জামাতাকে নগদ ১০০০৲ টাকা, এবং মেয়েটিকে ১০০০৲ টাকার অলঙ্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। বৈশাখ মাসের মধ্যে একটা শুভ লগ্ন দেখিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ বিবাহের খরচস্বরূপ প্রথমেই ৫০০৲ টাকা লইলেন।

বিবাহের আর একদিন মাত্র সময় আছে। বিজয় বাবু কলিকাতার বিশ্বস্ত ও সুবিখ্যাত জুয়েলার্স 'মণিলাল এণ্ড কোম্পানী'র দোকান হইতে মেয়েটির জন্য ১০০০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কারও আনিয়াছেন, এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলেই বিবাহের আয়োজন জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। এমন সময় বিজয় বাবু ডাকযোগে মোহিনীমোহনের একখানা পত্র পাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—

"৮৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো
জয়তি।"

'চক্রবর্ত্তীটোলা'
"বৈদ্যনাথ—দেওঘর।"

"শ্রীচরণকমলেষু

প্রণামানন্তর সবিনয়-নিবেন, —

মহাশয়, আমি গ্রীষ্মাবকাশে জনৈক বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাইয়া, এখানে বায়ু সেবনার্থ আগমন করিয়াছি। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও উপভোগযোগ্য। তদ্ভিন্ন দুই বেলা ভগবান্ বৈদ্যনাথস্বামীর পূজারাধনাদি দর্শন করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি, এবং সহপাঠী বন্ধুর সহিত যথাবিধি অধ্যয়নও করি। আমি বেশ কুশলে আছি। এখন বাড়ী যাওয়া হইবে না, বোধ হয়, দুই সপ্তাহ পরে বাড়ী যাইতে পারি। সেখানকার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ জানাইয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন, এবং অন্নপূর্ণা ও জগদানন্দকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনার স্নেহের—শ্রীমোহিনীমোহন বসু।"

বিজয় বাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের কারণ,—"মোহিনীমোহনের বিবাহ, কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দ মোহিনীমোহনকে

বাড়ী আসিতে লিখেন নাই কেন? তাঁহার মনে অন্য কোনরূপ দুরভিসন্ধি নাই ত?" আবার পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিলেন,—"বোধ হয়, কৃষ্ণগোবিন্দের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই মোহিনীমোহন আমাকে পত্র লিখিয়া থাকিবে।" অবশেষে তিনি স্থির করিলেন,—'বিবাহের সময় পাত্র না দেখিয়া মেয়েটির গায়ে হলুদ প্রভৃতি কোন মাঙ্গলিক কার্য্য পূর্ব্বে করা হইবে না।'

পরদিন সন্ধ্যার পরে কৃষ্ণগোবিন্দ খুব জাঁকজমকের সহিত পাত্র লইয়া, বিজয় বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ বাদ্যরবে সে স্থান মুখরিত হইল। বালক জগদানন্দ পাত্র মোহিনীমোহনকে দেখিবার জন্য বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিল। আজ তাহার আনন্দের সীমা নাই, কারণ, আজ হইতে মোহিনীমোহনের সঙ্গে তাহার নূতন সম্বন্ধ হইবে। কিন্তু বালক আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাকে অবাক্ হইতে হইল। সে মোহিনীমোহনকে না দেখিয়া অন্য এক অপরিচিত যুবককে পাত্রবেশে দেখিল। জগদানন্দ পাত্রকে চিনিতে না পারিয়া পুনরায় বাড়ীতে দৌড়িয়া গিয়া পিতামাতার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিল। বিজয় বাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার সন্দেহ বাস্তবেই পরিণত হইয়াছে।

(৩)

কৃষ্ণগোবিন্দ যখন ভ্রাতুষ্পুত্র মোহিনীমোহনের বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন, তখন তিনি কুচক্রা পত্নীর নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'বিজয় বাবু খুব বড় দরের উকীল, তিনি স্ব-ইচ্ছায় সালঙ্কারা মেয়ে ও জামাতাকে নগদ ১০০০ টাকা দিতেছেন, তদ্ভিন্ন তিনি সময় সময় কন্যা-জামাতাকে আরও কত কি দিবেন;' এই সকল চিন্তা করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের স্ত্রীর অন্তঃকরণ বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি পতির নিকট জেদ ধরিলেন,—মোহিনীমোহনের বিবাহ না দিয়া রমণীমোহনের বিবাহ দিতেই হইবে। পতিকে বলিলেন,—"মোহিনী ত এখন বাড়ীতে নাই, তাহাকে বিবাহের সংবাদ না দিয়া রমণীকে পাত্র সাজাইয়া লইয়া যাও। মোহিনী ও রমণী প্রায় সমবয়স্ক, রাত্রিকালে বরবেশে থাকিলে মোহিনী নয় বলিয়া কেহ চিনিতেও পারিবে না। তার পর একবার বিবাহ হইয়া গেলে আর কি ভয় আছে?" কিন্তু বিজয় বাবুর বাড়ীর সকলের সঙ্গে

মোহিনীর যে কিরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা কৃষ্ণগোবিন্দ বা তাঁহার স্ত্রী জানিতেন না।

পূর্ব্বে মোহিনীমোহনের পত্র পাইয়া বিজয় বাবুর হৃদয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে বালক জগদানন্দের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি পাত্র দেখিতে বাহিরে আসিলেন। রমণীমোহনকে পাত্রবেশে দেখিয়া বিজয় বাবু কৃষ্ণগোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মোহিনী কোথায়?'

কৃষ্ণগোবিন্দ রমণীমোহনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ঐ যে।"

বিজয়।—কি মহাশয়, আমার সঙ্গেও প্রবঞ্চনা? মোহিনী কোথায়? এ যে আপনার পুত্র রমণী!

কৃষ্ণ।—মহাশয়, ক্ষমা কর্ব্বেন। মোহিনী আস্‌তে পারে নাই, পশ্চিমে আছে। আগে রমণীর বিবাহ না দিলে, সে বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আমি যখন মশায়ের মত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা ঠিক করিয়াছি, তখন অন্য উপায় না দেখিয়া নিজের পুত্র রমণীকেই পাত্র সাজাইয়া আনিয়াছি। কেন, রমণী ত মোহিনীর চেয়ে মন্দ ছেলে নয়?

বিজয়।—না মহাশয়, আমি আপনার ছেলেকে নিন্দা করি নাই। কিন্তু আপনার পুত্রের সঙ্গে আমার মেয়েটির বিবাহের কথাবার্ত্তা হয় নাই; এ কথাটি আপনার ভালরূপে জানা উচিত ছিল। আমিও মোহিনীর পত্র পাইয়াছি। যদি মোহিনীর বিবাহে সম্মতি ছিল না, তবে আমাকে এ কথা পূর্ব্বেই জানাইলে হইত। যা হোক্, আমি এরূপভাবে আপনার পুত্রের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিতে পারিব না। আপনি প্রবঞ্চনা করিয়া আমাকে যে অযথা খরচ করাইলেন, আমি সে সম্বন্ধে কিছু দাবী রাখিতে চাই না। তবে আপনি আমার প্রদত্ত নগদ ৫০০টাকা দিয়া পাত্রটি বাড়ী লইয়া যান। আমি বিবাহ দিব না।

কৃষ্ণ।—আমি বিবাহের খরচ বাবদেই টাকা লইয়াছিলাম। সে টাকা খরচও হইয়াছে। অতএব আমি উহা কোথা হইতে দিব?

'কোথা হইতে দিবেন, তাহা আমি জানি না' এই কথা বলিয়া বিজয় বাবু নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ পাঠাইলেন। অবিলম্বে পুলিশ-বাহিনী আসিয়া কৃষ্ণ-

গোবিন্দ ও রমণীমোহনকে থানায় লইয়া গেল। বরযাত্রীর অন্যান্য সকলে এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী চলিয়া গেল।

(৪)

পরদিন সকাল বেলায় কৃষ্ণগোবিন্দের স্ত্রী একজন লোকের মারফৎ ৫০০ টাকা পাঠাইয়া দিয়া পতিপুত্রকে কলিকাতার পুলিশ-থানা হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। রমণীমোহনকে দেখিয়া তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিগণ নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অহমিকা-দৃপ্ত, অভিমানী রমণীমোহনের প্রাণে এ যাতনা সহ্য হইল না। সে সারাদিন মনঃকষ্টে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর স্বীয় শয্যায় যাইয়া আশ্রয় লইল। জননী খাবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রমণীমোহন 'খিদে নাই' বলিয়া কিছুই খাইল না।

পরদিন বেলা প্রায় অর্দ্ধ প্রহর হইল, তথাপি রমণীমোহনের নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া তাহার জননী তাহাকে জাগাইতে আসিলেন; কিন্তু তিনি রমণীমোহনের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দও ছুটিয়া আসিলেন এবং তিনিও রমণীমোহনকে দেখিয়া মস্তকে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদে গ্রামের অনেক লোক আসিয়া সমবেত হইল। সকলেই দেখিল,—গলরজ্জুসংলগ্ন রমণীমোহনের মৃতদেহ গৃহমধ্যস্থিত বরগায় ঝুলিতেছে।

সকলেই বুঝিতে পারিল যে, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর প্রবঞ্চনায় রমণীমোহনের বিবাহ না হওয়াতে সে অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

"হা হতভাগ্য রমণীমোহন! তুমি মনে করিয়াছিলে যে, আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়া অপমান ও যন্ত্রণার সমাধান করিবে। কিন্তু তোমার সে অপমানের ও যন্ত্রণার শেষ হইল কি? আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহার ফল অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণাভোগ। সুতরাং তোমাকে এই পাপ-কার্য্যের জন্য ইহা অপেক্ষা সহস্রাধিক গুণে অপমান ও যন্ত্রণা অনন্ত কালের জন্য ভোগ করিতে হইবে। এ জগতে রাজবিধান লঙ্ঘন করা যেরূপ দোষের বা পাপের কার্য্য এবং তাহার জন্য যেমন কারাদণ্ড বা নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ রাজরাজেশ্বর পরমেশ্বরের

বিধান লঙ্ঘন করাও গুরুতর পাপের বা দোষের কার্য্য। অপরাধের বা পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে তাহার জন্য অনন্তকাল বা নির্দ্দিষ্ট কাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তুমি অভিমানবশে আত্মহত্যা করিবার জন্য মানব-শরীরে জন্মগ্রহণ কর নাই। তুমি অনেক কর্ত্তব্যের ভার মাথায় লইয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি সে সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে কিছু সম্পন্ন করিয়া গেলে কি? ইহা কি তোমার ঈশ্বরের নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য হইল না? এরূপে নীতিবিরুদ্ধতার জন্য তুমি তাঁহার নিকট কিরূপ জবাবদিহি দিবে? সংযমহীন অভিমানী মানবমাত্রেই নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া আত্মহত্যা করে। কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে যে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, তাহা সে একবারও ভাবিয়া দেখে না। সে দণ্ড কিরূপ, আবার বলিতে হইবে কি? নিদারুণ যন্ত্রণাসহ অনন্তকাল নরকভোগ। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—আত্মহত্যা মহাপাপ। কেবল পরোপকারার্থে, সতীত্ব-রক্ষার্থে আত্মদান মহাধর্ম্ম বলিয়া কথিত। কিন্তু হে রমণীমোহন! তুমি পরোপকারের জন্য আত্মদান কর নাই, তুমি অসংযমী হইয়া অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছ। সুতরাং তুমি মহাপাপী, এই পাপ-কার্য্যের জন্য তোমাকে অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। পরমেশ্বরের রাজ্যে ইহাই চিরাচরিত বিধান।"

রমণীমোহনের আত্মহত্যার সংবাদ পাইয়া পুলিশবাহিনী যথাসময়ে অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের প্রবঞ্চনাই রমণীমোহনের আত্মহত্যার কারণ জানিতে পারিয়া পুলিশবাহিনী কৃষ্ণগোবিন্দকে বন্ধনাবস্থায় থানায় লইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটিও পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইল।

বিজয় বাবু এই সংবাদ পাইয়া মোহিনীমোহনকে টেলিগ্রাম করিলেন। মোহিনীমোহন ভোরের ট্রেণে আসিয়া বিজয় বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিজয় বাবুর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া, তদ্দণ্ডেই কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। বিজয় বাবুও তাঁহার অনুগমন করিলেন।

পরে মোহিনীমোহন বিজয় বাবুকে লইয়া খুল্লতাতের জামিনের জন্য দরখাস্ত করিলেন; কিন্তু জামিন মঞ্জুর হইল না। মোহিনীমোহন কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ পুত্রের আত্মহত্যার প্রধান কারণ বলিয়া মামলা উত্থাপিত হইল।

বাদী স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট। দায়রা জজের বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় কৃষ্ণ-গোবিন্দের দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

(৫)

দেখিতে দেখিতে একমাস অতীত হইল। বিজয় বাবুর পরামর্শে মোহিনী-মোহন ইতিমধ্যে দায়রার আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করিয়াছেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু জেলমধ্যে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। মোহিনীমোহন পিতৃব্যশোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের পত্নীও পতিপুত্রশোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া আত্মহত্যার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মোহিনীমোহন মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি খুল্লতাতের মৃতদেহের সৎকার করিতে যাইবেন কি, খুড়ীমা'কে অনেক প্রবোধ দিয়াও সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিজয় বাবু আসিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

বিজয় বাবু মোহিনীমোহন ও তাঁহার খুড়ীমাকে লইয়া সেই সময়েই বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন এবং কৃষ্ণগোবিন্দের পত্নীকে আপনার বাড়ীতে রাখিয়া, মোহিনীমোহনের সঙ্গে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর মৃতদেহের সৎকার করিতে গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে মোহিনীমোহন কুলপ্রথানুযায়ী খুল্লতাত মহাশয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শ্রাদ্ধান্তে শোকের কিছু উপশম হইলে, একদিন বিজয় বাবু মোহিনীমোহনের খুড়ীমা'র নিকট মোহিনামোহনের বিবাহের কথা তুলিলেন।

মোহিনীমোহনের খুড়ীমা বলিলেন,—"আমার এ বিষয়ে কোন আপত্তি নাই। আপনার মেয়ের সঙ্গে মোহিনীমোহনের বিবাহ-সম্বন্ধ ত পূর্ব্ব হইতেই ঠিক আছে, অতএব আর বিলম্ব না কবিয়া শুভকার্য্য শীঘ্র শেষ করিলেই হয়। মোহিনী ব্যতীত আর আমার এ সংসারে কে আছে? যদি সেই সময়েই মোহিনীর বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে কি আমি এরূপ ভাবে পতিপুত্র হারাইতাম? আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলও পাইলাম।"

বিজয় বাবু বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া, অন্নপূর্ণার সহিত মোহিনীমোহনের বিবাহ দিলেন। মোহিনীমোহনের খুড়ীমা নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভবানীপুরে আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

মোহিনীমোহন এইরূপ বিপদে পড়িয়া বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তিনি বাড়ীতে থাকিয়াই স্বীয় অধ্যবসায়বলে দেশের মধ্যে গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। আর্ত্ত ও দীন-দুঃখীর সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি খুড়ী-মা'কে সন্ত্রীক দেবীর ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মোহিনীমোহনের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার খুড়ীমা পতিপুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন।

কয়েক বৎসর পরে মোহিনীমোহন একটি পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। প্রভূত অর্থবলে জমিদারী ক্রয় করিয়া, তিনি একজন স্বনামধন্য জমিদার হইলেন। প্রতিদিন শত শত লোক তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তাঁহার পত্নী অন্নপূর্ণা প্রকৃতই অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

একদিন মোহিনীমোহনের খুড়ীমা বলিলেন,—"বাবা মোহিনি! আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আর সংসারে থাকিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। আমাকে তুমি কাশীবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দাও। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ধনে পুত্রে আরও সৌভাগ্যশালী হও।"

খুড়ীমা'র অনুরোধে মোহিনীমোহন তাঁহার কাশীবাসের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

পৃথ্বীরাজ।

তৃতীয় খণ্ড।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রফাঁদ।

নাগরে কৈমাসের শিবির পড়িয়াছে, তখনও পর্য্যন্ত চামণ্ড রায় আসিয়া পঁহুছান নাই; কিন্তু কৈমাস একাকীই সৈন্যসজ্জা আরম্ভ করিলেন; চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চৌহান সৈন্যগণ রণোন্মত্ত হইয়া উঠিল। সকলে বুঝিল যে, চালুক্যের গর্ব্ব অচিরেই খর্ব্ব হইবে। অমরসিংহ যে সংবাদ পাইলেন।

তখন তিনি মন্ত্রপ্রয়োগে কৈমাসকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অমরসিংহের চেষ্টা সফল হইল, কৈমাস মন্ত্রফাঁদে পড়িলেন।

এই মন্ত্রফাঁদ কি জানেন? মদনদেবতার মন্ত্রজাল। অমরসিংহের কৌশলে সেই মদনদেবতা কৈমাসের কানে মন্ত্র পড়িয়া দিলেন, অমনি কৈমাস তাঁহার জালে আসিয়া পড়িলেন। কৈমাসের সৈন্যসজ্জা শুনিয়া অমরসিংহ ভীমদেবের নামে তাঁহার নিকট এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে ভীমদেবের গৌরব-গানের পর এক সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত হয়, এবং লিখিত থাকে যে, তিনি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে সেই রমণী তাঁহার উপহার হইবে। রমণীর চিত্র দেখিয়া কৈমাসের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক দিকে প্রভুভক্তি, অন্যদিকে আত্মতৃপ্তি। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তখন মদনদেবতা ক্রমে তাঁহার কানে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন ও আপনার ফাঁদ পাতিতে আরম্ভ করিলেন। মদনের মন্ত্রে কে না মুগ্ধ হয়? কৈমাসেরও তাহাই ঘটিল এবং তিনি অবশেষে ফাঁদেও পড়িলেন। কৈমাস সেই রমণীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য পত্রবাহককে বলিলেন। পত্রবাহক তখনই চলিয়া গেল।

পত্রখানি হস্তে লইয়া কৈমাস বার বার সেই চিত্রের দিকে চাহিতেছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার হইতেছিল; চিত্ত অধীর হইয়া পড়িতেছিল; কতক্ষণে চিত্রিত ছবি সজীব হইয়া উঠিবে, তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই রমণীটি ঠমকভরে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কনককান্তি, চন্দ্রবদন, নেত্রকমল, ভুজমৃণাল, কুটিল কেশপাশ দেখিয়া কৈমাস স্থির-দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দেখিতেছেন?"

কৈমাস উত্তর দিলেন,—"তোমাকে।"

রমণী বলিল,—"আমাকে? আমাতে কি আছে যে, আপনি স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতেছেন?"

কৈমাস—"তোমাতে সবই আছে।"

রমণী—"কৈ, আমি ত তাহা বুঝিতে পারি না।"

কৈমাস—"লোকে আপনাকে কি আপনি বুঝিতে পারে?"

রমণী—"আপনাকে ত আপনিই বুঝিতে হয়।"

কৈমাস—"ও ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা।"

রমণী—"আমি তাহা বলিতেছি না, আপনাকে আপনি বুঝিতে না পারিলে অপরকে বুঝাইব কিরূপে?"

কৈমাস—"তবে কি তুমি আত্মহারা?"

রমণী—"সম্প্রতি বটে।"

কৈমাস—"কেন?"

রমণী—"আপনাকে দেখিয়া।"

কৈমাস—"বল কি? আমিই ত তোমাকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছি।"

রমণী—"আমিও তাহাই জানিবেন।"

তখন কৈমাস তাহার হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নামটি কি ভাই?"

রমণী কহিল,—"ললিতা।"

কৈমাস—"নামটি ত বেশ মধুর; যেমন রূপ, নামটিও তেমনি মিষ্ট।"

ললিতা—"আমার রূপটি কি আপনার চক্ষে এতই ভাল লাগিল?"

কৈমাস—"তাহা না হইলে আমার চক্ষু অন্ত দিকে যাইতেছে না কেন?"

ললিতা—"মহতের ভাব এমনই বটে।"

কৈমাস—"তোমার সরল প্রাণ, তাই ঐরূপ বলিতেছ।"

ললিতা—"সে যাহা হ'ক, আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।"

কৈমাস—"কি আজ্ঞা?"

রমণী—"আমি আপনার সহিত আজমীর যাইব না, আপনাকে এইখানেই থাকিতে হইবে।"

কৈমাস—"তথাস্তু।"

ক্রমে তাঁহাদের আলাপন গাঢ় হইয়া আসিল। এইরূপে কৈমাস অমরসিংহের কৌশলে মদনদেবের মন্ত্রফাঁদে পড়িলেন। তাঁহার সেই অতুলনীয় স্বামিভক্তি প্রেমসলিলে ভাসিয়া গেল। নাগর ভীমদেবের অধিকারে আসিল।

(ক্রমশঃ।)

জনা ও প্রবীর

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:*:—

ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট হইতে মহাকবি ভাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যজগতে এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থাপিত করিয়াছে, আমরা ভাসের নাটকাবলী কথাকারে অনূদিত করিবার জন্ত ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে অনুমতিপত্রের নকল প্রদত্ত হইল। কবিকথায় মালতী-মাধব শেষ হইলেই ভাসের নাটকাবলী কবিকথাকারে প্রকাশিত হইবে।

No. 220.

Office of the Curator for the publication of Sanskrit
Mss. Trivandrum
6th, April 1915.

DEAR SIR,

In reply to your kind letter dated 5. 3. 15, I have great pleasure to inform you that the Government have permitted you to translate into Bengali the works of Bhasa in the form of a tale. You may also consult with advantage the Pratimânâtaka one of the best works of Bhasa and also an improved second edition of Svapnavâsavadatta; both will be published in a month.

I am Dear Sir,
Yours truly
Sd. T. GANAPATI SASTRI
CURATOR.

TO NIKHIL NATH RAY ESQ.

মোহিনী মূর্ত্তি

Mohila Press, Calcutta.

শ্রীগুরবে নমঃ।

আলোচনা।

বিজয়ার সম্ভাষণ।

বিজয়ার পর আমরা সকলকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিতেছি; মার চরণস্পর্শে আমাদের যে গৃহ পবিত্র হইয়াছিল, তাহার ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া আমরা পরস্পরের আলিঙ্গনে ধন্য হইয়া উঠিয়াছি। এক্ষণে আমরা পুনরায় সকলে মিলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি। মা আমাদের পথে কল্যাণ বর্ষণ করুন।

বাল্য-বিবাহ।

বাল্য-বিবাহকে পাশ্চাত্য সমাজ ও আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বর্ত্তমান যুদ্ধসমস্যায় ইউরোপের মনীষিগণের বিবেচনা হইতেছে যে, অধিক বয়সে বিবাহ হইলে কম সন্তান জন্মে। তাই তাঁহারা বিবাহ-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছেন। ভাল কথা। আমাদের শাস্ত্রমতেও সন্তানোৎপাদনই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রবাহ-রক্ষা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সুতরাং যাহাতে সৃষ্টিধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকে, সে বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য থাকা উচিত। তাই আমাদের শাস্ত্রকারগণ সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক বিবাহের উপযুক্ত সময় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য সন্তানোৎপাদনের কিছু পূর্ব্বে আমাদের বিবাহের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু সন্তানোৎপাদনের প্রকৃত কাল তাঁহারা জীবধর্ম্মানুসারেই স্থির করিয়াছেন। সন্তানোৎপাদনের প্রকৃত কাল যদি নষ্ট করা হয়, তবে উপযুক্ত সন্তানের উৎপাদনে যে বাধা জন্মে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি বৃক্ষের ফলপ্রসবের সময় হইলে, যদি কৃত্রিম উপায়ে তাহার বাধা দেওয়া যায়, তবে তাহার ফল প্রসূত হয় কি না, অথবা হইলে কিরূপ হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানা যায়।

সেইজন্য আর্য্য ঋষিগণ সন্তানপ্রসবের উপযুক্ত সময়েই সন্তানোৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে যে বিবাহের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল বর ও শ্বশুরকুলের সহিত বধূর সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য। সম্বন্ধ কিছু পূর্ব্বেই স্থাপন করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত কাল না হইলে, কদাচ সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করিবে না, ইহা তাঁহাদের আদেশবাক্য। সে যাহা হউক, যদি ইউরোপীয় সমাজ বিবাহ-সংস্কারের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে, দেখা দেখি আমাদেরও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও যে অগ্রসর হইবেন, ইহা আশা করা যায়। আমাদের দেশের কুমারীগণ যেরূপ আত্মহত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে অধিকবয়স্কা করিয়া রাখা যে যুক্তিযুক্ত নহে, এ কথা, বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যত সত্বর হয়, শ্বশুরকুলের সহিত কন্যাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াই উচিত। তাহাতে গৃহে ও সমাজে কল্যাণ সংঘটিত হয়। আমাদের গৃহে ও সমাজে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, অধিক বয়সে বিবাহ তাহার অন্যতম কারণ।

বর-পণ।

বর-পণ-প্রথা নিবারণের চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার ফল ত এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। ব্রাহ্মণ-সভা, কায়স্থ-সভা প্রভৃতির অধিবেশনে বড় বড় প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু সে প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিতে পাই না। এমন কি, সেই সেই সভার নেতৃগণের মধ্যেও কেহ কেহ পরোক্ষভাবে উক্ত প্রথার সমর্থনও করিতেছেন। তাঁহারা পণ বলিয়া কোন টাকার দাবী করেন না বটে, কিন্তু অলঙ্কার ও বরসজ্জা বলিয়া যে লম্বা-চৌড়া ফর্দ্দ দাখিল করেন, তাহাতে কন্যাপক্ষকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এরূপ প্রবঞ্চনার অর্থ কি, আমরা বুঝিতে পারি না। লোকের নিকট আমরা সাঁচ্চা থাকিব, আর তলে তলে কন্যাপক্ষের গলায় ছুরী দিব,—এরূপ নীতি যে অদ্ভুত, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেতৃগণের ঈদৃশ ব্যাপার দেখিয়া সামাজিকগণও উক্ত প্রথা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন না। যতদিন আমাদের নেতৃগণের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখা না দিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করা বৃথা।

—:০:—

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, অথবা ইহা একেবারেই অভিনব ধর্ম্ম, এই তর্ক-বিতর্ক বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে একরূপ স্থির হইয়াই গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ নূতন। হিধন্দুর্ম্ম বা বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। এমন কি, বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সাংখ্যমতও যে বৈদিক বা আর্য্যমত নহে, তাহাও বিঘোষিত হইতেছে। যে সমস্ত উপনিষদে সাংখ্য-মতের কথা আছে, তৎসমুদয় আধুনিক বলিয়াও শুনা যাইতেছে; আর শঙ্করাচার্য্যও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যমত যে আর্য্যমত নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মকে নূতন বলা যায় না, সাংখ্যমতের রূপান্তরই বলিতে হইবে। বৌদ্ধেরা না কি বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা সাংখ্যমতকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাহা হইলে, অগ্রে সাংখ্যমত অবশ্যই তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যমতের উপরে স্থাপিত, ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। এক্ষণে সাংখ্যমত আর্য্য কি অনার্য্য, তাহা লইয়াই কথা। কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে বলিয়া যদি তিনি অনার্য্য হন, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। কিন্তু তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহার কি স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে? তাঁহার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ কি আবিষ্কৃত হইয়াছে? না শিলালিপি বা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে? আর পঞ্চশিখ জনক রাজার সভায় আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার বাড়ীও পূর্ব্বাঞ্চলে এবং তিনিও অনার্য্য; কাজেই সাংখ্যমত যে অনার্য্যই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ সমস্ত যুক্তি কতদূর সারবতী, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিয়া দেখিবেন। যদি কপিল অনার্য্য হন, বা সাংখ্যমত অনার্য্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরে যে আর্য্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল, ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি।

কারণ, মনু প্রভৃতি তাহা মানিয়া লইয়াছেন, এবং কোন কোন উপনিষদে (তাহা আধুনিক হইলেও) দেখা যাইতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে সাংখ্যমত আর্য্যমত হওয়ার পূর্ব্বে কি পরে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারই বিচার করিতে হয়। যদি সাংখ্যমত আর্য্যসম্মত হওয়ার পরে বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, ইহা বলিতেই হইবে। আর যদি বলা যায় যে, মনু-সংহিতা এবং সেই সকল উপনিষদাদি বৌদ্ধধর্ম্মের পরে রচিত, তাহা হইলে হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বৌদ্ধমত যদি সাংখ্যমতকে ছাড়াইয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে মনুর গ্রন্থে অথবা সেই সেই উপনিষদে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন কথা না থাকিয়া সাংখ্যমতের কথা থাকিল কেন? সুতরাং ঐগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের পরের গ্রন্থ কিনা, তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে মনু সাংখ্যমতের আদর করিয়াছেন, তিনি আবার ছত্রে ছত্রে বৈদিক মতেরও সমাদর দেখাইয়াছেন। তাঁহার আর্য্য ও অনার্য্য মতের আদর যে এক অদ্ভুত ব্যাপার, তাহা বলিতেই হইবে। দুইটি বিরোধী মতকে একত্র স্থাপন করা মনুর পক্ষে বাহাদুরী বলিতে হইবে। তাই এক একবার মনে হয়, সাংখ্যমত কি অনার্য্য? যাহা হউক, মনুর গ্রন্থে ও উপনিষদাদিতে যখন বৌদ্ধমতের কথা নাই, সাংখ্যমতেরই আছে, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে যে ঐ গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় বলা যাইতে পারে। সুতরাং তখন সাংখ্যমতও হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভূত হইয়াছে; তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম আর হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে নূতন হইয়া উঠে না। কারণ, তাহা সাংখ্যমতের উপরেই স্থাপিত।

আমরা বলিয়াছি যে, বৌদ্ধমত সাংখ্যমতেরই রূপান্তর; বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল বহু প্রাচীনকাল হইতে ছিল বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু শাক্যসিংহের পর হইতে তাহার প্রচলন কিছু বিশেষরূপে আরব্ধ হয়। তাহার পর অশোক রাজার সময় হইতে তাহা প্রবল হইয়া উঠে। শাক্যসিংহ ও অশোকের মধ্যবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের যে হ্রাস হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। নবাবিষ্কৃত ভাস কবির গ্রন্থাবলী হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। আর শাক্যসিংহের নিজ মতও যে কি ছিল, তাহা বুঝা যায় না। তাঁহার শিষ্য

প্রশিষ্যেরা যে মত প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহারই কথা চলিয়া আসিতেছে। সেই জন্য বুদ্ধের অস্তিত্বেও সন্দেহ আছে এবং সাংখ্যমতের রূপক ব্যাখ্যায় বুদ্ধের উৎপত্তি স্থির হইয়া থাকে। তাহাতে কপিলবস্তুকে কপিলের বাস-স্থান, বুদ্ধের মাতা মায়াদেবীকে মায়া বা প্রকৃতি এবং বুদ্ধকে জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়; এ সম্বন্ধে আমরা হণ্টার সাহেবের History of India হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

Buddha's Personality denied.—while, on the one hand, many miraculous stories have grown up around Buddha's life and death, it has been denied, on the other hand, that such a person as Buddha ever existed. The date of his birth cannot be fixed with certainty. Some scholars hold that Buddhism is merely a religion based on the Sankhya Philosophy of Kapila. They argue that Buddha's birth is placed at a purely allegorical town, Kapilavatu, 'the abode of Kapila'; that his mother is called Maya-Davi, in reference to the Maya or illusion doctrine of Kapila's system; and that the very name of Buddha is not that of any real person, but merely means the 'Enlightened.' This theory is so far true, that Buddhism was not a sudden invention of any single mind, but was worked out from the Brahman philosophy and religion which preceded it. But such a view leaves out of sight the two great traditional features of Buddhism, namely, the preacher appeal to the people, and the undying influence of his own beautiful life.

হণ্টার সাহেবও বলিতেছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের আকস্মিক উৎপত্তি ঘটে নাই, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতেই তাহার উদ্ভব হয়।

স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে উহাই প্রতিপাদিত

"বুদ্ধের নির্ব্বাণ ও হিন্দু যোগীদিগের কৈবল্য একই তত্ত্ব। বুদ্ধ যাহাকে নির্ব্বাণ আখ্যায় অভিহিত করিতেন, হিন্দুযোগীরা তাহাকেই কৈবল্য (কেবল-ভাব) বলিতেন। অতএব বুদ্ধের নির্ব্বাণ নিতান্ত অভিনব পদার্থ নহে।"

বিখ্যাত পণ্ডিত গোল্‌ডষ্টুকার পাণিনি ব্যাকরণের "নির্ব্বাণোঽবাতে" এই একটি সূত্র দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য সাহসের সহিত বলিয়া গিয়াছেন যে, নির্ব্বাণ শব্দ বুদ্ধের পূর্ব্বে বাতবিরহিত অর্থেই ব্যবহৃত হইত, মোক্ষবিশেষ (নির্ব্বাণ) অর্থে ব্যবহৃত হইত না। বৈদেশিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের এই অদূরদর্শিতার বিষয় ৩য় ভাগ ঐতিহাসিক রহস্যের "পাণিনি" নামক প্রস্তাবে বিশেষরূপে সমালোচিত হইয়াছে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ বলেন, "নির্ব্বাণং পরমং সুখম্"। আমাদের ব্যাসমুনিও বলিয়াছেন—

নির্ব্বেদাদেব নির্ব্বাণং ন চ কিঞ্চিদ্‌বিচিন্তয়েৎ।
সুখমিব ব্রাহ্মণেন ব্রহ্ম নির্ব্বেদেনাধিগচ্ছতি॥

নির্ব্বাণং অস্তগমনম্, নির্বৃতিঃ, ইতি মেদিনী। বিশ্রান্তিঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ। মুক্তিঃ ইত্যমরঃ।

লোকমধ্যে "দীপ নির্ব্বাপিত হইল" এইরূপ প্রয়োগ থাকায় নির্ব্বাণ শব্দের "নিভিয়া যাওয়া" এইরূপ ভাবের অর্থ প্রখ্যাত আছে। বস্তুতঃ নিভিয়া যাওয়াও শূন্যতা নহে। নির্ব্বাণ যে শূন্যতা নহে, তাহা বুদ্ধদেব নিজমুখে বলিয়াছিলেন। কেবল, অদ্বয়, একরস হওয়া বা অহং প্রবাহের নিরোধ, বিশ্রান্তি বা বিচ্ছেদ লাভ করা বুদ্ধাভিমত নির্ব্বাণ। বুদ্ধাভিমত নির্ব্বাণের সহিত "ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" "কৈবল্যমশ্নুতে" ইত্যাদি কথার মিল বা ঐক্য আছে।

বৌদ্ধমতে "চতুর্ধ্যানলাভী" ৪ প্রকার ধ্যান ও সমাধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের যোগশাস্ত্রেও ৪ প্রকার ধ্যান ও সমাধি কথিত আছে। ৪ প্রকার সমাধির নাম ও স্বরূপ পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। বুদ্ধ যে ষাড়্‌বার্ষিক যোগ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমাদেরই যোগশাস্ত্রসম্মত; তৎপরে তিনি যে উপায়ে বোধিবৃক্ষমূলে নির্ব্বাণজ্ঞান লাভ করেন, সে উপায় আমাদেরই যোগশাস্ত্রের নির্ব্বাণ সমাধিলাভের উপায়। এ সকল কথা সেই সেই স্থানে বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

বুদ্ধদেব আপনার জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের পরে পর-পর অবস্থানিচয় শিষ্য-দিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এই—

সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সমাধি এই আট প্রকার সাধনার দ্বারা নির্ব্বাণের পরম শত্রু পাপ চিত্ত হইতে অপসৃত হয়। বুদ্ধের এ কথা নূতন নহে, কোনও হিন্দু শাস্ত্রের অপরিচিত নহে।

বুদ্ধ বলেন, সমাধির আবশ্যিক ফল চতুর্ব্বিধ;—বিবেক, একোতীভাব, উপেক্ষকত্ব ও স্মৃতিপরিশুদ্ধি। আমাদের প্রাচীন যোগশাস্ত্রেও ঐ চতুর্ব্বিধ ফলের উপদেশ আছে; কেবল নাম কয়েকটি নাই। স্মৃতিপরিশুদ্ধি ও উপেক্ষকত্ব এ দুটি প্রকারান্তরে অভিহিত আছে বলিলেও বলিতে পারি। (পাতঞ্জল দর্শন দেখুন)।

বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন—"প্রথমাবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ ও অসৎ পদার্থের মূল পরিদর্শন হয় অর্থাৎ নির্ব্বাণ, মোক্ষ, শান্তি ও সমাধির প্রকৃত জ্ঞান প্রতীত বা উপলব্ধ হয়; তৎপরে অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অনিত্যতা, ক্ষণ-নশ্বর বিষয়ের অসারতা প্রতীত হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান পরিষ্কার নির্ম্মল, চক্ষুর স্বরূপ এবং তাহা একপ্রকার লোকোত্তরও জ্ঞান বা অলৌকিক জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিতে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল আলোকিত হয়, তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয় ও অত্যুজ্জ্বল প্রত্যক্ষ বিশ্বাস সমাগত হয়।" বুদ্ধের এ কথা পাতঞ্জলের "তাবকং সর্ব্ববিষয়ম্" "তৎ সর্ব্বার্থম্" ইত্যাদি কথার সহিত সমান।

তিনি আরও বলিয়াছেন, ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব হইতে একত্বে অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। (ইহারই অন্য নাম বা পরিভাষা একো-তীভাব) তৎকালে ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। তাহা একই পরম পদার্থ, একই ধ্যান, একই জ্ঞান, একই প্রতীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও প্রতীতি। তদ্ব্যতীত বস্ত্বন্তরে দৃষ্টি থাকে না, জ্ঞানও থাকে না; সুতরাং ভাবাভাব বা ভাবনা থাকে না। বুদ্ধের এ কথাও পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রোক্ত "একাগ্রতা পরিণাম" কথার সহিত সমান।

রাগ বৈরাগ্য, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য, এ সমুদয় বোধাতীত হয়; আত্মা এ অবস্থায় মধ্য ব্যবস্থায় অবস্থিতি করে; নির্লিপ্ত উপেক্ষক অস্পৃষ্ট, অক্রিয় ও অস্পন্দ হয়। আত্মা তখন কোন প্রকার বোধে আসক্ত নহে, অধীন নহে ও ক্রিয়াহীন।” বুদ্ধের এ উক্তিও যোগশাস্ত্রসম্মত নিরোধ পরিণামের ফল বা নামান্তর মাত্র।

শাক্যসিংহ দুঃখিত হইয়া অর্থাৎ সমাধিভঙ্গের পর বা বোধিজ্ঞান লাভের পর আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই:—“চতুর্থ সমাধিতে অর্থাৎ সমাধির চরমাবস্থায় আত্মস্মরণ তিরোহিত হয়, আমিত্ব বা অহংভাব (ইহাই বুদ্ধ মতের আলয়, বিজ্ঞান, ও জীবাত্মা) বিদূরিত হওয়াতে চিত্ত যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হয়, না থাকার ন্যায় হয়; অহঙ্কারই পাপের ও সংসারের মূল, তাহার অভাবে পুণ্যের উদয়; পাপ জীবনের ও সংসারের মৃত্যু এবং ধর্ম্মজীবনের বা মনুষ্যোত্তর জ্ঞানের লাভ, ইহাই চরম; এই অবস্থায় আসিলেই দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তির উদয়, নির্ব্বাণরূপ পরম তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। অনন্ত জ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন হয়। সত্ত্ব তখন প্রকৃতিস্থ ও অমর, ইহাই অমরত্ব। আর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, জীবন নাই, জরা নাই, বন্ধমোক্ষ নাই। সত্ত্ব অচ্যুতরাজ্যে বিচরণ, পরমানন্দ প্রাপ্ত ও অমর হয়।” বুদ্ধের এ কথা আর হিন্দুযোগীদিগের নির্ব্বীজ সমাধির ফল আত্মবিমোক্ষ সমান। হিন্দু যোগীদিগের কৈবল্যলাভের লক্ষণ, বুদ্ধের সত্ত্বদর্শন, বেদান্তের ব্রহ্মদর্শন, এ সমস্ত সমান। সত্ত্বশব্দও হিন্দুমতে পরমাত্মবাচী ও ব্রহ্মবাচী। বৌদ্ধের বোধিসত্ত্ব আর হিন্দুমতের জীবন্মুক্ত পুরুষ একই কথা। বুদ্ধ বলেন, শেষাঙ্গ সম্যক্ সমাধি, তাহা হইতে শান্তিফল উৎপন্ন হয়, সেই শান্তি সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হওয়ার পর উদিত হয়। চিত্ত তখন স্থির, অচঞ্চল, প্রতিকূল অনুকূল কোন ব্যাপারে বিকৃত হয় না। চিত্ত তখন নিরন্তর একই অবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহাই শম অর্থাৎ শান্তি। এই শান্তি নির্ব্বাণজ্ঞানের স্বাদুফল। চিত্ত নির্ব্বাণজ্ঞানের প্রভাবে পারমিতার অধিকার বশীভূত করে এবং হৃদয় পারমিতার উপরেই সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। দান, শীল, শান্তি, ধ্যান, বল, বীর্য্য, উপায়, প্রণিধি, প্রজ্ঞা, সমুজ্জ্বল সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান, এই সকল পারমিতা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধের এ কথাও আমাদের বেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের অনুরূপ।

উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন :—

"ইহা নূতন, তাহা নূতন, এ কথা কথা মাত্র ; চিন্তাচক্ষে দেখিতে গেলে আকস্মিক অভিনবোৎপন্ন সম্পূর্ণ নূতন কিছুই নাই, মানুষকে অনেক দিন না দেখিলে সে নূতন মানুষ ; জিনিসের রূপান্তর হইলে সে নূতন জিনিস। দেশ পূর্ব্বে দেখা না থাকিলে, সে দেশ নূতন দেশ। এইরূপ নূতন ব্যতীত অন্য কোন রকমের নূতন এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। নূতন শাস্ত্র, নূতন মত, নূতন ধর্ম্ম, নূতন শিল্প, সমস্তই ঐরূপ অবস্থাম্বিত ; ইহা যখন ভাবি, চিন্তা করি, তখন আমার নিম্নলিখিত শ্লোকটি মনে পড়ে এবং বড় ভাল লাগে।

"যুগে যুগে সমুচ্ছিন্না রচনেয়ং বিবস্বতঃ।
প্রমাদাৎ কস্যচিদ্ভূয়ঃ প্রাদুর্ভবতি কালতঃ॥"

যদি কিছুই সম্পূর্ণ নূতন না থাকে, তবে বুদ্ধের মত বা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন নহে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে সাহসের সহিত বলিতে পারি। তবে যে লোকে বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বেদধর্ম্মাপেক্ষা নূতন, আমার মতে তাহা প্রোক্ত প্রকারের নূতন,—সম্পূর্ণ নূতন নহে। কেহ কেহ বলেন—No trace of whatever existed before the life and period of Buddha is to be found out now. এ কথা যদি শিল্পকার্য্য লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে আমাদের ঐ কথার উপর তর্ক নাই, নচেৎ ঐ কথা নিতান্ত অসার। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, বুদ্ধ মতের হস্ত, পদ, হৃদয়, প্রাণ, মস্তক, সমস্তই প্রাচীন বৈদিক মতের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থানে লুক্কায়িত ছিল ; বুদ্ধ সেইগুলি জোড়া লাগাইয়া লইয়াছিলেন মাত্র।

সর্ব্বশেষে আমরা বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ Spooner সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। Spooner সাহেব বলিতেছেন,—It was the product of Hindu thought operating on an Indian body domiciled in India, long enough to have become acclimatised. Evidently without a rapprochement with the Hindus ; without Hinduism Buddhism could not have arisen. But Buddha himself was not a renegade from

Hindu teaching as the modern would has thought but rather a renegade from Zoroastrianism.

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই এই মত যে, হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। উহা একেবারে অভিনব ধর্ম্ম নহে। তবে বৈদিক ধর্ম্মের সহিত উহার কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকায় উহা হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের সাংখ্যমতের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহা হইতেও বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য বৌদ্ধেরা বলিতেন, তাঁহাদের ধর্ম্মমত সাংখ্যমতকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম নব ধর্ম্ম। হিন্দু বৈদিক ধর্ম্মকেই মানিয়া থাকে, তাহা হইতে যে ধর্ম্মের এক চুলও পার্থক্য আছে, হিন্দু তাহা কদাচ মানিবে না। এই জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। নতুবা বৌদ্ধধর্ম্ম সহসা আকাশ হইতে পতিত হয় নাই। অন্ততঃ তাহা যে সাংখ্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাংখ্যমতকে অনার্য্য মত বলিলেই তাহা যে অনার্য্য হইয়া যাইবে, এ কথা, বোধ হয়, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। "কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা" বলিয়া আমরা যে সাংখ্যমতের প্রবর্ত্তকগণকে প্রত্যহ তর্পণ করিয়া থাকি, তাঁহারা যদি অনার্য্য হন, তাহা হইলে, প্রকৃত আর্য্য কাহারা ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধে সাংখ্যেরও যে মত, বেদান্তেরও প্রায় তাহাই। তাহা হইলে, বেদান্তকেও অনার্য্য মত বলিতে হয়। এ সকল যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

মুষ্টিযোগ।

(৩)

আমরা দুঃখে পড়িলে একবারে সার বুঝিয়া লই যে, আমাদের দুঃখের জন্য আমরা দায়ী নহি, অন্যে আমাদের দুঃখদাতা, তা মানুষই হউক বা মানুষেতর অন্য কোনও পদার্থই হউক। আমার দুঃখবিধানের ভার পরের হাতে; অতএব আমি পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিব। আমি

নিরপরাধ ভোক্তা মাত্র। দেখ, বাহ্যজগৎ আমাকে নিরন্তর আঘাত করিতেছে, কিন্তু আমি নিতান্ত ভাল মানুষ বলিয়া কেবল রক্ষণ পক্ষে (defensive) এ আছি। তবে তোমরা আমাকে কখনও কখনও আক্রমণ পক্ষে (offensive) এ থাকিতে দেখ, সেটা তোমাদের দেখিবার ভুল; সেটা হইতেছে ভালমানুষ আমার (defensive offensive) এ থাকা,—আমার আত্মরক্ষার্থ বাহ্যজগতের প্রতি অভিঘাত করা মাত্র। আমি ভাল মানুষ, দোষ পরের।

পৃথিবীর বার আনা লোক এই মতে সায় দিয়া থাকে। বাস্তবিক, আমিই দায়ী, আমিই দোষী, ইহা স্মরণ করিতে হইলেও আমার শিরঃকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরূপ। আমার দুঃখ আমারই হাতে। সংসারক্ষেত্রে আমার প্রারব্ধ ও অনাগতকে ভাবিবার প্রয়োজন নাই, অতীতকে ভাবিবার প্রয়োজন আছে। ফলতঃ আমার গোটা 'আমি'কে যদি আমি ক্রিয়মাণ কর্ম্মে ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারি, "শরবৎ তন্ময়ঃ" হইতে পারি, তবেই আমি বুঝিতে পারিব, ভবিষ্যৎ আমারই হস্তে। আর, সেরূপ ভাবে কর্ম্মরত হইতে না পারিলে, আমি কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না, অর্থাৎ সত্যের সাক্ষাৎ পাইব না। যে সত্যের কথা বলিতেছি, তাহাকে কর্ম্মসম্বন্ধে তাৎকালিক সত্য বলা যাইতে পারে। তাহা তুলনায় তাৎকালিক মিথ্যাপদার্থের সঙ্ঘর্ষে আসিয়া, কিছুকালের জন্য তদুপরি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া, আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়া থাকে মাত্র। যে দুঃখের কথা পাড়িয়াছি, তাহা এই জাতীয় সত্য। তাহা ব্যবহারিক দুঃখ, তাৎকালিক দুঃখ।

(৪)

এই জাতীয় দুঃখের মধ্যে আমরা একটা বড় দুঃখে পড়িয়াছি, তাহার নাম খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত দুঃখ,—মিথ্যাভাষায় যাহাকে অন্নকষ্ট বলা হইয়া থাকে। ১৯০৬ সাল হইতে চাউলের দর বাড়িতে আরম্ভ করিয়া, যে দেশে একদিন উহা হয়ত কিছুকালের জন্য টাকায় সাত মণ বিকাইয়াছিল, তাহা এখন সাত টাকায় এক মণে দাঁড়াইয়াছে। এ দুঃখের নিদান নির্ণয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর যাবৎ গবেষণার ফলোগত অক্টোবর মাসে (১৯১৪) একটি উপাদেয় বিবরণী বাহির করিয়াছেন। তাহার মর্ম্মার্থ শুনাইবার পূর্ব্বে পাঠককে একবার দেশীয় পণ্ডিতদিগের মীমাংসা শুনাইব

পণ্ডিতগণের মীমাংসা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। তাঁহাদের মতে ইংরাজ-রাজত্ব ও তাহার মেরুদণ্ডস্বরূপ অবাধ-বাণিজ্য হইতেই আমাদের অন্নকষ্টের উৎপত্তি। আমরা অতি-অতি-অতি রাজভক্ত প্রজা কি না, তাই হাসিমুখে সে কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছি। যদি ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া ইউরোপ বাকী পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করিত, তাহা হইলে বিধাতার বিধানে কোনও দোষ হইত না; কেননা, সেরূপ ঘটিলে, হয়ত এ দেশে আবার সায়েস্তা খাঁ ও যশোবন্ত সিংহের পুনরাবির্ভাব হইয়া টাকায় আট মণ চাউল বিকাইত। এই শ্রেণীর লোকে হয়ত ভাবিয়া থাকেন, কেবল খাদ্যদ্রব্যের সুলভতার সহিত সভ্যতার নিত্যসম্বন্ধ। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, যে জমীতে ধান হইতে পারে, তাহাতে পাটের চাষ হওয়ায় প্রয়োজনানুরূপ ধান হইতেছে না এবং অবাধ-বাণিজ্যের ফলে দেশের সমস্ত শস্য দেশে থাকিতে না পারায় অবশিষ্ট শস্য সমস্ত লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। অতএব রপ্তানী বন্ধ ও পাটের চাষ কমাইয়া দিলে চাউল গম শস্তা হইবে। কিন্তু আহার্য্য শস্য অত্যধিক সুলভ হইলে, কৃষীবল ও শ্রমজীবিগণের অবস্থার অবনতি অনিবার্য্য; ইহা সামাজিক ইতিহাসের একটি প্রমাণিত তথ্য। ইহাদের পতনে এবং তথাকথিত 'ভদ্র-লোক'দিগের উত্থানে পরিণামে কিরূপ বিষম ফল জন্মে, তাহা ইউরোপের ইতি-হাস-পাঠকের অবিদিত নাই। সৌভাগ্যক্রমে ৺গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয়ের মত এ সকল মত হইতে ভিন্ন, এবং তাহা হইবারই কথা। তিনি বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টকর্তৃক প্রয়োজনাধিক রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হওয়াতেই চাউল প্রভৃতির দর বাড়িয়াছে। এ কথাটি বার্ত্তাশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত। যদি টাকা শস্তা হয়, তবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িবেই।

এখন গবর্ণমেণ্টের তথ্যসংগ্রহের মর্ম্মার্থ শুনাইব। গোখলে মহোদয়ের মত গবর্ণমেণ্টের সংখ্যাসংগ্রহ দ্বারা অপ্রমাণিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রমাণ করিয়াছেন, ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। দেশের বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য-ঘটিত সমস্যার সমাধানজন্য যে সকল সিদ্ধান্তনির্ণায়ক সূত্র (data) ধরিয়া এক একটি মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়, গোড়ায় সংখ্যাসংগ্রহের (statistics) সহিত সেগুলি ভালরূপ মিলাইয়া গবর্ণমেণ্ট যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা এই—

দেশের বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য, রেলপথে একস্থানের মাল স্থানান্তরে

চালানরূপ বিরাট ব্যাপার, পোষ্ট আপিসের হাত দিয়া টাকার (রৌপ্যমুদ্রার) চলাফেরা, যৌথকারবারঘটিত ব্যাপারের মধ্য দিয়া টাকার চলাফেরা, সরকারী খাজনাখানার হাত দিয়া টাকার চলাফেরা, ব্যবহারার্থ ক্রীত চাউল, গম ও কয়লার মূল্যবাবদ টাকার চলাফেরা এবং পাট ও তূলার চাষ বাবদ খরচের জন্য টাকার চলাফেরা—এক কথায় দেশব্যাপী বিরাট কারবারের গতি যেরূপ দ্রুতবেগে চলিয়াছে, তাহার তুলনায় প্রয়োজনানুরূপ রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত হইতেছে না।

অতঃপর বৈদেশিক রপ্তানীর জন্য ও পাটের চাষঘটিত অশুভ ফলের কথা। সংখ্যাসংগ্রহ হইতে জানা গিয়াছে যে, যে বৎসর সুবৎসর, সেবারেও সমস্ত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ লইয়া বিচার করিলে, রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা চারির অনেক উপরে উঠে বটে; কিন্তু পাঁচের নীচে থাকে, অর্থাৎ দেশজাত একশত মণ আহার্য্য শস্যের মধ্যে পঁচানব্বইএর কিছু অধিক শস্য দেশেই থাকিয়া যায়। কিন্তু, যে শস্য দেশেই থাকিয়া গেল, তাহা দেশবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত কি না, তাহার উত্তরে আমরা জানিতে পারিয়াছি, (১) লোকসংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, সে অনুপাতে আহার্য্য শস্য জন্মাইয়া মজুত থাকিতেছে না,—হয় আগামী ফসলের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়,—না হয় প্রদেশান্তর হইতে শস্য আমদানী করিতে হয়। অপিচ, (২) পাট, তূলা প্রভৃতি ধান-গমের স্থান কতকটা অধিকার করিয়াছে, ইহাও সত্য; কিন্তু সেরূপ জমীর পরিমাণ (সমস্ত ভারতবর্ষ ধরিয়া বিচার করিলে) অতি অল্পই।

আসল কথা এই যে, আহার্য্য শস্যের মূল্যবৃদ্ধি দ্রব্যের স্বল্পতাজনিত নহে। রাজশাসনব্যাপার যেমন অল্পে অল্পে নিষ্কেন্দ্রীভূত বা Decentralized হইতেছে, বাণিজ্য ব্যাপার তদপেক্ষা শত গুণ দ্রুতগতিতে রেল, ষ্টীমার, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সাহায্যে এক এক বৃহৎ কেন্দ্র হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে প্রসারিত হইতেছে। বর্ম্মার চাউল দিব্রুগড়ে, গোরক্ষপুরের চিনি দক্ষিণাপথে, পাটনার দাইল মার্গারেটায় চালান হইতেছে, ইত্যাদি। ইহাতে লাভবান্ কে? কৃষক, বণিক্ এবং জমীদার। ক্ষতি কাহার? যাঁহার আয় নির্দ্দিষ্ট,—"ভদ্রলোকের।"

ইহা হইল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা। ইহার উপর বৈদেশিক রপ্তানীর বিষয় চিন্তনীয়। 'পরাণ মণ্ডল' এখন পাঁচ মাস ধরিয়া সমান পরিশ্রম

ও সমান খরচ করিয়া ষোল টাকায় বিক্রেয় পাটের চাষ না করিয়া চারি টাকায় বিক্রেয় ধানের চাষ করিতে বাধ্য নহে। ধরিয়া লইলাম, জোরজবরদস্তি করিয়া পরাণ মণ্ডল দ্বারা পাটের জমীতে ধানের আবাদ করান হইল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। গত ২২ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে রেল ও ষ্টীমার লাইন দ্বিগুণিত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে মালের ভাড়া অতিরিক্ত কমিয়াছে; ফলে, বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য এই দুই পথ প্রসারিত হওয়ায় পরাণ মণ্ডলের অবস্থা ফিরিয়াছে। পরাণের অবস্থার উন্নতির সহিত জমীদারের উন্নতির নিত্যসম্বন্ধ। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জানিতাম, বাঙ্গালার কোনও বড় জমীদারের আয় ছিল বার লক্ষ, এখন তাঁহার আয় পনর লক্ষ। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট কারবারে সাধারণ ব্যবসাদারেরা প্রায় সকলেই উন্নতির পথে চলিয়াছেন, তাঁহাদের কষ্ট নাই। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, মিস্ত্রী মজুর শ্রেণী বা wage-earners। তাঁহাদের আয় অনির্দ্দিষ্ট অথচ ব্যয় প্রায়শঃ নির্দ্দিষ্ট ও নিম্নতম (minimum) আয়ের ভিত্তির উপর ব্যবস্থাপিত। তাঁহাদেরও কষ্ট নাই।

বাকী রহিলেন যাঁহারা, তাঁহাদের নাম "ভদ্রলোক"। অনেকে ভুল করিয়া, তাঁহাদিগকে মধ্যবিত্ত লোক বলিয়া থাকেন। শব্দটা ভাষার অনুবাদ, ভাবের অনুবাদ নহে। Middle-class বা Mediocrity এখনও এ দেশে জন্ম গ্রহণ করে নাই, সম্ভবতঃ সেদিন অনেক দূরে। এ স্থলে "ভদ্রলোক" অর্থে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ-সাধারণ বুঝিতে হইবে, এবং সেইজন্য শব্দটি যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহার করিলাম। মাননীয় Beatson Bell মহাশয়ও Bhadralogs শব্দ ব্যবহার করিয়া লেখকের দলীল-স্থানীয় হইয়াছেন। যাহা হউক, তথাকথিত অন্নকষ্ট কেবল ইঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। চা-বাগিচা প্রভৃতির ফেরত কুলী, নিরতিশয় অলস ও অকর্ম্মণ্য চাষার প্রভৃতি এবং ভিক্ষোপজীবীদিগের কথা এখানে আলোচ্য নহে।

এই ভদ্রলোক নামধেয় লোকেরা মেধাবী ও অল্পবিস্তর শিক্ষিত। ইহারা স্বদত্ত বিবিধ উপাধিভূষিত,—যথা, দেশের মেরুদণ্ড, Enlightened India, দেশের ভরসা, সমাজের মুখপাত্র ইত্যাদি। শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, সমাজসংস্কার, সমাজ-সংহার, ছোট-বড়

চাকরী, স্বদেশী আন্দোলন, স্বদেশী ডাকাইতি, রাজবিদ্রোহসৃষ্টি, ব্রিটিশ-বিদ্বেষ-বীজ-বপন প্রভৃতি সমস্তই প্রায়শঃ ইঁহাদেরই হস্তে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, আচার্য্য, অগ্রদানী, মোটের উপর যাঁহাদের গলায় সূতা আছে বা ভবিষ্যতে ঝুলিবে, তাঁহারাও এই শ্রেণীর মধ্যে। গবর্ণমেণ্টের মতে ভারতের এই শ্রেণীর লোকেই দেশব্যাপী বাণিজ্যের ফলে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখে পড়িয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কথাই সত্য। অপিচ, এ দুঃখ স্বকৃত।

এরূপ ঘটিল কেন? ইহার দুইটিমাত্র উত্তর দিব।

(১) ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যখনই কোনও সমাজে মানুষের দোষ-গুণ-বিচার-শক্তি (Critical powers) তাহাদের গঠনক্ষম বুদ্ধিশক্তিকে (Constructive powers) অতিক্রম করিয়াছে, গঠনক্ষম বুদ্ধির উপর বিচার-বিতর্ক রাজত্ব করিয়াছে, কর্ম্মের স্থানে মেকিজ্ঞান প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তখনই সে সমাজে নানা উপসর্গ দেখা দিয়াছে। এই গঠনক্ষম বুদ্ধিশক্তির উদ্দীপনা কিসে হয়, তাহা Logic of facts ব্যতীত Logic of words বলিতে পারিবে না। তথ্যের বিচার ব্যতীত ন্যায়ের বিচারে সে মহাশক্তি জাগিবে না।

(২) গড়িবার বাসনা জাগিলে গোড়ায় পরস্পরের Normal conditionটা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হয়। আমার প্রকৃত অবস্থার ভাব বা রূপতা কি, তাহা চিনিয়া লইয়া আমাকে জোর করিয়া সে অবস্থায় অবস্থাপিত হইতে হইবে; তাহার উপর পায়ে ভর দিয়া জোর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে;—এখন যেমন পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া গুল্‌ফদ্বয় শূন্যে রাখিয়াছি, এরূপ ডিঙিমারা অভ্যাসটি ছাড়িতে হইবে। এই স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ কি,—না, 'আমি'কে বে-সুরে না রাখিয়া সুরে রাখা। যেমন কণ্ঠযন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকল যন্ত্রেরই এক একটা স্বাভাবিক সুর আছে, সেইরূপ সকল অবস্থারই এক একটা স্বাভাবিক ভাব আছে। অবস্থার এই সূক্ষ্ম স্বাভাবিক ভাব জিনিসটি চেনা কঠিন, এবং এইজন্য অনেকে আপনার ওজন বুঝিয়া চলা, আর আপনাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা, এ দুয়ের অভেদ কল্পনা করিয়া মহাভ্রমে পতিত হন। যে এস্রার যন্ত্রটি "ডি" শার্পে বাঁধিলে অতিমিষ্ট শুনায়, তাহার নীচে কি উপরে বাঁধিলে তেমন মিষ্ট লাগে না; তাহাকে

সঙ্গতের খাতিরে 'ঈ-শার্পে' বাঁধিয়া সঙ্গত করিলে, তাহার তার কাটিতে না পারে, (ওজন ছাপাইতে না পারে) কিন্তু 'ডি-শার্পে' বাঁধা তাহার স্বাভাবিক সুর তখন শুনিতে পাওয়া যাইবে না। আমাদের "ভদ্রলোকেরা" ইহা বুঝেন না; বুঝিলে দশটাকা মণ চাউলের বাজারেও তাঁহারা কষ্ট পাইবেন না। সুখের বিষয়, এখনও এদেশে তেলী, তাম্বূলী, শৌলক (শাহাজাতি), ধীবর, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিরা হঠাৎ বেসুরে বাজিয়া উঠিতে চান না; সুরে বাজিতে ভাল-বাসেন। তাঁহারা আছেনও ভাল। বৃদ্ধ ঈসপের কথা keep to your place, and your place will keep you আড়াই হাজার বৎসরেও পুরাতন হইল না।

বাঙ্গালার এই ভদ্রলোকদিগের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষেরও কম; ধরিয়া লইলাম পঞ্চাশ লক্ষ। লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটির উপর। সিলেট, কাছাড় বাদ পড়িবে; উহারা আসামের ভিতর। তবেই দেখ, যাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের অনুপাত $\frac{১}{৯}$। ইহাই অস্বাভাবিকতার প্রমাণ। অতএব, "ভদ্রলোক-দিগের" 'অন্নকষ্ট' স্বকৃত। সুখের বিষয়, তাঁহারা স্বকৃতভঙ্গ হইলেও, দেশের $\frac{৮}{৯}$ লোক স্বকৃতভঙ্গ হইতে ইচ্ছুক নহেন। পদ্মা আমাদিগকে—এই 'ভদ্রলোক-দিগকে' এই মতি দিন, যেন আমরা ন্যায়ের বিচার ছাড়িয়া তথ্যের বিচারে সফলতা লাভ করিতে শিখি।

শ্রীগুরুদাস সান্যাল।

দায়।

(মালতীমাধব হইতে)

সখি, এ যে বড় দায় সখি, এ যে বড় দায়,
এক সাথে তার সব নাহি পাওয়া যায়।
চুমিতে আনন রুদ্ধ রসনার দ্বার
কথা নাহি কহা সাথে যে তাহার,
হয় না বসিলে অঙ্কে, গাঢ় আলিঙ্গন,
আলিঙ্গনে বন্ধ হয় চরণ-সেবন।
চুম্বন চলে না আর হেরিতে তাহায়
এ কি হলো দায় সখি, এ কি হলো দায়,
বদন লুকাই যদি তার স্বর্গ-বুকে,
কথা নাহি শুনা যায় বধির যে সুখে।
অঙ্গ সংবাহনে যেন প'ড়ে যাই দূরে,
কণ্ঠ জড়াইলে মোর জ্ঞান যায় উড়ে।
তাহার পরশে সুখে চোখে আসে জল,
হেরিতে পাই না আর বদন-কমল,
সোহাগে চেতনা মোর সব টুটে যায়
এ কি হলো দায় সখি, এ কি হলো দায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

কবিকথা।

(ভাস)

প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ।

(২)

অবন্তিরাজপুত্রী বাসবদত্তার সহিত বিবাহের কথা লইয়া প্রতিদিনই রাজাদিগের নিকট হইতে উজ্জয়িনীতে দূত আসিতেছে; কিন্তু রাজা মহাসেন প্রদ্যোত সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছেন না। অদ্য কাশীরাজের নিকট হইতে উপাধ্যায় জৈবন্তি দূতস্বরূপে আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সামান্য দূতের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া অতিথিসৎকারের তুল্য সমাদরেরই ব্যবস্থা হইল।

কাঞ্চুকীয় বাদরায়ণ প্রতীহারকে তাঁহার প্রবেশ করাইয়াই সৎকার করিতে বলিয়া পাঠাইলেন; তিনি কিন্তু রাজার কন্যাপ্রদানে মনোযোগ না দেওয়ায় কিছু চিন্তিত হইয়া পড়েন। কাঞ্চুকীয় বলিতেছিলেন,—"প্রত্যহই ত দেখিতেছি, অনুরূপ বংশ রাজকুল হইতে কন্যার বিবাহের জন্য দূত আসিতেছে। কিন্তু মহাসেন কাহাকে প্রত্যাখ্যানও করিতেছেন না, অনুগ্রহও দেখাইতেছেন না, ইহার কারণ কি? অথবা কন্যাপ্রদানে দৈবই বলবান্। কৈ, এখনও পর্য্যন্ত ত তাহার আবির্ভাব দেখিতেছি না। দূত সকল বিবাহ বিষয়ে অবহিত হইলেও তাহার প্রকাশও ঘটিতেছে না। তাই দৈবের প্রতীক্ষা করিয়া অবন্তিরাজ অন্য রাজগণের গুণাবলী জানিয়াও যেন জানিতেছেন না।

সেই সময় রাজা সম্মাননীয় অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া সেই দিকে আসিতে-ছিলেন; তিনি দূর্ব্বাঙ্কুর তুল্য স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলমণি-কিরণে উজ্জ্বল স্বর্ণ-কেয়ূরে ভূষিত বাহুমূলে শোভিত হইয়া, কার্ত্তিকেয়ের শরবন হইতে নির্গমনের ন্যায় ঘন কনক-তালবন হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। কাঞ্চুকীয় তখন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজা আসিতে আসিতে বলিতেছিলেন,—"আমার অশ্বখুরে উত্থিত পথধূলি

নৃপতিগণ ভৃত্যস্বরূপে মুকুটতটে বিলগ্ন করিয়া বহন করিতেছে। কিন্তু ইহাতে আমার সন্তোষ জন্মিতেছে না। কারণ, গুণশালী হস্তিজ্ঞান-গর্ব্বিত বৎসরাজ আমার নিকট অবনত হইতেছে না।"

তাহার পর তিনি কাঞ্চুকীয় বাদরায়ণকে আহ্বান করিলে, তিনি আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন। রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জৈবন্তিকে প্রবেশ করান হইয়াছে কি?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"হাঁ, প্রবেশ করাইয়া রীতিমত সৎকার করা হইয়াছে।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তুমি যখন রাজবংশের শুভাভিলাষ, তখন ন্যায্য কার্য্যই করিয়াছ, সমাগত ব্যক্তিদের পূজা করাই উচিত।"

তাহার পর তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"কন্যা-প্রদানের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে, সকলে পরের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।"

পরে কাঞ্চুকীয়কে দেখিয়া বলিলেন,—"বাদরায়ণ, তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, তুমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ।"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিয়া কহিলেন,—"এমন কিছু নয়, তবে কন্যাদানসম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায় আছে বটে।"

তখন রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাতে সঙ্কোচ কেন? ইহা সর্ব্বসাধারণেরই বিধি; কি বলিতে ইচ্ছা কর, বল।"

সে সময় কাঞ্চুকীয় বলিতে লাগিলেন,—"আমি বলিতেছি কি, প্রত্যহ অনুরূপবংশ রাজকুল হইতে কন্যার বিবাহের জন্য দূত আসিতেছে। কিন্তু মহাসেন কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না, অনুগ্রহও দেখাইতেছেন না, ইহার কারণ কি?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বাদরায়ণ, শুন তবে,—বরগুণের অতিলোভে ও বাসবদত্তার প্রতি অতিস্নেহে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রথমে শ্লাঘ্য কুলেরই আকাঙ্ক্ষা করিতে হয়, তাহার পর সদয় কুলের; এ গুণটি মৃদু হইলেও বলবান্; পরে আকৃতিতে কান্তি আছে কি না দেখিতে হয়, অবশ্য তাহা গুণের জন্য নহে; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ভয়ে। অবশেষে প্রবল বীর্য্যের পরীক্ষা করা। তাই বলিয়া যুবতীগণ যে পরিপাল্যা নহে, তাহা নয়।"

কাঞ্চুকীয় বলিয়া উঠিলেন,—"মহাসেন ব্যতীত আর কোথাও ত এ সকল গুণ দেখি না।"

রাজা বলিলেন,—"সেই জন্যই চিন্তা করিতেছি,—পিতার যত্নেই কন্যার বর-সম্পত্তি লাভ হয়। শেষ দৈবের আয়ত্ত। ইহাই দেখা গিয়াছে, অন্য প্রকার নহে; কন্যাপ্রদানকালে মাতারাই দুঃখিতা হইয়া থাকেন। সেই জন্য দেবীকে ডাকিয়া আন।"

কাঞ্চুকীয় তখন রাজার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন। রাজা আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"কাশীরাজ দূত প্রেরণ করায়, বৎসরাজকে ধরিতে শালঙ্কায়নের যাওয়ার কথাই ভাবিতেছি; আজিও পর্য্যন্ত সে ব্রাহ্মণ কোন সংবাদ পাঠাইল না কেন? বৎসরাজের মন তাহার লীলাতেই বদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু তাহার সচিবেরা যে সচেষ্ট রহিয়াছে।"

সেই সময়ে মহিষী অঙ্গারবতী পরিচারিকাগণের সহিত তথায় আসিলেন এবং রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজা তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তিনি উপবেশন করিয়া, রাজা তাঁহাকে কি আজ্ঞা করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা বলিলেন,—"বাসবদত্তা কোথায়?"

রাণী উত্তর দিলেন,—"উত্তরদেশ হইতে আগতা বৈতালীর নিকট নারদীয়া বীণা শিখিতে গিয়াছে।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি তাহার সঙ্গীত-শাস্ত্রে ইচ্ছা জন্মিল?"

রাণী কহিলেন,—"কাঞ্চনমালাকে বীণাযোগ্যা করিতে দেখিয়া তাহার শিখিতে অভিলাষ হইয়াছে।"

'বাল্যকালের সদৃশ কার্য্য বটে' এই বলিয়া রাজা নীরব হইলেন। রাণী তখন বলিলেন,—"আমি একটা কথা বলিতে চাহিতেছি।"

রাজা 'কি বলিতে ইচ্ছা কর' জিজ্ঞাসা করিলে, রাণী উত্তর দিলেন,— "বাসবদত্তার জন্য একজন আচার্য্য চাই।"

সে কথায় রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহার বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন আবার আচার্য্যের প্রয়োজন কি? তাহার পতিই তাহাকে শিখাইবে।"

রাণী কহিলেন,—"সে কি? এখনই কি আমার কন্যার বিবাহসময় হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন,—"প্রত্যহ 'ইহার বিবাহ দিলে না' বলিয়া অনুরোধ করিয়া এখন আবার দুঃখিত হইয়া উঠিতেছ কেন?"

রাণী উত্তর দিলেন,—"বিবাহ দিতে ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু তাহার বিয়োগ সহ্য করিতে পারিতেছি না; তাহা হইলে কাহাকে দান্ করিবে বলিয়া কথা দিয়াছ?"

রাজা বলিলেন,—"এখনও পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

শুনিয়া রাণী কহিলেন,—"এখনও পর্য্যন্ত নয়?"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"কন্যা অদত্তা শুনিয়া লজ্জা উপস্থিত হয়, আবার দত্তা শুনিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে; ধর্ম্ম ও স্নেহের মধ্যে পড়িয়া মাতারা দুঃখিত হইয়াই পড়েন; বাসবদত্তার এক্ষণে শ্বশুর-সেবার কাল হইয়াছে, আবার কাশীরাজের উপাধ্যায় আর্য্য জৈবন্তি দূত হইয়া আসিয়াছেন; রাজার চরিত্রেও প্রলোভিত করিয়া তুলিতেছে।"

রাণী তখন অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, তিনি রাজার কথায় লক্ষ্য না করায়, রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"অশ্রুপতনে আকুলা হইয়া কিরূপেই বা আমার কথায় মন দিবেন? যাহা হউক, ভাল করিয়াই বলি।"

তাহার পর রাণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"শুনিতেছ, আমার সহিত সম্বন্ধস্থাপনের জন্য রাজারা সব আসিতেছেন।"

রাণী উত্তর দিলেন,—"বেশী কথার প্রয়োজন কি? যেখানে দান করিলে দুঃখিত হইতে না হয়, সেইখানেই অর্পণ কর।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"এক্ষণে নানা লীলায় দুঃখ প্রকাশ হইতেছে, পরে আবার তিরস্কার শুনিতে হইবে, তাই বলিতেছি, দেবি, স্থির কর। শুন তবে, মগধেশ্বর, কাশীরাজ, বঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মিথিলা ও মথুরা প্রভৃতির রাজারা নানা গুণের প্রলোভন দেখাইয়া আমার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন ইঁহাদের মধ্যে কে তোমার কন্যার পাত্র হইবে?"

সহসা কাঞ্চুকীয় আসিয়া কহিল,—"বৎসরাজ।"

বিরক্তিসহকারে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"বৎসরাজের কথা কি বলিতেছ ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"মহাসেন, ক্ষমা করুন, প্রিয় সংবাদ জানাইবার জন্য আমি বলার ক্রম রাখিতে পারি নাই।"

রাজা বলিলেন,—"কিসের প্রিয় সংবাদ ?"

সেই সময়ে রাণী রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলেন। সহর্ষে রাজা তাঁহাকে কহিলেন,—"প্রিয় সংবাদটি না শুনিয়া যাইতেছ কেন ? ব'স।"

রাজার বিরক্তিতে কাঞ্চুকীয় তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ভূতলে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে উঠিতে বলিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আদেশ দিলেন। তখন কাঞ্চুকীয় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অমাত্য শালঙ্কায়ন বৎসরাজকে ধৃত করিয়াছেন।"

সহর্ষে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কি বলিলে তুমি ?"

কাঞ্চুকীয় আবার বলিলেন,—"অমাত্য শালঙ্কায়নের হস্তে বৎসরাজ ধৃত হইয়াছেন।"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"কে ? উদয়ন ? শতানীকের পুত্র ? সহস্রানীকের পৌত্র ? কৌশাম্বীর অধীশ্বর ? গন্ধর্ব্বের ন্যায় ধনশালী ? সেই বৎসরাজ ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"তিনিই বটেন।"

রাজা আবার বলিলেন,—"তাহা হইলে যৌগন্ধরায়ণ কি মরিয়াছে ?"

কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"না, তিনি ত কৌশাম্বীতেই আছেন।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে বৎসরাজ ধৃত হয় নাই।"

কাঞ্চুকীয় বলিলেন,—"আমার কথা বিশ্বাস করুন।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"করতলে মন্দর পর্ব্বত ঘূর্ণনের ন্যায় আমি তোমার কথিত উদয়নের গ্রহণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যুদ্ধে রিপু সকল যাহার শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং যাহার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মত, আমাদের নিকট শব্দ করিতেছে, তাহার গ্রহণ অসম্ভব।"

কাঞ্চুকীয় তখন সভয়ে বলিতে লাগিলেন,—"মহাসেন, প্রসন্ন হউন। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মহাসেনের নিকট মিথ্যা বলি নাই।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"থাক ও কথা, শালঙ্কায়ন কাহাকে প্রিয় দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"কোন লোক পাঠান নাই, তবে বেগশীল খর রথে বৎসরাজকে অগ্রে করিয়া নিজেই আসিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"এইরূপে আসিয়াছেন, বেশ, তাহা হইলে আজ হইতে অক্ষৌহিণী বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করুক; প্রচ্ছন্ন দূত প্রেরণে রত রাজারাও নিঃশঙ্ক হইয়া উঠুক; এই সংক্ষিপ্ত কথা। আজই আমি যথার্থ মহাসেন হইলাম।"

তখন মহিষী বলিয়া উঠিলেন,—"কি, অমাত্য তাহাকে আনিয়াছেন ? ইহার জন্যই আর কাহাকেও বাসদত্তা দিতে ইচ্ছা করি নাই।"

রাজা বলিলেন,—"এখন সে আবার যুদ্ধে পরাজিত শত্রু।"

তাহার পর কাঞ্চুকীয়কে শালঙ্কায়ন কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন; কাঞ্চুকীয় ভদ্র দ্বারে আছেন বলিয়া উত্তর দিলেন। তখন আবার রাজা তাঁহাকে কহিলেন,—"মন্ত্রী ভরত রোহককে গিয়া বল যে, কুমারগণের সংকারবিধিতে বৎসরাজকে অগ্রে করিয়া অমাত্যকে পাঠাইয়া দেন।"

কাঞ্চুকীয় যাইতে উদ্যত হইলে, রাজা আবার তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—"বৎসরাজকে যাহারা দেখিতে আসিবে, তাহাদিগকে যেন সরাইয়া দেওয়া না হয়; পুরবাসিগণ তাহার নিজ কার্য্যের জন্য পূর্ব্বে তাহার কথা শুনিয়াছে। এক্ষণে উৎসবে বদ্ধ অন্তর্নিহিত-ক্রোধ সিংহের ন্যায় সেই শত্রুকে দেখুক।"

'আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য' বলিয়া কাঞ্চুকীয় চলিয়া গেলেন। রাণী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এই রাজবংশে অনেক অভ্যুদয় দেখিয়াছি, কিন্তু মহাসেনের এমন প্রীতিকর ব্যাপার আর ঘটিয়াছে কিনা, স্মরণ হইতেছে না।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বৎসরাজকে ধৃত করিয়া আনার ন্যায় এরূপ প্রীতিকর ব্যাপার পূর্ব্বে শুনিয়াছি বলিয়াও মনে পড়িতেছে না।"

রাণী রাজাকে বলিলেন,—"আচ্ছা, সকল রাজাই ত আমাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপনের জন্য লোক পাঠাইতেছেন, কিন্তু কৈ, ইহার কোন লোক ত পূর্ব্বে আসে নাই ?"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"মহাসেন শব্দকেই সে গ্রাহ্য করে না। সম্বন্ধের ইচ্ছা ত দূরের কথা।"

মহিষী বলিলেন,—"গ্রাহ্যই করে না, সে কি বালক না মূর্খ?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বালক বটে, কিন্তু মূর্খ নহে।"

রাণী কহিলেন,—"তবে কিসে উহাকে গর্ব্বিত করিয়া তুলিতেছে?"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"যাহাতে রাজর্ষি নামের প্রকাশ ও যাহা বেদমন্ত্রে অভিহিত, সেই ভারতবংশ উহাকে গর্ব্বিত করিয়াছে, আর বংশপরম্পরাক্রমে আগত গান্ধর্ব্ববেদও উহার দর্পের কারণ। বয়স-সহজ রূপ উহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, আর কোনরূপে উৎপন্ন পৌরজনের অনুরাগ ইহার মনে একটা বিশ্বাসও জন্মাইয়াছে।"

শুনিয়া রাণী কহিলেন,—"তাহা হইলে ত ইহাতেই সমস্ত বর-গুণ দেখিতেছি; তবে কার প্রতি কৃপাচরণে দোষ ঘটিল?"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"অস্থানে বিস্মিত হইয়া উঠিলে কেন? অগ্নি যেমন প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিত্যক্ত হইলেও সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিয়া, পরে দহনের কোন বিষয় না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, আমার প্রদীপ্ত শাসনও সেইরূপ।"

সেই সময়ে কাঞ্চুকীয় আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"আপনার উপদেশানুযায়ী সৎকারের পর শালঙ্কায়ন প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে, ভরতকুলের উপভুক্ত ও বৎসরাজকুলে দর্শনীয় ঘোষবতী নামে বীণারত্ন মহারাজকে প্রদান করিবে।"

এই বলিয়া কাঞ্চুকীয় রাজাকে বীণাটি দেখাইলে, তিনি তাহা হস্তে লইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"জয় মঙ্গলকে গ্রহণ করিলাম।"

তাহার পর বলিতে লাগিলেন,—"এই কি সেই ঘোষবতী? যে শ্রুতিমুখে মধুরা ও স্বভাবতই রাগযুক্তা? অগ্রভাগ ও তন্ত্রী নখমুখে ঘর্ষিত হওয়ায় যে ঋষিবাক্যগতা মন্ত্রবিদ্যার ন্যায় সবলে গজহৃদয়কে বশ করিয়া ফেলে? যুদ্ধ-বিজিত রত্ন প্রিয়জনে ভোগ করিলেই প্রীতি জন্মে। কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র গোপালক অর্থ-শাস্ত্রের গুণগ্রাহী, আর কনিষ্ঠ অনুপালক ব্যায়ামশালী ও গান্ধর্ব্ব-দ্বেষী; তাহা হইলে এক্ষণে ইহা কাহাকে অর্পণ করা যায়?"

অবশেষে তিনি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি, বাসবদত্তা বীণা-শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে না ?"

রাণী উত্তর দিলেন,—"হাঁ ?"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হইলে তাহাকেই এইটি দাও।"

রাণী বলিয়া উঠিলেন,—"বীণাটি দিলে সে আবার উন্মত্তা হইয়া উঠিবে।"

তাহাতে রাজা বলিলেন,—"এখন খেলা করুক, শ্বশুরকুলে তাহা সুলভ হইবে না।"

রাজা কাঞ্চুকীয়কে বৎসরাজ কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অমাত্যের সহিত প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।

রাজা আবার বলিলেন,—"কুমারদের মধ্যে তাহাকে রাখা হইয়াছে ত ?"

কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"বিনয় পরিত্যাগের জন্য পাদে ও অঙ্গে অনেক আঘাত পাওয়ায়, তাঁহাকে স্কন্ধে বহনযোগ্য শয্যায় করিয়া মাঝের ঘরে রাখা হইয়াছে।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"অনেক আঘাত লাগিয়াছে ? অসংস্কৃত তেজেরই এই দোষ। আমি সে সময় নৃশংসের ন্যায়ই উপেক্ষা করিয়াছি।"

তাহার পর তিনি মন্ত্রী ভরত রোহককে বৎসরাজের ব্রণ-প্রতীকারের জন্য কাঞ্চুকীয়কে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। কাঞ্চুকীয় যাইতে উদ্যত হইলে, রাজা আবার তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—"ইহার সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, সৎকার পরিত্যাগ করা না হয়; প্রীতি হইল কি না, তাহা আকারেই জানিতে হইবে, পূর্ব্ব-যুদ্ধের কথা না বলা হয়; হাঁচি প্রভৃতি পড়িলে, আশীর্ব্বাদ করা চাই; সময়ানুরূপ প্রশংসাবাক্যে তুষ্ট করার প্রয়োজন।"

'যে আজ্ঞা' বলিয়া কাঞ্চুকীয় গমন করিলেন; কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তিনি জানাইলেন,—"পথেই বৎসরাজের ব্রণের প্রতীকার করা হইয়াছে; অন্যান্য প্রতীকারের এখনও সময় আসে নাই। মধ্যাহ্নবেলা উপস্থিত হইয়াছে।"

রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে বীরমানী এক্ষণে কোথায় ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"ময়ূরযষ্টি মুখে।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"সে স্থান অবস্থানের যোগ্য নহে; আতপ-নিবারণের জন্য তাহাকে মণি-ভূমিকায় লইয়া যাইতে বল।"

কাঞ্চুকীয় রাজাদেশপালনে চলিয়া গেলেন; আবার ক্ষণকাল পরেই আসিয়া কহিলেন,—"আপনার আদেশ সমস্ত প্রতিপালিত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রী ভরত-রোহক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন,—"বুঝিয়াছি; বৎসরাজের সৎকারে তাঁহার রুচি হইতেছে না। এ যে তাঁহারই নীতির পরিভ্রম। সে যাহা হউক, আমিই তাহাকে নিকটে আনিতেছি।"

শুনিয়া রাণী বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি সম্বন্ধ নিশ্চয় করিলে?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"এখনও কিছুই স্থির করি নাই।"

রাণী বলিলেন,—"তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই; আমার কন্যা বালিকা।"

রাজা কহিলেন,—"তোমার যাহা অভিরুচি, এক্ষণে অভ্যন্তরে যাও।"

'যাহা আদেশ করিতেছ' বলিয়া রাণী পরিচারিকাগণের সহিত চলিয়া গেলেন। রাজা চিন্তা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"উহার গর্ব্বের জন্য পূর্ব্বে শত্রুতা হইয়াছিল, এক্ষণে আনীত হওয়ায় সে আমার বধ্য; কিন্তু যুদ্ধ-ক্লিষ্ট, সংশয়স্থ ও বিপন্ন হওয়ার কথা শুনিয়া আমিও সংশয় চিন্তা করিতেছি।"

(৩)

উদয়নের উদ্ধারের জন্য যৌগন্ধরায়ণ নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি রুমণ্বান্ ও বিদূষক বসন্তককে লইয়া প্রচ্ছন্নবেশে উজ্জয়িনীতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন; অবন্তিরাজের অন্তঃপুরে ও বাহিরে চার পুরুষ-দিগকেও প্রচ্ছন্নভাবে রাখার ব্যবস্থা হইল; চারিদিক্ হইতে সংবাদ লইয়া কিরূপে বৎসরাজকে মুক্ত করা যায়, তাহারই চেষ্টা হইতে লাগিল। ওদিকে আবার উদয়ন বাসবদত্তার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন, কাজেই বাসবদত্তাকে লইয়া যাওয়ারও ব্যবস্থা করিতে হয়; এই সকল কার্য্যের পরামর্শের জন্য তাঁহারা একস্থানে মিলিত হইবার অভিপ্রায় করিলেন।

উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দির চির-প্রসিদ্ধ; তথায় সাধারণে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে; সেইখানেই তাঁহারা মিলিত হইবেন, স্থির হইল। প্রথমে বিদূষক প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া চামুণ্ডা-পূজার ব্রাহ্মণ-ভোজনের মধ্যে বসিয়া গেলেন। ভোজনের পর কিছু মোদক মন্দিরপীঠে রাখিয়া স্বর্ণ-

মাস দক্ষিণাগুলি গণিয়া লইতেছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহার মোদকগুলি অপহৃত হয়। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আর সে সকল দেখিতে পান নাই। জনৈক ভিক্ষুককে তিনি একটি মোদকদানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; সে কিন্তু আর তাঁহার অনুসরণ করে নাই; প্রাচীরের উচ্চতার জন্য কুক্কুরের প্রবেশও অসাধ্য; পথিকদিগের নিকট অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদি থাকায় তাহাদেরও লোভের সম্ভব নাই; কাজেই সে মোদকগুলা কোথায় গেল, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। হস্তে দুই একটি যাহা ছিল, তখন তিনি তাহাই খাইতে আরম্ভ করিলেন ও উদ্গার তুলিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে হইল মহাদেব চামুণ্ডার পূজার দ্রব্য বলিয়া বোধ হয় মোদকগুলি লইয়া থাকিবেন; তিনি অনেক রূপের অভিনয় করিয়া থাকেন। তাহার পর তিনি স্থির করিলেন, সত্য সত্যই মহাদেব মোদক চুরি করিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার পাদমূলে দেখা যাইতেছে। তখন তিনি শিবের নিকট তাহা চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন, মোদকগুলি চিত্রিত। তিনি যতই মাজিতে আরম্ভ করিলেন, ততই সেগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে তিনি জল লইয়া মাজিতে ইচ্ছা করিলেন, নিকটে তড়াগে জলও ছিল। শিব ও তিনি উভয়েই মোদকে নিরাশ হন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় জন্মিল; তাহার পর বসন্তক 'মোদক মোদক' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

মোদকের জন্য বিদূষক যে সমস্ত কথার প্রয়োগ করিতেছিলেন, বাহিরে লোকে তাহা তাঁহার মোদক হরণের কথা বুঝিলেও, তাহার অভ্যন্তরে কিছু তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শেরই কথা ছিল। বিদূষকের চীৎকার শুনিয়া সেই সময়ে একজন উন্মত্ত সেইদিকে আসিতে লাগিল; তাহার নিকটও কতকগুলি মোদক ছিল। তাহাকে দেখিয়া বিদূষকের বোধ হইল যেন, বর্ষাকালের ফেনিল মলিন রাজপথের জল ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার হস্তের মোদক নিজের মনে করিয়া বিদূষক দণ্ডাঘাতে তাহার মস্তক ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করিলেন।

এ উন্মত্ত আর কেহই নহে, স্বয়ং যৌগন্ধরায়ণই সেই বেশে আসিতেছিলেন; লোকে কিন্তু তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়াই মনে করিল। উন্মত্তে ও প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণে তখন মোদক লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহারই মোদক বলিয়া ঐগুলি চাহিতে লাগিলেন, উন্মত্ত তাহা দিতে অস্বীকার করিল। সে বলিতে

লাগিল,—"আমারেই মোদক খাইতে জিহ্বা হইতে জল পড়িতেছে, তোমাকে দিব কেন ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"না দিলে তোমাকে প্রহার করিব।"

তখন উন্মত্ত বলিয়া উঠিল,—"কে আমায় প্রহার করে ? এই মোদকগুলিই আমাকে রক্ষা করিবে ; নানাবেশে ভূষিত হইয়া এগুলি প্রীতি জন্মাইতেছে। রাজপথে মূল্য দিয়া কিনিয়াছি ; তবে বাসি হওয়ার জন্য কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে বটে।"

এ কথাগুলির মধ্যেও তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ নিহিত ছিল ; প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ বিদূষক তখনও পর্য্যন্ত মোদক চাহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"ইহার জন্য আমাকে উপাধ্যায়ের নিকট যাইতে হইবে।"

উন্মত্ত কহিল,—"আমাকেও ইহার জন্য যোজনশত যাইতে হইবে।"

প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল,—"তবে কি তুমি ঐরাবত ?"

উন্মত্ত উত্তর দিল,—"আমি ঐরাবত ত বটি ; তবে দেবরাজ যে কেবল আমার উপর আরোহণ করেন, তাহা নহে। আমি শুনিয়াছি যে, তিনি ধারা-শৃঙ্খল পাদরজ্জুতে বদ্ধ হইয়াছেন, তাই বিদ্যুৎ-কশাঘাতে তাড়না ও বায়ুর ঊর্দ্ধভ্রমণে পরিভ্রমণ করিয়া মেঘবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।"

ইহাতে গুপ্ত পরামর্শের কথা ছিল। মোদক না পাইয়া বিদূষক 'অব্রহ্মণ্য অব্রহ্মণ্য' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। উন্মত্তও 'ইন্দ্রবদ্ধ, ইন্দ্রবদ্ধ' বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে এক শ্রমণ ব্রাহ্মণোপাসক, 'ভয় নাই ভয় নাই' বলিয়া প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণকে অভয় প্রদান করিতে করিতে সেখানে আসিলেন ;—এই শ্রমণই রুমণ্বান্।

বিদূষক তখন বলিয়া উঠিলেন,—"চন্দ্রের আগমনে সকল নক্ষত্রই আসিল, ব্রাহ্মণ-ভাবকে ধিক্। কারণ, শেষে কিনা শ্রমণে অভয় দিতে লাগিল ?"

প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ তখন শ্রমণকে মোদকের কথা বলিলে, শ্রমণ মোদক দেখিতে চাহিলেন, সেও দেখাইতে লাগিল। শ্রমণ তখন তাহাতে থু থু দিয়া বলিলেন, —"উন্মত্তোপাসক, এগুলা ফেলিয়া দাও ; কস্তূরীর মত শাদা, বধূচ্ছিদ্রের ন্যায় কোমল, ব্যঞ্জনযুক্ত, সুরার ন্যায় মত্ততাদায়ক—এগুলা খাইও না ; খাইলে ক্ষয় জন্মিবে।"

তাহার পর শ্রমণ শাপের ভয় দেখাইলে, উন্মত্ত তাঁহাকে মোদকগুলি দিল; শ্রমণ তখন ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রভাবের কথা বলিলেন, এবং কহিলেন,—"এগুলা খাইতে দাও এবং এগুলার দ্বারা আমাকে স্বস্তি বলাও।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ, আমার দ্রব্যেই আমি স্বস্তি বলিব? আমি একজন পোষ্যবর্গযুক্ত ব্যক্তির নিকট এগুলি প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম; আর এইগুলা তোমার উপঢৌকন হইবে? তাহা হইলে তাহার ত বেশ মঙ্গল ঘটিবে দেখিতেছি।"

সেই সময়ে উন্মত্ত অগ্নিগৃহের দিকে যাইতেছিল; তখন মধ্যাহ্নও উপস্থিত হইয়াছিল; পূর্ব্বাহ্নেও এ সকল স্থান শূন্য থাকে। বিদূষক দক্ষিণাগুলি চত্বরে রাখিয়া সেই দিকে চলিলেন; যাইতে যাইতে তিনি বলিতেছিলেন,—"একজনের শাটির প্রয়োজন—আর একজনের মূল্যের।"

কথাটির মধ্যে তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শের ইঙ্গিত ছিল; তাহার পর যৌগন্ধরায়ণ, বসন্তক ও রুমণ্বান্ তিন জনেই অগ্নিগৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; সেখানে গিয়াই যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে বলিলেন,—"বসন্তক, এ স্থান শূন্য দেখিতেছি; এক্ষণে তোমরা দুজনেই আমাকে আলিঙ্গন কর।"

বসন্তক ও রুমণ্বান্ তাহাই করিলে, যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাদিগকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া বসিতে বলিলেন। তখন সকলে সেখানে উপবেশন করিলেন।

তাহার পর যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার সহিত স্বামীর দেখা হইয়াছে কি?"

বিদূষক 'হইয়াছে', বলিলে যৌগন্ধরায়ণ বলিতে লাগিলেন,—"অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর রক্ষা রাত্রিতে কিছুই হইল না; এক্ষণে দিবসই পালন করা যাক; দিন গেলে রাত্রিরই প্রতীক্ষা করিতে হয়; শুভ প্রভাতে আবার দিবসের চিন্তা আসে; যাহারা ভবিষ্য অশুভের আশঙ্কা করে, তাহারা যে সময়টি কাটিয়া যায়, তাহাই দেখিয়া সুখ লাভ করে।"

সে কথায় রুমণ্বান্ কহিলেন,—"আপনি যথার্থই বলিয়াছেন—"দিনরাত্রি সমান হইলেও বন্ধন প্রভৃতিতে রাত্রিতেই বহু দোষ ঘটে এবং সংসারে যাহারা ব্যবহারে অসাধ্য বা বিরাগবিশিষ্ট এবং প্রভাতে যাহাদের দোষ দৃষ্ট হয়, সেই সকল শত্রুর রাত্রিই ভয়ের কারণ।"

যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বসন্তক, স্বামীর সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে পারিয়াছ কি ?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"অনেক দিন হইল দেখা হইয়াছিল ; আজ আবার চতুর্দ্দশী—স্নানের সময় দেখা পাইয়াছিলাম।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে আজ কি স্বামী স্নান করিতে পারিয়াছেন ?"

'পারিয়াছেন' বলিয়া বিদূষক উত্তর দিলেন।

তখন আবার যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন কি ?"

তাহার উত্তরে বিদূষক বলিলেন,—"প্রণামমাত্রেই তাহা সারিয়াছেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে স্বামীর বেশ সমাদরের অবস্থা ঘটিয়াছে দেখিতেছি ; যিনি স্নান করিয়া দৈবকার্য্যে ব্রতী হইলে পুণ্যাহ-ঘোষণার বিরামের পর পটহ নিনাদিত হইত, কালপ্রভাবে এক্ষণে তাঁহার তিথিপূজায় দৈব প্রণামে চলিত শৃঙ্খলই শব্দ করিতেছে।"

সে কথায় রুমণ্বান্ বলিলেন,—"এক্ষণে আপনার যত্নে স্বামীর তিথিসৎকারাদি ঘটুক।"

তাহার পর যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বসন্তক, তুমি গিয়া আবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কর এবং তাঁহাকে জানাও যে, পূর্ব্বে যে ভাবে পলায়নের কথা হইয়াছে, আগামী কল্যই তাহার প্রয়োগকাল। নলাগিরি হস্তীর স্নানস্থানের তৃণশয্যায় ওষধি রাখিয়া মন্ত্রৌষধির দ্বারা তাহাকে ব্যামোহিত করা হইবে ; ধূপ সজ্জিত করিয়া অনুকূল মারুতে তাহার গন্ধ বিস্তার করা যাইবে ; তাহার পর উহার রোধের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ হস্তীর অহঙ্কার উত্তেজিত করিতে হইবে। হস্তীদিগের ভয়োৎপাদনের জন্য হস্তিশালার নিকটস্থ গৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ; সেই সময়ে দেবমন্দিরে স্থাপিত শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে এবং হস্তিগণের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিবে ; কল্য যখন তাহারা চীৎকার করিতে থাকিবে, তখন প্রদ্যোত স্বামীর শরণ লইবে ; শত্রুর আদেশে কারাগার হইতে বাহির হইয়া, স্বামী ঘোষবতী গ্রহণ করিয়া নলাগিরিকে বশীভূত করিয়া ফেলিবেন। তাহার পর তাহাতে আরোহণ করিয়া

ধাবিত হইবেন। নলাগিরি যখন বেগে গমন করিতে থাকিবে, তখন শত্রু-সৈন্য-গণের মন কেবল তাহার অনুধাবনেই বদ্ধ রহিবে। তাহার পর স্বামী সিংহের গর্জন নিবৃত্ত হইতে না হইতে বিন্ধ্যারণ্য অতিক্রম করিয়া একদিনেই বিপদে, বলে ও স্বনগরে তিন প্রকার দশা প্রাপ্ত হইবেন এবং যে হস্তিবাহনে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতেই আবার বাহির হইয়া আসিবেন।"

শুনিয়া রুমণ্বান্ বলিয়া উঠিলেন,—"বসন্তক, এখন কি ভাবিতেছ ?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"আমি ভাবিতেছি, আপনাদের এ যত্ন বিফলই হইবে।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বান্ উভয়েই বলিয়া উঠিলেন,—"কৈ, আমরা ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না।"

বিদূষক বলিলেন,—"আগে আমি জানিয়াছি, পরে আপনারাও জানিবেন।"

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"কিরূপে কার্য্যবিপত্তি ঘটিবে ?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"বৎসরাজের আত্মকার্য্যে।"

যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কিরূপ ?"

বিদূষক তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তবে শুনুন, যে কালাষ্টমীটা কাটিয়া গিয়াছে, সেই দিনে রাজকন্যা বাসবদত্তা ধাত্রীর সহিত কন্যাদর্শন দোষের নয় বলিয়া অনাচ্ছাদিত শিবিকায় জনপূর্ণ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া কারাগারের সম্মুখ দিয়া ভগবতী যক্ষিণীর স্থানে দেবকার্য্য করিতে যাইতে-ছিলেন; স্বামীও সেই সময়ে কারারক্ষকের অনুমতিক্রমে কারাগারের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহকেরা স্কন্ধ পরিবর্ত্তন করায় সহসা শিবিকাও তথায় স্থির হইল। অমনি স্বামী প্রাণ খুলিয়া রাজকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর ?"

বিরক্তি সহকারে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহার পর আবার কি ? রাসলীলার জন্য কারাগার এক্ষণে প্রমদবন হইয়া উঠিয়াছে।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তাহার প্রতি নিশ্চয়ই স্বামীর অভিলাষ জন্মে নাই।"

বিদূষক কহিলেন,—"অনর্থ যে দল বাঁধিয়াই আসে, তাহা এইরূপেই জানিবেন ?"

তখন যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বান্‌কে বলিলেন,—"সখে, আত্মা স্থির কর, এই বেশেই জরায় পৌঁছিতে হইবে।"

বিদূষক কিন্তু বলিতে লাগিলেন—"রাজা বলিয়া দিয়াছেন, যৌগন্ধরায়ণকে বলিও, তাঁহাদের উপায় আমায় ভাল লাগিতেছে না; প্রদ্যোতের অপমানই আমার চিন্তার বিষয়; আমাকে যেন তাঁহারা কামুক মনে না করেন, অপমানের প্রতিশোধই অন্বেষণ করিতে হইবে।'

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"ইহা শত্রুর উপহাসের কথা, বুদ্ধির নির্লজ্জতা, সুহৃজ্জনের সন্তাপের কারণ। দেশ-কাল বিবেচনা না করিয়াই স্বামী ললিত কামনা করিতেছেন। শিবিরে আচ্ছাদিত স্বহস্তরচিত ভূমিই দর্প উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। তবে পদের শৃঙ্খলশব্দ কন্দর্পকে আশ্রয় করিতেও পারে। কারণ, কারাগারে রক্ষিপুরুষগণের নিকট রাজশব্দ শুনিয়া কে মন্মথ-পটু হইয়া না উঠে?"

তখন বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"স্নেহ দেখান ও পুরুষকার প্রকাশ করা হইল; এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তুমি বসন্তক, তোমার এরূপ বলা উচিত নহে। যিনি সুহৃজ্জনের সঙ্গে থাকিয়া সময় বুঝিতে পারেন না, সেই দুঃখে ও মদনে সন্তপ্ত স্বামীকে আমরা কি করিয়া পরিত্যাগ করিব?"

শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে এরূপ ভাবেই জয়লাভ করিতে হইবে।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"সেও ভাল।"

বিদূষক কহিলেন,—"ভাল বটে, যদি লোকে না জানিতে পারে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"লোক দিয়া আমাদের কোনই কাজ নাই; স্বামীর উপকারের জন্যই আমরা চেষ্টা করিতেছি।"

বিদূষক বলিলেন,—"কিন্তু তিনি যে কিছুই জানিতে পারিতেছেন না।"

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"কালে জানিতে পারিবেন।"

বিদূষক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কোন্ কাল?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"যে সময়ে এই আরম্ভের শেষ হইবে।"

শুনিয়া বিদূষক বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনি কারাগার হইতে রাজাকে ও অন্তঃপুর হইতে রাজকন্যাকে বাহির করিয়া আনুন।"

রুমণ্বান্ উত্তর দিলেন,—"এখনই তুমি তাহা দেখিবে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"সত্য সত্যই দুজনাকেই আনিব। এই আমি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অর্জ্জুনের সুভদ্রার ও নাগের পদ্মলতার ন্যায় রাজা যদি রাজকন্যাকে হরণ না করেন, তাহা হইলে আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি। আরও বলিতেছি, যদি ঘোষবতী, আয়তলোচনা বাসবদত্তা ও রাজাকে হরণ না করিতে পারি, তাহা হইলে আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি।"

সেই সময়ে বাহিরে শব্দ শুনা গেল। যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে তাহা জানিতে বলিলে, বিদূষক বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"বেলা গত হওয়ায় লোকজন সঞ্চরণ করিতেছে; তবে এক্ষণে আমরা কি করিব?"

রুমণ্বান্ উত্তর দিলেন,—"অগ্নিগৃহের চারিটি দ্বার রহিয়াছে, এক্ষণে আমরা আপনাদের মিলন ভঙ্গ করি।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"না না, আমাদের মিলন অভিন্ন, শত্রুরই মিলন ভঙ্গ হউক।"

তাহার পর তাঁহারা সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ আবার উন্মত্তের ন্যায় রাজপথে ছুটিতে লাগিলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রাহু চন্দ্র গিলিতেছে, চন্দ্রকে ছাড়,—চন্দ্রকে ছাড়,—যদি না ছাড়, মুখ চিরিয়া ছাড়াইয়া লইব। একটা দুষ্ট অশ্ব বন্ধন ছিঁড়িয়া দৌড়াইতেছে, এই যে রাস্তার চৌমাথা,—এখানকার পূজার দ্রব্যগুলি খাই; বালকপ্রভু সকল, আমাকে তাড়না করিও না; আমাকে নাচিতে বলিতেছ? এই যে নাচিতেছি। আবার লাঠি লইয়া তাড়না করিতে আসিলে? তাহা হইলে আমিও তাড়না করিব।"

এইরূপ ভান করিতে করিতে তাঁহারা আপন আপন গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মধুদাদা।

গিরিবালা-নাম্নী জনৈক বিধবা ব্রাহ্মণী শিশুপুত্র লইয়া একটি গণ্ডগ্রামে বাস করিতেন। বিধবার সংসারে ঐ শিশুপুত্রটি ব্যতীত আর অন্য কেহ ছিল না। শিশুর বয়স পাঁচ বৎসর; প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, শিশু পিতৃহীন হইয়াছে। পিতা আদর করিয়া পুত্রের নাম "যদুনন্দন" রাখিয়াছিলেন। মা, কখন "যদু" ও কখন "যাদু" বলিয়া ডাকেন। পুত্রটিকে পঞ্চম বৎসরে উপনীত হইতে দেখিয়া, গিরিবালা একটু চিন্তিত হইলেন। "ব্রাহ্মণ-সন্তান,—পুত্রটিকে একটু লেখা-পড়া না শিখাইলে সমাজে আদর পাইবে না;—তায় আমার স্বামী একজন গণ্যমান্য পণ্ডিত ছিলেন। ছেলেটিকে মূর্খ সাজাইলে তাঁহার বংশগৌরব কমিবে।" ইত্যাদি চিন্তায় গিরিবালা সময় সময় বিচলিত হইতেন।

কিন্তু চিন্তা করিলে কি হইবে? গ্রামে বিদ্যালয় বা পণ্ডিত নাই। এ কালের রমণীদের মত তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই যে, ছেলেটিকে স্বয়ং বিদ্যাশিক্ষা দেন। অমুক গ্রামে প্রায় ক্রোশান্তরে একটি বিদ্যালয় আছে,—পথিমধ্যে নিবিড় অরণ্য,—তাহাতে আবার নানাবিধ হিংস্র জন্তুর ভয়। ওরূপ দুর্গম পথে শিশু পুত্রকে একাকী পাঠাইতে স্নেহময়ী জননীর অন্তঃকরণে সাহস হয় কি? সুতরাং গিরিবালা স্থির করিলেন, "ছেলেটি একটু বড়ই হোক্, তার পর দেখা যাইবে।"

দেখিতে দেখিতে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। মায়ের পালনে শুক্ল-শশি-কলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া যদু সাত বৎসরে পদার্পণ করিলেন। গ্রামের সকলেই বলে,—"যদুর মত শান্ত, শিষ্ট, চোক্‌জুড়ান ছেলে কখনও দেখা যায় না; এমন ছেলেকে একটু লেখা-পড়া শিখাইলে সোনায় সোহাগা হয়।" গিরিবালারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা,—যাহাতে যদু পণ্ডিত হইয়া পিতার কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু আর ত সময় নষ্ট করিলে চলিবে না; অতএব এবার ছেলেটিকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিতেই হইবে। গিরিবালা এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন।

গিরিবালার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না হইলেও তাঁহাকে অন্ন-বস্ত্রের জন্য ভাবিতে হইত না। স্বামী যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই উত্তমরূপে সংবৎসর গুজরান হইত। তদ্ভিন্ন যজমানদের বাড়ী হইতেও বৎসর বৎসর কিছু পাওয়া যাইত। দেবদ্বিজ ও দীন-দুঃখীর সেবায় গিরিবালার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কখনও কোন অতিথি বিষণ্ণ-বদনে তাঁহার বাড়ী হইতে প্রত্যাগমন করিতেন না।

পণ্ডিত আনিয়া গিরিবালা একটি শুভদিন ধার্য্য করাইলেন। ঐ দিবসে যদুকে বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে। দেখিতে দেখিতে নিরূপিত শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। স্নানান্তে আহারাদি সমাধা করিয়া, যদু বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গিরিবালার বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির বিগ্রহ ছিলেন। স্বামী জীবিত থাকিবার সময় তিনি নিজেই ঐ বিগ্রহের সেবাকার্য্য চালাইতেন। এখন অন্যগ্রামস্থিত একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া নিত্যপূজা সমাধা করিয়া যান। গিরিবালা তজ্জন্য উক্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। যদুর বিদ্যালয়ে যাইবার সময় হইলে, গিরিবালা তাঁহাকে রাধা-কৃষ্ণের নিকট ভক্তিভাবে প্রণাম করিতে বলিলেন এবং নিজেও যদুর সহিত বিগ্রহ-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

গললগ্নবাসে রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া, যদু মায়ের নিকট দাঁড়াই-লেন। অশ্রুপূর্ণ-লোচনে করুণ-কণ্ঠে গিরিবালা বলিলেন,—“প্রভো! অভা-গিনীর পুত্র আপনার চরণকমলে প্রণাম করিতেছে, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পিতার মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া, আপনার শ্রীচরণসেবায় নিযুক্ত থাকে। এই অবোধ পুত্র ও আপনারা ব্যতীত এ অভাগিনীর আর কেহ নাই। আপনি দয়া করিয়া এই শিশুটি আমাকে পালন করিতে দিয়াছিলেন, আমি যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছি। এক্ষণে শিশুকে রক্ষা ও জ্ঞান প্রদান করা প্রভৃতি বিষয়ে আপনারই হাত; ইহাতে আমার অধিকার বা ক্ষমতা নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া শিশুকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে কেহই এই শিশুর অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। আর যদি আপনি তাহাতে উদাসীন থাকেন, তবে প্রভো! গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও আমি পুত্রকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। তাই আপনার শ্রীচরণ ভরসাতেই শ্বাপদ-সঙ্কুল

নিবিড় কান্তারস্থিত দুর্গম পথে যদুকে একাকী পাঠাইতে সাহসী হইয়াছি। স্বামিন্! দাসীকে কৃপা করিয়া যে ধন দিয়াছিলেন, আজ দাসী সেই ধনকে আপনারই পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছে। দাসীর অর্পিত রত্নটি প্রসন্নমুখে গ্রহণ পূর্ব্বক সম্পদে বিপদে তাহাকে রক্ষা করিয়া চরিতার্থ করুন।" গিরিবালা সপুত্র রাধাকৃষ্ণ-সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করিলেন।

রাধাকৃষ্ণ ও জননীর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, যদু আত্মীয়বৎ জনৈক পরিচিত লোকের সহিত বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। মায়ের চক্ষু পুত্রস্নেহে বাষ্পপূর্ণ হইল। পুত্রের মঙ্গলকামনায় গিরিবালা অতি কষ্টে তাহা সংবরণ করিলেন এবং যদুকে বলিয়া দিলেন,—"বৎস! বিপদসময়ে বা বিদ্যালয়ে যাতায়াত সময়ে শ্রীহরির নাম স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইও না।"

জননীবাণী শিরোধার্য্য করিয়া যদু রাস্তা অতিক্রম করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া যদু পুনরায় সন্ধ্যাসময়ে মাতার চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহাহ্লাদে মুখচুম্বন করিয়া গিরিবালা পুত্রকে কোলে লইলেন।

পূর্ব্বাহ্নে আহার করিয়া যদু বিদ্যালয়ে গমন করেন ও সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত লোকটিও যদুর সঙ্গে গিয়াছিল; কিন্তু রাস্তা পরিচিত হওয়ায় যদু আর লোকটিকে সঙ্গে লয়েন না। এইরূপে মাসাধিক কাল অতীত হইল। এক দিন যদু বিদ্যালয়ের ছুটীর পর বাড়ী প্রত্যাগমন করিতেছেন—সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। ক্রমশঃ যদু আসিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি শ্রুতিবিনোদন শ্রীহরির গান গাহিয়া মৃদুমন্দগতিতে রাস্তা অতিক্রম করিতেছেন। যদুর বীণাবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে নিঃসৃত হইতেছে:—

"স্মর হৃদি-মাঝে, দেবকী-আত্মজে,
কোটি দ্বিজরাজ, (যাঁর) শ্রীপদ-প্রান্তে।
শ্রীমদবদন, যশোদা-জীবন, ভজ অনুক্ষণ, শ্রীরাধা-কান্তে॥
যে চরণ-পদ্মে জন্মে ভাগীরথী, সে চরণ-পদ্ম স্মর দিবারাতি,
লভিবে মুকতি, পাবে দিব্যগতি, রবিসুত-ভয় প'লাবে অন্তে
কমলা-সেবিত, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত, দেবর্ষি, শঙ্কর সদা লালায়িত,
সে চরণ-ধনে, ভাব যোগে ধ্যানে, ভকতি পরাণে;—
পারিবে চিন্তে॥"

মধুর! মধুর! মধুর! সবই মধুর! যদুর সুমধুর কণ্ঠস্বরে মধুর হরিনাম গানে কত যে মধুরতা আনিতেছে, তাহা শ্রীহরি-পরায়ণ ভক্তবৃন্দ ব্যতীত আমরা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যদুর মধুর স্বভাবে, মধুর সৌন্দর্য্যে সন্ধ্যাকালীন মধুর প্রকৃতি প্রতিভাত হইয়া, আরও মধুরতাময় করিয়াছে। সন্ধ্যা হইল, হরিনাম-নিমগ্ন যদুর সে দিকে দৃষ্টি নাই। যদু অরণ্যের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা দুইটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া, অরণ্য হইতে বাহির হইল। যদুর তখনও চৈতন্য হয় নাই,—তখনও তিনি ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে হরিনাম গান করিতেছেন। পথিমধ্যে একটি শিলাখণ্ডে যদুর পায়ে আঘাত লাগিল। অমনি যদুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন,—তাঁহার সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া লম্ফ-ঝম্প প্রদান করিতেছে।

যদুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন,—"আমার সময় পূর্ণ হইয়াছে,—আর এ বিপদ হইতে নিস্তার নাই।" অমনি জননীর আদেশবাণী যদুর স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন,—"বিপদবারণ নারায়ণ! দুঃখিনীতনয়কে কি এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন না? দয়াময় শ্রীহরি! যদি আমাকে দয়া না হয়, তবে প্রভো! আমার অভাগিনী জননীকে প্রবোধ দিও। মা গো! তোমার যদু"—ব্যাঘ্র দুইটি যদুকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া, যদুর মুখে আর কথা বাহির হইব না। ভয়ে বিহ্বল হইয়া যদু মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে যদুর চৈতন্যসঞ্চার হইল। নয়ন মেলিয়া দেখিলেন,—একজন সুচারু কান্তিবিশিষ্ট ব্যাধরূপী বলিষ্ঠ যুবক তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আয়ুধপূর্ণ তূণ এবং সম্মুখে সুদৃঢ় কার্ম্মুক স্থাপিত রহিয়াছে। অদূরে ব্যাঘ্র দুইটি শরবিদ্ধ হইয়া মৃতাবস্থায় নিপতিত। ইহা দেখিয়া যদু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি কোন্ মহাত্মা পুরুষ এই দারুণ বিপদে আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন?"

ব্যাধরূপী যুবক বলিলেন,—"বৎস! আমি তোমারই মত একজন মানুষ, তবে তুমি ছেলেমানুষ আর আমি বয়স্থ যুবক।"

যদু। মহাশয়ের নাম, ধাম বলিতে কোন আপত্তি আছে কি ?

যুবক। না, কোন আপত্তি নাই। তোমার মা যেমন আদর করিয়া তোমাকে যদু বলিয়া ডাকেন, আমার মায়েও তেমনি আমাকে মধু বলিয়া ডাকেন। বৎস! আমি তোমার জন্য এখন এই অরণ্যমধ্যেই বাস করিতেছি।

যদু। মহাত্মন্! আপনি আমাকে কিরূপে জানিলেন ?

যুবক। সে পরে জানিতে পারিবে। তবে তোমার পিতা আমার খুব পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে কখনও পুত্রের মত স্নেহ এবং কখনও বা পিতার মত ভক্তি করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি সমাতৃক তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তুমি বা তোমার মাতা এ সম্বন্ধে কিছুই জান না। যাও বৎস! সন্ধ্যা ক্রমশঃ তিমিরে পরিণত হইতেছে। তোমার জন্য তোমার জননী অত্যন্ত আকুলিত হইবেন। তোমার কোন ভয় নাই; বিদ্যালয়-গমনাগমনকালে এই অরণ্যমধ্যে আমাকে ডাকিও, আমি আসিয়া তোমাকে অরণ্য পার করিয়া দিব।

যদু। মহাশয়, আমি আপনাকে কি বলিয়া ডাকিব ?

যুবক। অবোধ! তাও তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে? কেন,, আমাদের ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। তুমি আমাকে "মধুদাদা" বলিয়া ডাকিও,- ডাকিবামাত্রেই আমার দেখা পাইবে।

যদু। তবে অদ্যকার মত আমাকে বিদায় দিন, আমি বাড়ী যাই।

যুবক। হাঁ, চল; আমি তোমাকে কোলে করিয়া অরণ্য পার করিয়া দিই। কিন্তু দেখো ভাই! অদ্যকার এই ঘটনা তোমার জননীকে বলিও না। তাহা হইলে, হয় ত তোমার বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; কারণ, তোমার জননী আশঙ্কান্বিত হইয়া তোমার বিদ্যালয়গমন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

যুবক গাত্রোত্থান করিয়া যদুকে কোলে লইলেন এবং নানাপ্রকার শিষ্টালাপ করিতে করিতে যদুকে অরণ্য পার করিয়া দিলেন। যদু তাঁহার কোল পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন,—জননী তাঁহার পথ-পানে অনিমিষলোচনে চাহিয়া আছেন।

যদুকে সমাগত দেখিয়া গিরিবালা কোলের ধনকে কোলে লইলেন। সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া জননী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ রে যাদু! আজ বাড়ী আসিতে এত বিলম্ব কেন? দ্যাখ্ দেখি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

যদু বলিলেন,—"হাঁ মা, আজ বাড়ী আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। আর কোন দিন এরূপ হইবে না।"

পুত্রের মধুর ভাষায় তুষ্ট হইয়া গিরিবালা যদুকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

এইরূপ প্রতিদিন বিদ্যালয়গমন এবং বাড়ী-প্রত্যাগমন-সময়ে যদু অরণ্যে উপস্থিত হইয়া "মধুদাদা গো! মধুদাদা গো!" বলিয়া চীৎকার করেন; অমনি শস্ত্রধারী ব্যাধরূপী যুবক যদুর সম্মুখে উপস্থিত হন এবং যদুকে কোলে লইয়া অরণ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিপদসঙ্কুল রাস্তাটুকু পার করিয়া দেন। এইরূপে আরও কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রিকালে যদুকে কোলে লইয়া গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ রে যদু! তুই প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিস্, কিন্তু তোর পথিমধ্যে, বিশেষতঃ অরণ্যে কোন ভয় হয় না কি?"

যদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"না মা, আর আমার কোন ভয় হয় না।"

"আমার নিকট গোপন না করিয়া সত্য কথা বল, একদিনও পথিমধ্যে ভয় পাও নাই?" গিরিবালা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

যদু নীরব। জননী আরও জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার যদু ফাঁদে পড়িলেন। কখনও মিথ্যাকথা বলেন নাই, আজ কেমন করিয়া জননীর নিকট মিথ্যা কথা বলিবেন? আবার মধুদাদাও সেদিনকার ঘটনা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদুর উভয় সঙ্কট উপস্থিত। জননীর অনুরোধে যদুকে পূর্ব্বের আদ্যন্ত বিবরণ প্রকাশ করিতে হইল। বাঘের আক্রমণ,—তাঁহাতে উদ্ধার,—মধুদাদার কথা,—এবং এখনও যে মধুদাদা প্রত্যহ বন পার করিয়া দেন ইত্যাদি সমস্ত কথাই বলিতে হইল। গিরিবালা যদুর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হতভম্ব এবং পুত্রস্নেহে আকুলিত হইলেন। বিচলিত স্বরে গিরিবালা জিজ্ঞাসিলেন,—

"হাঁ রে যদু! তোর মধুদাদায় আমাকে দেখাইতে পারিবি?"

"কেন পারিব না ? তিনি আমাকে প্রত্যহই অরণ্যমধ্যে দেখা দেন।"

"তবে কল্য বিদ্যালয় যাইবার সময় তোর মধু দাদাকে দেখাইতে হইবে।"

"বেশ মা, আমি কল্য মধুদাদাকে দেখাইব।"

রাত্রি প্রভাত হইল। ভগবান্ অংশুমালী পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। গিরিবালা গৃহের যাবতীয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া যদুর আহারের যোগাড় করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে যাইবার সময় উপস্থিত হইলে, যদু স্নানান্তে আহারাদির কার্য্য সমাধা করিলেন। গিরিবালা আহার করিলেন না। কাননবাসী মধুকে দেখিবার জন্য তিনি পুত্রের অনুগমন করিলেন।

সুমধুর মধু নাম শ্রবণ করিয়া গিরিবালার হৃদয় মধুময় হইয়া গিয়াছে। মধুনামের আস্বাদ পাইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে যদুর মধুদাদাকে দেখিবার জন্য গিরিবালার নয়ন অতিশয় উৎকণ্ঠিত। তাই মুখের আহার পরিত্যাগ করিয়া, তিনি ব্যস্ততার সহিত পুত্রের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। আহা! মধুনামের কি অপূর্ব্ব মাধুরী!

অরণ্যসমীপবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া যদু "মধুদাদা গো! মধু-দাদা গো!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। অন্য দিন দুই তিনবার ডাকিবার পরই মধুদাদা আসিয়া যদুর সম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু আজ এ কি বিড়-ম্বনা! যদু সার্দ্ধ প্রহর ধরিয়া মধুদাদাকে ডাকিলেন,—কই, মধুদাদা ত তাঁহার নিকট আসিলেন না। গিরিবালা পুত্রের মস্তক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ রে অবোধ ছেলে! তোর মধুদাদা কই?"

"মা! আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। প্রতিদিন দুই তিনবার ডাকিলেই মধুদাদা আসিয়া আমাকে দেখা দেন। কিন্তু আজ কেন দেখা দিতেছেন না, তাহা মধুদাদাই জানেন। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি এই অরণ্য-মধ্যেই বাস করেন। অতএব তুমি আমার সঙ্গে এস, আমরা এই বনমধ্যে মধুদাদার অন্বেষণ করি।"

এই বলিয়া যদু অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জননী গিরিবালাও মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অরণ্য পরিভ্রমণ করিয়া মধুদাদাকে ডাকিতে ডাকিতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে যদুর মুখমণ্ডল কালিমাবর্ণ হইল,—

দারুণ তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। কিন্তু যদুর সে দিকে বা পথের দিকে লক্ষ্য নাই। কখন উচ্চকণ্ঠে—কখন বা ক্ষীণকণ্ঠে কেবল মধুদাদা! মধুদাদা! বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছেন। আর গিরিবালা নীরবে পুত্রের অনুগমন করিতেছেন।

"যদু! আর যে পারি না বাপ! কই তোর মধুদাদাকে দেখাইতে পারিলি-না? আর চেষ্টা করাও বৃথা। দেখ, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। অনেক ক্ষণ হইল, দুষ্ট কালসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে। তোর মধুদাদাকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ ধরিয়া বিষের তীব্রজ্বালা সহ্য করিয়াছি। কিন্তু বা-বা! আ—র সহ্য—ক—র্‌তে পারি—না, আ—মা—র দে—হ অ—ব—শ" গিরিবালা আর কথা বলিতে পারিলেন না; ভূপৃষ্ঠের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গ সকল অবশ ও নীলাভ হইল। দেখিতে দেখিতে অভাগিনীর মুখে ও নাসিকারন্ধ্রে লালা বাহির হইল। হায়! সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, হতভাগিনীর প্রাণ-পাখী বুঝি কাননমধ্যে হৃদয়পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল!

বাষ্প-পূরিত-লোচনে গদগদকণ্ঠে যদু বলিলেন,—"প্রভো! দয়াময় হরি! এই পিতৃহীন অনাথকে অবশেষে কি মাতৃহীনও করিলে? অনাথ-নাথ! এই কি তোমার অনাথের প্রতি দয়া? মধু দাদা গো! তুমি যাহাকে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলে,—আজ তোমারই জন্য সে হতভাগ্য যদুর চরম দুঃখ অবলোকন কর। মধুদাদা! এখনও আসিলে না—এখনও দেখা দিলে না? দেখ মধুদাদা! তোমার জন্য মাতাঠাকুরাণী কালের কবলে নিপতিতা,—তোমার দর্শন জন্যই তিনি কাল বিষধর-দংশনে অকালে কালকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। নির্দ্দয়! নিষ্ঠুর! তোমার পাষাণ প্রাণে কি একটুও মমতার উদ্রেক হইল না? নির্ম্মম! তোমার অদর্শন-দুঃখে মাতৃদেবী যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, - দেখ, দেখ মধুদাদা! পরিশেষে এ অভাগাও সেই পথ অবলম্বন করিতেছে।"

এই বলিতে বলিতে যদু পুস্তকের দপ্তর হইতে তাড়াতাড়ি একখানি ছুরি বাহির করিলেন এবং উহা হৃৎপিণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"দেখ নারায়ণ! দেখ স্বর্গবাসী দেবগণ! দেখ মধুদাদা! এই পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের শোচনীয় পরিণাম দর্শন কর।"

"ছি যদু! পাগলের মত এ কি কর ভাই?" যদুর কর্ণ-কুহরে এই পরিচিত মধুর স্বর প্রবিষ্ট হইল। যদু সহসা চাহিয়া দেখিলেন,—মধুদাদা আসিয়া তাঁহার ছুরিকাসহ দক্ষিণ বাহু দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন।

"মধুদাদা এলে?" করুণ-কণ্ঠে যদু জিজ্ঞাসা করিলেন। "কেন মধুদাদা! এই অসময়ে আসিয়া আমার সুখের অন্তরায় হইলে? তোমার জন্য জননী দেবীর কি শোচনীয় অবস্থা, একবার নয়ন মেলিয়া দেখ। পিতৃমাতৃহীন এই হতভাগ্যের আর জীবনে দরকার কি মধুদাদা?"

মধুদাদা বলিলেন,—"যদু! বিচলিত হইও না। তুমি পিতৃহীন হইয়াছ সত্য, কিন্তু মাতৃহীন হও নাই। আমি দেখিতেছি, তোমার জননী অরণ্য পরি-ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। যদু! তোমার জননীকে জাগাও—এখনি উঠিবেন।"

"মা গো! মা! আর ঘুমিও না, উঠ। দেখ মা, মধুদাদা তোমার সম্মুখে উপস্থিত।" যদু গিরিবালার শ্রবণসমীপে মধুরস্বরে এই কথা বলিলেন।

"কি রে যদু! তোর মধুদাদা এসেছেন?" গিরিবালা সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বলিলেন,—"হাঁরে। কই তোর মধুদাদা? এতক্ষণে কি তাঁর আমাদের প্রতি দয়া হ'লো?"

মধুদাদা গিরিবালার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"এই যে মা! আমিই এই কাননবাসী মধু; এবং তোমার যদুর মধুদাদা! তোমরা আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ, সে জন্য আমি অতিশয় লজ্জিত। বিশেষ কার্য্য থাকায় জন্যই আমি যথাসময়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই।"

"তোমার কাজ ত কেবল ভাঙ্গা গড়া! মধুনামধারী শ্রীমধুসূদন! বালক যদুকে চতুরতায় ভুলাইয়াছ, কিন্তু আমাকে ভুলাইতে পারিবে না।" গিরিবালা এই কথা বলিয়া মধুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মধুর পদতলে পড়িয়া করুণস্বরে বলিলেন,—"প্রভো! অভাগিনীর যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

মধু গিরিবালার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"ছি মা! এ কি কর? তুমি আমার মাতৃতুল্য, আর আমি তোমার যদুর মত। এরূপ করিলে যে আমার অপরাধ হবে মা!"

গিরিবালা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"মধুসূদন! আমি যদি তোমার মায়ের মত এবং তুমি আমার সন্তানের মত, তবে সন্তান হইয়া মাকে এত কাঁদাও কেন? এত কষ্ট দাও কেন? বুঝিলাম, মা'কে কাঁদানই তোমার অভ্যাস। ভৃগু-অবতার, রামাবতার, কৃষ্ণাবতার এবং এই কলিযুগের গৌরাঙ্গাবতার তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। সে সব কথা যা'ক্, এখন বল মধু! আজ তোমার এই মায়ের আশা পূর্ণ করিবে কি?"

মধু। হাঁ মা! আমি সত্য বল্‌ছি,—যথাসাধ্য তোমার আশা পূর্ণ করিব।

গিরি। "যদি আমার আশা পূর্ণ করিতে চাও, তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের মত শ্রীরাধাকে বামে ল'য়ে একবার যুগলরূপে দাঁড়াও। আমি নয়ন ভরিয়া সেই রূপ অবলোকন করি।"

মধু। ধন্য গিরিবালা! ধন্য যদু! আজ তোমরা আমার অনন্তমায়াকেও পরাজিত করিলে। আমি ভক্তাধীন,—ভক্তের নিকট সর্ব্বদাই পরাজিত। ভক্তেই আমাকে জানে এবং ভক্তেই আমাকে চিনে। তোমরা অনেক দিন হইতে কায়মনোবাক্যে আমার যুগলমূর্ত্তির সেবা করিয়াছ, অনেক ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছ, আজ সেই পুণ্যবলেই আমাকে অনায়াসে চিনিতে পারিলে। নতুবা কার সাধ্য আমাকে চিনে, আমি দেবদৃষ্টিরও অগোচর। বিদ্যালয়গমনকালে তুমিই আমার হস্তে যদুকে সমর্পণ করিয়াছিলে বলিয়া আমি সর্ব্বদাই গোচরে অগোচরে যদুর নিকট থাকিতাম। গিরিবালা! যদু! তোমরা উভয়ে ক্ষণকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত কর, পরে দৃষ্টিমাত্রেই আমার যুগলরূপ দর্শন করিবে।"

যদু ও গিরিবালা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। পরক্ষণে দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহারা ভক্তবাঞ্ছিত যুগলরূপ নিরীক্ষণ করিলেন। আহা! কি মধুর রূপ। এ যে সেই বৃন্দাবনের রাধাশ্যাম যুগলরূপে দণ্ডায়মান। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত চরণপদ্মে নূপুর,—কটিতটে পীতধড়া,—বক্ষঃস্থলে বনফুলমালা, করকমলদ্বয়ে ও অধরে মুরলী,—শিরোপরি নন্দের বাঁধা মোহনচূড়া, বামে বৃকভানুনন্দিনী রাধা,—তাহাতে আবার বঙ্কিমঠাম, কতই মধুরতা উৎপাদন করিতেছে। এ রূপের শোভা অতুলনীয়। ইহার মধুরতা ভক্ত ভিন্ন অপরে বুঝিতে অক্ষম। তাই

বলি, হে ভক্তগণ! তোমরাই ধন্য, তোমাদের প্রভাবে ভগবান্‌ও খেলার পুতুল। যখন যাহা ইচ্ছা, তখন তাহাই সাজাইতে পার। পাঠক! একবার নয়ন মুদিয়া হৃদয়মাঝে যুগলরূপের ধ্যান কর এবং ভক্তপ্রিয় শ্রীবৃন্দাবনের সেই যুগলরূপ হৃৎ-পদ্মে অবলোকন করিয়া সকলে ধন্য হও।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

তুমি।

তুমি গো আমার পরাণের দেব
জীবনের শান্তি-নিকেতন।
হৃদয়ের তুমি নিভৃত নিলয়ে
সুখবারি কর বরিষণ!
অমরার তুমি নন্দন-কাননে
দেবতার প্রিয় পারিজাত।
নীলিমা গগনে জ্যোতির্ম্ময় বেশে
তুমি পূর্ণিমার নিশানাথ।
হৃদয়-মন্দিরে আরাধ্য দেবতা
তুমি সুধার সাগর গেহে।
বসন্ত কাননে পিকবর তুমি
তুমি মলয়ের বায় দেহে॥
শারদ আকাশে জোছনার সম
স্নিগ্ধ শান্তিভরা সুশীতল।

তুমি প্রভাতের নবীন তপনে
কনক-কিরণ সুবিমল।
তুমি সুখময় শান্তি-সরোবর
আকার কবিত্ব কল্পনার।
বংশীধ্বনি তুমি সুদূর প্রান্তরে
মরুভূমে বীণার ঝঙ্কার।
তুমি সুগভীর নীরব নিশীথে
অপরূপ সঙ্গীতের সুর।
কর্ম্মক্লিষ্ট চিন্তাকুল নিদ্রিতের
মনোহর স্বপন মধুর।
প্রকৃতির বক্ষে মধুর সুষমা
তুমি ধরণীর নব হিয়া।
কাদম্বিনী-কোলে চপলার মালা
তুমি অনন্তের প্রেমছায়া।
তুমি দেবতার অতি আদরের
শোভাময় স্বরগ মন্দার।
কুসুম-কাননে সুস্নিগ্ধ পরাগ
বাসন্তীর সোহাগের হার।
অধীনার তুমি মানস-মন্দিরে
শত জন্ম সাধনার ধন।
হৃদি জলধির অগাধ সলিলে
দুর্ল্লভ কৌস্তুভ রতন।

শ্রীমতী শিবদুর্গা দেবী।

দিল্লী।

মুসলমান-রাজত্ব।

(আবার মোগল শাসনকাল—হুমায়ুন দ্বিতীয়বার)

পারস্যের অধিপতি শাহ তমাস্প হুমায়ুনের প্রতি অনুগ্রহই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু শাহের ভ্রাতা ও দরবারের আরও কেহ কেহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে শাহকে বলায়, তিনি ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইতে আরম্ভ করেন। পরে আবার শাহের ভগিনী হুমায়ুনকে সাহায্য করিতে বলায় শাহ সম্মত হন। কিন্তু তিনি হুমায়ুনকে সিয়ামত গ্রহণ ও হিন্দুস্থানে তাহা প্রচলনের জন্য অনুরোধ করায় হুমায়ুন তাহাই স্বীকার করেন। শাহের পুত্র মোরাদ মির্জ্জার সহিত হুমায়ুন প্রথমে কান্দাহার অধিকারে অগ্রসর হন; আস্করী মির্জ্জা শিশু আক্‌বরকে কাবুলে কামরাণের নিকট পাঠাইয়া দেন। হুমায়ুন ছয়মাস কান্দাহার অবরোধের পর তাঁহার সেনাপতি বৈরাম খাঁকে কাবুলে কামরাণের নিকট সন্ধির প্রস্তাবের জন্য পাঠান। কামরাণ কিন্তু অসম্মত হন। হুমায়ুন তাহার পর কান্দাহার অধিকার করিয়া লন, ও আস্করী মির্জ্জাকে ক্ষমা করেন। হুমায়ুন ক্রমে কাবুলের দিকে অগ্রসর হইলে, হিন্দাল মির্জ্জা তাঁহার সহিত যোগ দেন। হুমায়ুন কাবুল অধিকার করিয়া, তথায় শিশু পুত্র আক্‌বরকে দেখিতে পান। কামরাণ মির্জ্জা কাবুল হইতে গজনীতে পলাইয়া যান, হিন্দাল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। কামরাণ গজনী হইতেও পলায়ন করেন। হুমায়ুন বদাক্‌সানের দিকে অগ্রসর হইলে, কামরাণ আবার কাবুল অধিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু হুমায়ুন তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দেন। তাহার পর কামরাণ হুমায়ুনের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলে, হুমায়ুন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। অতঃপর কামরাণ হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে আবার বদাক্‌সান ও বল্‌খ হুমায়ুনের হস্ত হইতে বিচ্যুত

হয়, উজবেকেরা তাহা অধিকার করিয়া লয়। কামরাণ ও আস্করী মির্জ্জা আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে হুমায়ুন তাঁহাদিগকে দমন করেন।

ইহার পর কামরাণ হিন্দুস্থানে পলাইয়া যান ও সলিম শাহ শূরের আশ্রয় লন। সলিম শাহ তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করায় কামরাণ তথা হইতে পঞ্জাবে আসেন, ও গোক্ষুরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হুমায়ুনের হস্তে অর্পিত হন। হুমায়ুন তাঁহার চক্ষু উৎপাটনের আদেশ দেন। পরে কামরণ হুমায়ুনের অনুমতি লইয়া মক্কা যাত্রা করেন। অবশেষে হুমায়ুন হিন্দুস্থান অধিকারে সচেষ্ট হইলেন। সলিম শাহ শূরের মৃত্যুর পর দিল্লী ও আগ্রার অধিবাসিগণ হুমায়ুনকে হিন্দুস্থানে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। হুমায়ুন প্রথমে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া লাহোর অধিকার করিয়া লন; তাহার পর বৈরাম খাঁকে সরহিন্দের নিকট পাঠাইয়া দেন। বৈরামের সঙ্গে শাজাদা আক্‌বরও ছিলেন। উভয়ে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সেকেন্দর শূরের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া দেন। সেকেন্দার শূর পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন, এদিকে হুমায়ুন দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

সেকেন্দর তখনও পর্য্যন্ত পঞ্জাবে গোলযোগ করিতেছিলেন। হুমায়ুন আক্‌বর ও বৈরাম খাঁকে তাঁহার দমনের জন্য পাঠাইয়া দেন। কম্বরদেওয়ানা নামে একটি নীচজাতীয় লোক সম্ভলে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া দোয়াব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, তাহাকে পরাজিত করিয়া নিহত করা হয়।

ইহার অব্যবহিত পরে হুমায়ুন অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি দিল্লীর পুস্তকাগারের ছাদে বায়ুসেবন করিতেছিলেন; নামিয়া আসার সময় সহসা নামাজের ঘোষণা শুনিতে পান, অমনি তিনি দ্বিতীয় সোপানে উপবেশন করেন। তাহার পর আবার যেমন উঠিতে যাইবেন, পদস্খলিত হওয়ায় পড়িয়া যান এবং সেখান হইতে ভূমিতে আসিয়া পড়েন। ইহার আঘাতে তিনি অচৈতন্য হন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া প্রাসাদে লইয়া যায়। তথায় তাঁহার একবারমাত্র চৈতন্য হইয়াছিল এবং তিনি কথাও কহিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহার আর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই এবং তিনি এ জগৎ হইতে চিরদিনের জন্যই বিদায় গ্রহণ করেন।

যমুনাতীরে নূতন দিল্লীতে হুমায়ুনকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সমাধির

উপর আক্‌বর বাদশাহ এক বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। (১) সেই স্মৃতি স্তম্ভ আজিও দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে, এবং তাহা দিল্লীর একটি দর্শনীয় বস্তু।

হুমায়ুন অনেক সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন; দয়া ও বদান্যতার জন্য লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বদা রত থাকিতেন; হুমায়ুন সুন্নিমত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি সিয়ামতের প্রতি তাঁহার বিশেষরূপ শ্রদ্ধাই ছিল। হুমায়ুন ভূগোল ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজের ব্যবহার জন্য গোলকাদি নির্ম্মাণ করান। গ্রহগণের নামানুসারে তিনি প্রাসাদ সকলের নামকরণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন কবিতা লিখিতেও পারিতেন।

পৃথ্বীরাজ।

তৃতীয় খণ্ড।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হিতে বিপরীত।

ভীমদেব আবুগড় অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ইচ্ছিনী পাওয়ার আশা করিতে পারিলেন না। তিনি সেখানে একমাস রহিলেন; কিন্তু তাঁহার মনোরথ সফল হইল না, বলপ্রয়োগে যে রাজপুত কন্যা-বশীভূত হইবে না ভীমদেব তাহা বিশেষরূপেই জানিতেন। কাজেই তিনি তাহাতে ক্ষান্ত থাকিলেন। অমরসিংহ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং তাঁহার আশাপথের কণ্টক পৃথ্বীরাজকে অগ্রে উন্মুলিত করিবার পরামর্শ দিলেন।

(১) "He was buried in the new city, on the banks of the river; and a splendid monument was erected over him, some years after by his son Akbar," (Brigg's Ferishtha.)

নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া ভীমদেব পৃথ্বীরাজকে দমন করার অভিপ্রায় করিলেন; কিন্তু একাকী সাহসী না হইয়া শাহাবুদ্দীনের সহিত একযোগে কার্য্য করা স্থির হইল। তাহার পর সারঙ্গবর নামে একজন বিচক্ষণ সভাসদকে দূত করিয়া গজনীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সহিত যে পত্র দেওয়া হইল, তাহাতে লিখিত ছিল যে, শাহাবুদ্দীন নাগরের নিকট সারুণ্ড বা অচলপুরে আসিলে, ভীমদেব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নাগর আক্রমণ ও আজমীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন। পত্রের সহিত অশ্ব, চামর প্রভৃতি উপঢৌকনও পাঠান হইল। যাইবার সময় ভীমদেব সারঙ্গবরকে বলিয়া দিলেন যে, ইচ্ছিনীর জন্ম তিনি আত্মীয়কুটুম্বের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না, ইহাই মনে করিয়া কাজ করিতে হইবে।

যে সময় উজীর ও সর্দ্দারগণে বেষ্টিত হইয়া শাহাবুদ্দীন দরবারে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে সারঙ্গবর উপস্থিত হইয়া ভীমদেবের পত্র ও ভেট প্রদান করিলেন। পত্র পড়িয়া শাহাবুদ্দীন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন; তিনি হিন্দুস্থানে হিন্দুগর্ব্ব খর্ব্ব করারই অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কেবল পৃথ্বীরাজ বলিয়া নহেন, সে সময়ে যে সমস্ত হিন্দু রাজা পরাক্রান্ত ছিলেন, শাহাবুদ্দীনের ইচ্ছা ছিল, তাঁহাদের সকলকেই ধ্বংস করিবেন। ভীমদেব, জয়চন্দ্র কেহই তাঁহার লক্ষ্যের বাহিরে ছিলেন না। তাই তিনি ধনুক আকর্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমি সমস্ত কাফেরকেই নাশ করিব, তাহা না পারিলে গজনীতে রহিব না।"

বাদশাহের কথা শুনিয়া উজীর তাতার খাঁ এবং ফিরোজ, নেসারত খাঁ রুস্তম খাঁ প্রভৃতি সর্দ্দারেরাও বলিলেন,—"এই কথাই যথার্থ।"

তাহার পর শাহাবুদ্দীন আবার বলিতে লাগিলেন,—"দান, খড়্গ, বিদ্যা ও সম্পত্তি কখনও ভাগে থাকিতে পারে না। পৃথিবী বীরভোগ্যা, ভীমদেব কি জন্ম আমার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিতেছে? আমি তাহাকেও নাশ করিতে ছাড়িব না।"

শাহাবুদ্দীনের কথা শুনিয়া সারঙ্গবরের মনেও ক্রোধের সঞ্চার হইল, তিনি তখন স্বীয় প্রভুর গৌরব প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন,—"আমার প্রভু হিন্দু, হিন্দু ম্লেচ্ছ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।"

সে কথায় শাহাবুদ্দীন বলিয়া উঠিলেন,—"হিন্দু-মুসলমানের কে ছোট, কে বড়, তাহা বুঝা যাইবে, আগে চোহান পৃথ্বীরাজকে ধ্বংস করিব, পরে চাণুক্য ভোলা ভীমকে বুঝিয়া লইব।"

তাহার উত্তরে সারঙ্গবর বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আপনার সাধ্য হয় করিবেন, কিন্তু জানিবেন, যে সময় ভোলা ভীমের দলবল চলিতে থাকে, সে সময়ে পৃথিবী কম্পিত ও কালও ভীত হইয়া উঠে; চাণুক্য-রাজের সম্মুখে, জলন্ধর, বঙ্গ, তৈলঙ্গ, কোকন, কচ্ছ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কোন রাজাই স্থির থাকিতে পারে না; ভীমদেব আবু প্রভৃতি ধ্বংস করিয়াছেন; তাঁহাকে জয় করা সহজ মনে করিবেন না। ব্রহ্মা স্বহস্তে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

সারঙ্গবরের কথা শুনিয়া শাহাবুদ্দীনের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল; তিনি তাঁহার প্রাণবধে উদ্যত হইলেন। উজীর তাতার খাঁ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"জাঁহাপনা, দূত অবধ্য, দূতকে বধ করিলে কলঙ্ক ও অপযশ হইবে।"

তখন শাহাবুদ্দীন নিরস্ত হইলেন; কিন্তু একজন সভাসদ বলিয়া উঠিলেন,—"দূত অবধ্য বটে, কিন্তু ইহার কথা অসহ্য।"

সে কথায় সারঙ্গবর ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া ফেলিলেন ও সভাসদকে এরূপভাবে আঘাত করিলেন যে, তাঁহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া শাহাবুদ্দীনও ধনুক আকর্ষণ করিয়া সারঙ্গবরের বক্ষে বাণ বিদ্ধ করিলেন, প্রাণত্যাগ করিতে করিতে সারঙ্গবর আরও দুইজন সর্দ্দারকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। দরবারমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমে এ সংবাদ ভীমদেবের নিকট পঁহুছিল, পশ্চাত্তাপে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন আবার শাহাবুদ্দীনের প্রতি তাঁহার শত্রুতা জাগিয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুই শত্রুর সম্মুখে।

যথাসময়ে আবুগড়ে পঁহুছিতে না পারায় পৃথ্বীরাজের মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়; বিশেষতঃ সলখের মৃত্যুতে তিনি যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়া উঠেন; আর ইচ্ছিনীকে স্মরণ করিয়া তিনি লজ্জিতও হইতেছিলেন। যাঁহাকে পাইবার জন্য তিনি দিবারাত্রি চিন্তা করিতেছিলেন, তাহার উদ্ধার-সাধনে বিলম্ব ঘটায় তিনি হয় ত তাঁহাকে কাপুরুষ মনে করিতে পারেন ভাবিয়া পৃথ্বীরাজ উৎকণ্ঠিত হইতেও লাগিলেন। সে যাহা হউক, তিনি আবুগড় পুনরধিকার করিয়া জৈত সিংহের হস্তে দিবার সংকল্প করিলেন এবং তাহাতেই ইচ্ছিনীকে প্রসন্ন করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

এ দিকে শাহাবুদ্দীন ও ভীমদেব আপন আপন সৈন্য সজ্জিত করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ তাহা শুনিয়া নিজ সৈন্য-সজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন। মন্ত্রী কৈমাস তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সময়ে দুই শত্রুকে আক্রমণেরই সুযোগ উপস্থিত। তখন আজমীর ও নাগরের সৈন্য সকল সজ্জিত হইল। পৃথ্বীরাজ নাগরে উপস্থিত হইলে সামন্তগণের একটি সভা বসিল।

সে সভায় প্রথমে মন্ত্রী কৈমাস বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমাদের সজ্জিত হওয়ার ক্রটিতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। আবুরাজ সলখ আমাদের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত ছিলাম; ইহার মধ্যে ভীমদেব আবু দখল করিয়া সলখকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। আর ইচ্ছিনী কুমারীর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ স্থির হইয়াছে, ভীমদেব বলপ্রয়োগে তাঁহাকে হরণ করিতে উদ্যত। আমরা যদি তাহার প্রতীকার করিতে না পারি, তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা। আবার এই অবকাশে আমাদের চিরশত্রু শাহাবুদ্দীনও হিন্দুস্থানে আসিতেছে। ভীমদেব তাহার সহিত মিত্রতা করিতে গিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। এক্ষণে তাহাদের মধ্যেও শত্রুতা ঘটিয়াছে; এই সুযোগে আমাদের উভয় শত্রুকেই আক্রমণ করিতে হইবে। সামন্তগণের ইহাতে মত কি?"

চামণ্ডরায় বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাতে মত আবার কি? এ সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করা হইবে না; শাহাবুদ্দীনকে বাঁধিয়া চাণুক্যকে শিক্ষা-দিতে হইবে; সামন্তেরা স্বামিকার্য্য প্রাণপণেই করিবেন।"

জৈত রায় বলিলেন,—"আমারও সেই মত।"

দেবরাজ বগ্‌গরী উত্তর করিলেন,—"আগেই ভীমের দর্প চূর্ণ করিতে হইবে।"

বড়্‌গুজ্জর রায় কহিলেন,—"অবশ্য শাহের উপরও তরবারিচালনা সমান-ভাবেই চলিবে।"

তখন পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"তাহা হইলে সকলেরই মত হইতেছে যে, দুই শত্রুকেই আক্রমণ করিতে হইবে।"

সামন্তেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"তাহাই করিতে হইবে।"

পৃথ্বীরাজ। তাহা হইলে সৈন্য দুই ভাগ করিয়া দুই দিকেই সজ্জিত করা উচিত।

কৈমাস। কে কোন্ দিকে থাকিবেন, আপনি স্থির করিয়া দিউন।

পৃথ্বীরাজ। কৈমাস ও চামণ্ড রায় নাগরে অপেক্ষা করিয়া ভীমদেবকে আক্রমণের চেষ্টা করুন। আর আমরা সারুণ্ডে গিয়া শাহাবুদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করি।

কৈমাস। এ পরামর্শ ভালই হইয়াছে। আশা করি, সামন্তগণ কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি করিবেন না।

তখন সামন্তেরা বলিয়া উঠিলেন, "একদিকে প্রাণ, আর একদিকে স্বামি-কার্য্য; আর মন্ত্রীর উপদেশও শিরোধার্য্য।"

পৃথ্বীরাজ। তোমাদের স্বামিভক্তি জগতে চিরবিঘোষিত হউক। মাতা আশাপূর্ণা ও শাকম্ভরী আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহুন।

কৈমাস। আমরা জগৎকে প্রভুভক্তিই দেখাইব; মাতা আশাপূর্ণা ও শাকম্ভরী আমাদের প্রতি অবশ্যই মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

তখন সামন্তগণ 'হর হর' শব্দে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিলেন ও আপন আপন তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা পৃথ্বীরাজকে অভিবাদন করিলেন। পৃথ্বীরাজও তাঁহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি তখন দুই প্রবল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একই প্রতিজ্ঞা।

ভীমদেব ইচ্ছিনীকে ভুলিতে পারিতেছিলেন না; যেরূপে হউক, তাঁহাকে পাইবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন; পৃথ্বীরাজ তাঁহার অন্তরায় জানিয়া তাঁহারই প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। ওদিকে শাহাবুদ্দীন তাঁহার যে অপমান করিয়াছেন, তাহারও প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল; তিনি এই দুই শত্রুকে দমন করার অভিপ্রায় করিলেন। তবে কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিবেন এবং সে বিষয়ে সামন্তগণেরই বা মত কি, জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সকলে সমবেত হইলে, ভীমদেব তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা এক্ষণে দুই প্রবল শত্রুর সম্মুখে পড়িয়াছি, এক্ষণে কি করা উচিত?"

মন্ত্রী অমরসিংহ। দুই জনকেই দেখিয়া লইব।

সারঙ্গদেব নামে সামন্ত উত্তর করিলেন,—"তাহা কি সম্ভব হইবে?"

ভীমদেব বলিলেন,—"অসম্ভব কিসে?"

সারঙ্গদেব। এক সময়ে দুই শত্রুকে বাধা দেওয়া কি ঘটিবে?

অমরসিংহ। না ঘটিবার কারণ বুঝিতেছি না, গুর্জ্জর নরেশ কি পরাক্রমে কাহা অপেক্ষা হীন?

সারঙ্গদেব। আমি সে কথা বলিতেছি না, তবে এক সময়ে উভয় শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা কিরূপ কৌশলে হইবে, তাহাই ভাবিতেছিলাম; তাহা ছাড়া আমার আরও একটি কথা আছে।

ভীমদেব। সে কথাটা কি বল, শোনা যাক।

সারঙ্গদেব। আমি বলিতেছি, আমরা পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি কেন? তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি সলখের সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। সলখ মহারাজকে মন্দোদরী দান করিয়াছেন, ইচ্ছিনীকে দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোন অপরাধ দেখা যায় না। আর আপনি তাহার প্রতিশোধও লইয়াছেন। এক্ষণে পৃথ্বীরাজের সহিত

বিবাদের কোনই কারণ নাই। তাঁহার সহিত সন্ধি করাই উচিত। শাহাবুদ্দীন আমাদের ধর্ম্মশত্রু; সেই ধর্ম্মশত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই জন্য পৃথ্বীরাজের সহিত মিলিত হওয়ার প্রয়োজন। আমরা যদি এ কাজ না করি, তাহা হইলে আমরা দেশের নিকট—ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইব, আর আমাদের এই গৃহ-বিবাদে ধর্ম্মশত্রু শাহাবুদ্দীন শীঘ্রই ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া লইবে।

সর্দ্দার ঝালারায় বলিলেন,—"সারঙ্গদেবের বাক্যই যুক্তিযুক্ত, প্রত্যেক রাজপুতের সেই ধর্ম্মশত্রুরই বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিত; গৃহ-বিবাদে আমাদের সর্ব্বনাশই হইবে।"

মন্ত্রী অমরসিংহের এ কথাগুলি ভাল লাগিল না। তিনি ইচ্ছিনীকে পাওয়ার জন্য ভীমদেবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কাজেই তাহার সমর্থন করার ইচ্ছায় বলিয়া উঠিলেন,—"আমার নিকটে ও কথা ভালই লাগিতেছে না। মহারাজ ইচ্ছা করিয়াছেন, ইচ্ছিনী কুমারীকে বিবাহ করিবেন। সলখ তাহা করিতে দেন নাই, তাঁহার শিক্ষা হইয়াছে, এক পৃথ্বীরাজ তাহার বাধা দিতেছেন, কাজেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে। গুর্জ্জর নরেশের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, তিনি একাকীই শাহাবুদ্দীনের দর্প চূর্ণ করিতে পারেন। তবে এক সময়ে দুই শত্রু যখন উপস্থিত, তখন তাহাদিগকে দমন করার কৌশল এই যে, পৃথ্বীরাজের সেনাপতি কৈমাসকে আমি মন্ত্রবলে মুগ্ধ করিয়া ফেলিব, আর শাহাবুদ্দনীকে অস্ত্রবলে বুঝিয়া লইব।"

ভৈরবভট্ট সর্দ্দার জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"মন্ত্রীর কথাই মানা উচিত।"

জৈন সর্দ্দার চারণচন্দ্রও কহিলেন,—"আমারও সেই মত।"

অবশেষে ভীমদেব বলিতে লাগিলেন,—"সারঙ্গদেব ও ঝালারায় যাহা বলিতেছেন, এখনও তাহার সময় ঘটে নাই। আমাদের প্রত্যেকের এমন শক্তি আছে যে, এক এক জন রাজপুত রাজা শাহাবুদ্দীনকে উচিত শিক্ষা দিতে পারেন। কাজেই সে বিষয়ের চিন্তার কোনই কারণ নাই। পৃথ্বীরাজ আমার অনুরোধ রক্ষা করে নাই, আমার অপমানই করিয়াছে, এ অপমানের

প্রতিশোধ লইতেই হইবে। এক্ষণে সকলে সজ্জিত হইয়া দুই শত্রুকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হও।”

সারঙ্গদেব উত্তর করিলেন,—“মহারাজের আদেশ অবশ্য শিরোধার্য্য, কিন্তু আমার চক্ষে যেন ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়ই বোধ হইতেছে।”

তাহার পর ভীমদেবের সৈন্যসামন্ত সজ্জিত হইয়া প্রথমে নাগরের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। দুই শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য ভীমদেব পৃথ্বীরাজের ন্যায় একই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ব'লে দাও।

অস্ত-সাগরে পশ্চিম রবি মুদিল রক্ত আঁখি ,
সান্ধ্য-পবন মাধবীগন্ধ বহিয়া চলিল মাখি ;
স্নিগ্ধসলিলা বিমলতটিনী গাহিয়া চলিল গান,
সান্ধ্য গগনে বিহগ-কণ্ঠ সে গানে মিলাল তান ;
পূর্ব্ব-গগন রঞ্জিত করি উদিল কিশোর শশী,
স্নিগ্ধ কোমল রশ্মিপরশে উজলিয়া দশ দিশি।
না জানি কি বিষে জর্জ্জর হিয়া, ব্যথিত কাতর প্রাণ,
এ শোভায় কেন না পড়ে ঝাঁপায়ে উচ্চে গাহিয়া গান।
মাধুরী-পূর্ণ ধরণীর পরে মানব কেন রে দুঃখী!
কিসে তার মুখে ফুটিবে হাসিটি, কি পাইলে হয় সুখী ?
প্রকৃতির কোল ছেড়ে গেছে দূরে, তাই কি বেদনা তার ?
মুখে চাপে কথা, বুকে চাপে ব্যথা, দারুণ বেদনাভার ?
যে জান ওগো ব'লে দাও মোরে কোন্ পথে গেলে পরে,
আপন প্রকৃতি ফিরিয়া পাইব ফিরিব আপন ঘরে ?

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা।

রূপ-গুণ।

বাল্যকাল হইতেই আমি বড় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলাম। চেহারাটা একটু ফুটফুটে ছিল, আরও কিসে বাহার খোলে, সাজাইয়া গুছাইয়া সবাই যেন সেই কথাই আমায় শিখাইয়া দিত। কি করিলে সুন্দর দেখায়, বাল্যকাল হইতেই এ চিন্তা আমার মধ্যে ঢুকিল। বেশ ভাল ভাল দামী দামী রং-বেরঙ্গের কাপড় পরিতাম; ঋতুভেদে নানা ফ্যাসনের বাহারে রঙ্গীন জামা পরিতাম; সময়োপযোগী ফরমা'সে রকমারী জুতা কিনিতাম; সাবান, এসেন্স, পমেটম কত যে কিনিতাম, তার তালিকা দিতে পারিলে, হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ হ'য়ে যায়। জুতা-জামা কাপড়-চোপড়ের খরচ, আরও কত বাজে খরচ—সব শুদ্ধ যদি আমার জীবনের এই বাজে খরচটার হিসাব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বুঝাইয়া দিতে পারিতাম, আমার সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষার অমিতব্যয়িতায় দুই চারটা ছোটখাট পরিবারের কিছুদিন মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিয়াই চলিত। বাপের টাকা ছিল, খুব খরচ করিয়াছি! পিতৃ-ধনের উপরে আমার পূর্ণ অধিকারই ত বর্ত্তমান, আমার টাকার ভাবনা কিসে? খুব সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়াছি; এই যদি আমার নিজের পরিশ্রমে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজের খরচ করিতে হইত, স্বোপার্জ্জিত অর্থের মায়ায়, সংসারযুদ্ধের পরিশ্রমে বুদ্ধি হয় ত অন্যরূপই হইত।

মেহনতে অনেক খেয়াল টুটিয়া যায়। যেখানে বিশ্রাম, চুপ-চাপে বসিয়া থাকার সুবিধা, সেইখানেই খেয়াল। পিতৃধন পাইয়া কিন্তু এ সব কথা কিছুই মনে করি নাই, বরং জীবনে সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের একটা বেশ সুবিধা পাইয়াছিলাম; এখন যে দুঃখ না হয়, তাও নয়। অনেক টাকা খরচ করিয়াছি, অনেক সাধ মিটাইয়াছি, কিন্তু সৌন্দর্য্যের 'স' ও বুঝি নাই।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লেখার ঝোঁকও বাল্যকাল হইতেই ছিল। সুকোমল শয্যায় শুইয়া, বুকের তলায় একটা বালিশকে পিষিয়া, খুব কবিতা লিখিতাম। কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের আকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। একধার থেকে দেশী বিদেশী কতকগুলি যন্ত্র কিনিয়া

ফেলিয়া 'তানা নানা'' করিয়া সুরের সাধনাও আরম্ভ করিলাম ; ওস্তাদ কিছু টাকাও খসাইয়া যথাসময়ে বিদায় লইলেন। তার পর চিত্রবিদ্যার আকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে জাগিল। চিত্রবিদ্যার অসংখ্য বই কিনিলাম ; টাকা-পয়সা ব্যয় করিয়া রং-বেরঙে নানা ধরণে মনের মতন ছবি আঁকিতে লাগিলাম।

প্রথম কিছু দিন এটা করিতে যাইয়া সেটা হইত না, সেটা করিতে যাইয়া এটা হইত না ; শিখিতেছি গান, মনে আসিল কবিতা ; লিখিতেছি কবিতা, আঁকিতে ইচ্ছা হইল ছবি ; আঁকিতেছি ছবি, মনে আসিল, দেখিব কোন্ জীবন্ত চিত্র ; দেখিতেছি জীবন্ত চিত্র, মনে হইল, একবার দেখিতে হইবে কোন জীবনহীন প্রাকৃতিক চিত্র। প্রাণহীনের প্রাণ দেখিতেই হইবে। মনটা কিছু দিন বেশ দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল। কিছু দিনেই বুঝিলাম, এ উচ্ছৃ-ঙ্খলতার দৌড়াদৌড়ি, এক দিকে মন না দিলে আমার সকল সৌন্দর্য্য উপ-ভোগের আশাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

কবিতা ছাড়িয়া যখন গানে মন দিলাম, একদিন খেয়াল হইল, যন্ত্রপাতি-গুলি কেমন আছে, একবার দেখিতে হইবে। বহুদিনের পর সে জিনিসগুলি যে আমার, তা মনে হইল। আমার বলিয়াই দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, অব্যবহারে যা হয়, তাই হইতে বসিয়াছে। তা হউক, এবার আমার গল্প লিখিবার পালা,গল্প লিখিব। একবার ভাবিলাম, বিক্রী করিব ; আবার ভাবিলাম, ছি! এই বড় মানুষ আমি! বই খুঁজিয়া দেখি, অনেক বই-ই নাই। আমার এত সাধের মনোমদ চিত্রে ভরা নাটক-নভেলও সব খুঁজিয়া পাইলাম না।

গল্পে মন দিলাম। কবিতা ছাড়িয়া এবার গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কবিতা ও গল্পে কেবল প্রেমের কথা বলিতেই ভাল লাগে। কি যে ছাই প্রেম, কেবল সেই কথা। এ প্রেম যে কি, তাও বুঝি না, মুখ ফুটিয়াও কাকে বলি না, কেবল লিখি আর কাটি, লিখি আর কাটি, কিছুতেই মনের মত হয় না।

বয়স তখন ষোল [illegible], সবটার চেয়ে পোষাক-পরিচ্ছদই তখন ভাল লাগিত। নিজের সৌন্দ[illegible] খুব করিয়া বাড়াইব, এই সেই সাজানো-গুছানো সৌন্দর্য্য সবাইকে দেখা[illegible]ব—দিনরাত্রি যেন এই কথাই ভাবিতাম। ভাবনা-গুলি সময় সময় আমায় ছাড়িয়া দিত। যেই দেখিত, আমি একলা বসিয়া

আছি, অমনি দল বাঁধিয়া আমায় আক্রমণ করিয়া খুব করিয়া আমার কান মলিয়া দিত। কিন্তু বিচার করিত একজনে; ভাবনাগুলির সেই বোধ হয়, নেতা। যে বিচার করিত, তার উপরই আমার রাগ হইত। তার পর, হয় আমার ভয়েই হউক (বোধ হয় তখন ভীষণতা বাড়িতেছিল) অথবা হতভাগা অধঃপাতে যাউক, এই ভাবিয়া ভাবনার নেতা ক্রমে চুপ করিয়া গেল। আমাম মন কেবল 'সুন্দর সুন্দর' করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। আমি মনের জ্বালায় অস্থির হইলাম না, তার কথাগুলিই আমার ভাল লাগিল। বেশ ফিট্‌ফাট্‌ হইতে লাগিলাম। সময়টাই যে আয়ু, সময় গেলেই যে আয়ু যায়, আয়ু গেলেই যে আমিও ক্রমে ক্রমে গতাসু হই, প্রথম প্রথম ভাবনাগুলির ভালবাসায় সে কথা আমার মনেই আসিত না—কেবল গোপনে প্রকাশ্যে ভাবনাগুলির সঙ্গে প্রণয় করিতাম। প্রণয়ের আসর বেশ জমিয়া গেল। ছবিতে ছবিতে ত্রিতল কক্ষ ভরিয়া দিলাম, আরও নভেল-নাটকে কক্ষের পর কক্ষ সুসজ্জিত করিলাম। যতদূর পারিলাম, যেখানটা যেখানটা মনের মত লাগিল, সেইখানটা লইয়া নভেলী ভাবে বিভোর হইলাম।

রং-চংএর যা দেখিতাম, তাই সুন্দর ভাবিতাম; সব সৌন্দর্য্যের রস করিয়া প্রাচীরে প্রাচীরে, আল্‌নায়, আলমারিতে, শয্যায়, পোষাকে সর্ব্বত্র রসের ছড়া দিতাম—তখন কিন্তু ভাবিয়া দেখি নাই, প্রত্যেক ফোঁটা রসে কেবল রূপার চাকৃতি টাকা, প্রত্যেক টাকায় কেবল রস, রসে রসে কেবল আমি আমার মনের মতন একটা রসের পুতুল, অথচ মানুষের মনে রসহীন বেরসিক, খাঁটি খোস্‌-খেয়ালের খেলোয়াড়; যার সাধ হয়, সেই এই রসভক্ত বেরসিকটিকে লইয়া পুতুল-নাচ নাচায়, আর ঠকাইয়া টাকা-পয়সা লইয়া আরও রস যাচাই করে।

আমার এই সৌন্দর্য্যভোগের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কত অর্থব্যয় হইয়াছে, কতটুকু সৌন্দর্য্য আমি ভোগ করিয়াছি, সে সৌন্দর্য্যভোগে আমার মন কতদূর তৃপ্ত হইয়াছে, আমার মনের তৃপ্তিতে আমার শরীরের ও মনের কতদূর স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, সেই স্ফূর্ত্তিতে আমি কতদূর উপকৃত হইয়াছি, আমার সমাজ, আমার মানবজাতি কতদূর উপকৃত হইয়াছে, আমার আত্মা কতটুকু উন্নত ও পবিত্র হইয়াছে, স্বভাব সুন্দর সৃষ্ট জগতের কি

সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছে, এতদিনেও তাহার হিসাব লই নাই ; কিন্তু কে যেন অলক্ষ্যে আমার সৌন্দর্য্য-আকাঙ্ক্ষাকে নূতন করিয়া সাজাইয়াছে ; আমি কেবল ভাবিতেছি, যে সৌন্দর্য্যকে আমি চাই, তার কতটুকু পাই ! কি করিয়া তাকে পাওয়া যায়, কি করিয়া তাকে ভোগ করিলে আমার তৃপ্তি হয়, এই একটা ভাবনা কে যেন কবে আমার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া গিয়াছে।

সেই ষোল বছরের পর, সতের বছরের মধ্যে আর একটা সৌন্দর্য্য উপ-ভোগের স্পৃহা মনে জাগিয়া উঠিল। কত বছরে এই সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, ঠিক বলিতে পারি না ; হয় ত কিশোর বয়সেই হইবে। তবে বাল্যকালেও মাকে দেখিতাম, পিসীমাকে দেখিতাম, ঠাকুরমাকে দেখিতাম, দিদিকে দেখিতাম, আরও কত নারীকে দেখিতাম, তখন ঠিক এমনটা হয় নাই। এখন যেন আরও কিছু নূতনতর। এ নূতনত্বটা কে কবে টের পাইয়াছিল জানি না, তবে আমাকে যে আমি প্রকাশ করিতেছি না, এ বিশ্বাস আমার খুব ছিল।

সেই শুভ সন্ধিক্ষণে খুব ধুমধামে আমার বিবাহ হইয়া গেল। এর আগেও অনেক বালিকা ও যুবতীর দিকে তাকাইয়াছি। কখনও বা লজ্জা আসিয়াছে, কখনও বা আসে নাই ; কিন্তু এ আর একটু নূতনতর। এ সময়েও কবিতা লিখি, গল্প লিখি, চিত্র আঁকি, শত শত মানুষ দেখি ; কিন্তু সকলের চেয়ে ঐ যে নূতনতর কিছু, ঐটিই আমার কাছে ভাল লাগিত। এ ধাঁধাও কাটিয়া গেল ; কিন্তু ক্রমেই যেন নূতন ধাঁধা—কত অপ্রকাশ যেন আমার ভিতরে প্রকাশ হইতে লাগিল। আমি দেখিতে লাগিলাম, ভাবিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য এই, যত অপ্রকাশ প্রকাশিত হয়, ততই যেন আরও কত স্তূপাকৃতি অপ্রকাশ পড়িয়া থাকে ; যত প্রকাশ, তত অপ্রকাশ। কোন্ অবস্থায় সব অপ্রকাশ প্রকাশ হইয়া যায়, কে জানে! জীবনটার মধ্যে যেন কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সৌন্দর্য্যের আশা-আকাঙ্ক্ষারও ছেলেমানুষীটুকু চলিয়া যাইতে লাগিল—পরি-বর্ত্তনে অপরিমেয় স্পৃহা। সৌন্দর্য্যের পিপাসা ত মিটিল না। পিপাসায় কিছু নূতনত্ব নাই, কিন্তু ভোগের মধ্যে কেবল নূতনত্ব—কেবল পরিবর্ত্তন। মনে হইতে লাগিল, ভোগের মধ্যেও যেন কিছু পাইয়াছি, এত অর্থব্যয়, এত আয়ু নষ্ট, এত সৌন্দর্য্যের পিপাসা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায় নাই—কিছু

পাইয়াছি। সেই কিছুই আমার অভিজ্ঞতা—সেই কিছুই আমার পরিবর্ত্তনের কারণপরম্পরা।

এখন আর সে সব নাই। ডজন ডজন জুতা-জামা, ঘড়ি-ছড়ি সব যেন কে কান মলিয়া ছাড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা কমে নাই। যে 'সুন্দর'কে তখন সুন্দর দেখিতাম, এখন হয় ত তাহাকে কুৎসিত দেখিতেছি। অন্তরে নববেশী 'সুন্দর' বসিয়াছে, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা নবীন 'সুন্দরের' ধ্যানে বিভোর হইয়াছে।

সঙ্গিনীর রূপ দেখিয়া আর মন ভোলে না; রূপের ধাঁধা কাটিয়া গিয়াছে। কে যে কবে সন্ধান দিয়া গেল, ঠিক বুঝিতেও পারিলাম না। দয়া করিয়া কে যেন কবে কানে আমার ইষ্টমন্ত্র দিয়া গিয়াছে। কেন যেন এখন গুণের সন্ধান মিলিয়াছে। এতদিন রূপমুগ্ধ ছিলাম, গুণ দেখি নাই। মোহ ছুটিয়া গেল; দেখিলাম, তার ঢের গুণও আছে। সে গুণে সংসার চলে, সুখ-দুঃখের বিনিময় হয়, শান্তি অশান্তির হিসাবনিকাশ হয়, জগতের রোগ-শোক-পাপ-তাপের মধ্যে সে গুণ স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া শক্তিরূপিণী নারীরূপে জীবদুঃখ নিবারণ করিতে পারে। ও ত সুধু ভোগের মূর্ত্তি নয়। ঐ নারীমূর্ত্তির অংশ ঘরে ঘরে মাতৃরূপে, স্ত্রীরূপে, ভগ্নীরূপে, কন্যারূপে বিরাজ করিয়া পরম শান্তি দান করিতেছেন। গুণমূর্ত্তি চমৎকার। শরীর ছাড়িয়া মনে—মন ছাড়িয়া এ মূর্ত্তির ধ্যানে আত্মা নিবিষ্ট হইয়া যায়। এ গুণে রস আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, ভোগ আছে, তৃপ্তি আছে, নিবৃত্তি ও সংযমও আছে। এত দিনে বোধ হয় কতকটা বুঝিয়াছি, নারীর আদরে, নারীর সম্মানে আমরা ছোট হই না, বরং বড় হই। নারীর গুণের আদর করিলে, তাদের শক্তিময়ী পবিত্র সতী মূর্ত্তির সংস্রবে যথার্থ পৌরুষের অধিকারী হইতে পারি।

নারী শুধু ভোগের সামগ্রী নয়। সংযম ও সহিষ্ণুতাই তাঁর আদর্শ। নারীকে যদি যথার্থ মাতা, যথার্থ পত্নী, যথার্থ ভগ্নী ও যথার্থ কন্যার মত চাই, সংযম ও সহিষ্ণুতার তার পরিপূর্ণ অন্তর নিশ্চয়ই দেখিতে পাই।

* * * *

মনে হইল, আদর্শ চাই। 'সুন্দরে' যে রস আছে, আদর্শেই তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়, সংযমী তা ভোগ করিবার শক্তি উপার্জ্জন করে। সৌন্দর্য্য উপ-

ভোগে অন্তরের যে অভাব 'সুন্দরকে' চায়, বৃত্তির ইতরতাই সেই 'সুন্দরকে' তাড়াইয়া দেয়। মানসিক শক্তির অভাবেই পৃথিবীর মন খাটো—নরনারীর সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা আছে, তৃপ্তি নাই। টাকায় বড় হই ত যেন মনকেও বড় করি! মনকে ছোট করিয়া টাকায় বড় হইলে পৃথিবীর "শ্রেষ্ঠত্ব" ত বুঝিব না। মন বড় করিয়া টাকায় ছোট হওয়াও ভাল। ব্যক্তির পক্ষে ত ভালই। তবে জাতির অস্তিত্বরক্ষাকল্পে টাকায় ছোট 'বড়'র মেশামেশিও ভাল। মন যেন ছোট না করি; মন বড় করিলে জাতিকে পাবই, জাতি বরং বড় মনের জাতি হয়ে যাবে। জাতির আদর্শ পাব, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার ইষ্টদেবতা পরম সুন্দরেরও দর্শন পাইব।

বেশ বুঝিতেছি, সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে হইলে মনকে বড় করিতে হয়। মনকে বড় করিতে পারিলেই গুণের আদর করিতে পারি, গুণের আদর করিতে পারিলেই জগতের গুণীরা দয়া করিয়া তাঁদের চরণে আমায় স্থান দেবেন। গুণের আদরে মনে যে আদর্শের ছবি ফুটিয়া উঠে, তাতেই আমার ইচ্ছা বাড়ে, উত্তম বাড়ে, অধ্যবসায়ে বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া কাজের লোক হইতে পারি। যখন কেবল আপনার দিকে দৃষ্টি ছিল, তখন ত পরের দিকে একবারও চাহিয়া দেখি নাই। আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ ছিলাম, পরের রূপ-গুণ দেখিয়া আপনার ভ্রম ভাঙ্গিতে পারি নাই। যে জগতে এত রূপ-গুণ, যেখানে অনন্ত রূপধারা রূপসাগর হইতে উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে, যেখানে গুণেরই শুধু বিকাশ হইতেছে, সেখানে আমার কতটুকু রূপ—আর কতটুকু গুণ—পাগলের মত কিসের গর্ব্ব করিতেছিলাম! এবার রূপসাগরে স্নান করিয়া গুণীর চরণে প্রণত হইব, গুণীর চরণপার্শ্বে বসিয়া রূপসাগরের তরঙ্গ দেখিব। গুণ ছাড়া আর রূপ চাহিব না। গুণ ছাড়া ত রূপ ভাল করিয়া ফোটে না। রূপ চাই, রূপকে লইয়াই গুণ চাই, গুণকে লইয়াই রূপ চাই। রূপ ছাড়িয়া গুণ আসিয়া কখনও আমায় দেখা দেন, আমি তখন রূপের আশা বিসর্জ্জন দিয়া গুণকে লইয়াই ঘর করিব। চাই [illegible] আমার মনের সংযম।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

———

আ! *

(১)

ঐ যে, বঙ্গ-জননীর উজ্জল রতন
কৃতী কর্ম্মী পুত্রগণ,
করেন, বছর বছর মাতৃসেবার
সুবিরাট্ আয়োজন।
কত, রাজা মহারাজা, জজ ব্যারিষ্টার
এ কাজের অভিনেতা,
আরো, কত শত শত জুটেন আসিয়া
মনীষী, মহান্-চেতা।
কিন্তু, কাজের বেলায় যা'হোক তা'হোক
বক্তৃতার বেলা ভারী,
ওরে, বঙ্গ-জননীর কি রকম সেবা
বুঝিতে কিছুই নারি!
তাঁরা, নিজের জন্য ব্যস্ত সদাই
ঘোড়া গাড়ী জুড়ি হাঁকে,
ওরে, রসনার তৃপ্তি করিবার তরে
সুরস মিষ্টান্ন ডাকে।
কত, ঝাল ঝোল মিঠা উদরে পূরি
পালঙ্কে রাখেন গা,
হায়, এই কি তাঁদের মাতৃ-আরাধনা
সাহিত্য-মিলন—আ!

(২)

দেখ, বঙ্গ-জননীর প্রকৃত
করিছে 'সবুজপত্র',

* বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'র 'আ!' কবিতা পাঠান্তে লিখিত।

তার, নাই কো যে ঝোঁক সাহিত্য-সভায়
না চায় ফলারের পত্র।
দাদা, বৃদ্ধ বয়সে এনেছে যৌবন
ধরেছে প্রথম মূর্ত্তি,
ওরে, উজ্জল রবির ঝলমল করে
দিনে দিনে পায় ফূর্ত্তি,
এম্নি, অপার করুণা সবুঝ অবুঝ
সকলেতে তুল্য টান,
পুন, গৌর নিতাইয়ের হয়েছে উদ্ভব
ডেকেছে প্রেমের বান্।
তা'দের, কাজের স্রোতে বাধা জন্মায়
এমন কাহার সাধ্য,
ওরে, সেবার চোটে বঙ্গ-জননী
বাঙ্গলা ছাড়িতে বাধ্য।
দেখ, পাকা পাতা পুন হয় রে সবুজ
কেরামত বাহবা বা,
ঐ যে, রবির কিরণে করে ঝিক্‌মিক্
সবুজ দেহটি,—আ!

৩

হলো, ব্রাহ্মণ এখন বহু পুরাতন
বৈষ্ণব স্বতন্ত্র জাতি,
তাই, দেখে শূদ্র চায় যজ্ঞোপবীত
অসম্ভব কি এ রীতি?
দেখ, চতুর চাটুয্যে করিল শপথ
ব্রাহ্মণ-সভার মাঝে,
ওরে বর[illegible]ণ আর লবে না বলিয়া
[illegible]াহবা পেল সে কাজে।
কিন্তু, কি[illegible]ই আবার বিবাহ-বাজারে
হাজারে পুত্র ছাড়ে,
কই, কি করিল তাঁর সমাজ-শাসন
অহঙ্কারে মাথা নাড়ে।

এবে, হোম-যোগ-যাগ পূজা-গায়ত্রী
ক্রমে ক্রমে হ'য়ে লুপ্ত,
দেখ, ব্রহ্ম-মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণের তেজ
দিনে দিনে হয় গুপ্ত।
শুধু, সভার মাঝে বজ্র-নির্ঘোষে
সকলের ফোটে রা,
সবে, কথা কাটাকাটি বকুনির তরে
মিছামিছি ছোটে—আ!

(৪)

দেখ, বাপে দিয়ে গেল লাখ পনের
দেশের শিক্ষার তরে,
এবে, তাঁ'র মৃত্যু-পরে গুণবান্ পুত্র
অন্ন জল নাহি ধরে।
যেবা, পিতৃ-প্রদত্ত ধনে হাত দেয়
সে জন কেমন পুত্র,
ভাগ্যে ছিল হাই কোর্ট ছিঁড়ে গেল তাই
দত্তাপহারীর সূত্র।
এখন, সাময়িক পত্রে ছেয়ে গেল দেশ
কাজের কথা উঠে ভারী,
এবে দেশের কথায় সদা যশ গায়
শিক্ষিত পুরুষ নারী।
কিন্তু, কাজের বেলায় কোমর বাঁধিয়া
কয়জন বল আসে?
বরং, গৃহকোণে থাকি' করে উপহাস
টিট্‌কারী দিয়ে হাসে।
হায়, দেখে' শুনে' কারো ফুটিল না আঁখি
রহিল এই দুখ বা'
ওরে কলির মাহাত্ম্যে পো[illegible]ছেন সবে
বক্তৃতায় মুখ,—
(পা মোড়া দিয়া হাই তুলিছে) আ!

শ্রীপ্রেমানন্দ।